বাংলার সেরা
গোয়েন্দা
গল্প

বাংলার সেরা গোয়েন্দা গল্প

সম্পাদনা ঃ শ্যামলকান্তি দাশ

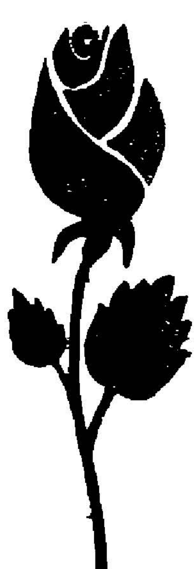

নব-প্রকাশ

১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা—৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ
কলিকাতা পুস্তক মেলা—১৯৯১

প্রকাশক ঃ
অশোক কুমার দত্ত
নব-প্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

মুদ্রণে ঃ
পাল প্রিণ্টার্স
৬৬ বি, মানিকতলা স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ ঃ
সত্য চক্রবর্ত্তী

মূল্য ৩০ টাকা

যে সমস্ত গল্প এতে আছে

একটি লাল লঙ্কা	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	...	১—১৫
গোয়েন্দা লেখক গুপ্তসভা	বিমল কর	...	১৬—২৩
কা-কা-কা রহস্য	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	...	২৪—৩১
অলৌকিক আখড়া রহস্য	অদ্রীশ বর্ধন	...	৩২—৪৫
হিরের আংটি	প্রতিভা বসু	...	৪৬—৫৪
জ্বরের ঘোরে শোনা	সমরেশ বসু	...	৫৫—৬০
মৃত্যু রহস্যময়	ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়	...	৬১—৭৫
গোয়েন্দা যখন ছোটমামা	মীরা বালসুব্রমনিয়ম	...	৭৬—৮২
ছদ্মবেশী কে	অজেয় রায়	...	৮৩—৯৪
একটি অগ্নিগর্ভ বই	বাণীব্রত চক্রবর্তী	...	৯৫—১০৫
খরেশবাবুর পুরনো ফ্রিজ	হিমানীশ গোস্বামী	...	১০৬—১১৮
দরজার ওপারে মৃত্যু	সিদ্ধার্থ ঘোষ	...	১১৯—১৩০
টুবলুর গোয়েন্দাগিরি	মঞ্জিল সেন	...	১৩১—১৩৪
গোয়েন্দা বরদাচরণ	শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	...	১৩৫—১৩৯
অভ্রর খুনি ধরা	রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়	...	১৪০—১৪৪
টেনাগড়ে টেনশান	বুদ্ধদেব গুহ	...	১৪৫—১৫১
টিকটিকি অতীন্দ্রিয় শক্তি ও বেদান্ত বর্ধন	আশাপূর্ণা দেবী	...	১৫৩—১৬৪
মালয়ের ইতিকথা	আনন্দ বাগচী	...	১৬৫—১৭৯
ডিটেক্‌টিভ	সুকুমার রায়	...	১৮০—১৮২
সত্যের সন্ধানী	প্রীতিপাল চৌধুরী	...	১৮৩—১৯১
কাপালিকের কবলে	হেমেন্দ্রকুমার রায়	...	১৯২—২০০

Banglar Sera Goenda Galpa

Edited by : **SHYMALKANTI DAS**

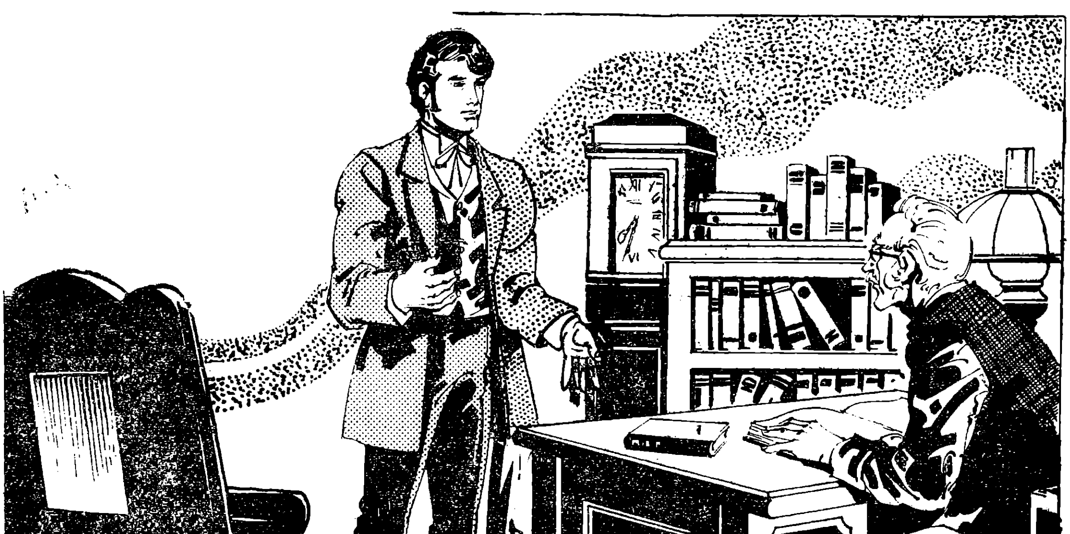

কাকাবাবু বললেন, "অসম্ভব! তোমার এ-কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। তুমি এ-প্রসঙ্গে আর আমার কাছে বোলো না, অন্য কথা বলো!"

অরিজিৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "কাকাবাবু, আমার যে আর অন্য কোনও উপায় নেই।"

কাকাবাবু ধমকের সুরে বললেন, "হ্যাঁ, উপায় আছে। তুমি এক্ষুনি চান করে নাও, তারপর ভাল করে খাওদাও, তারপর একটা লম্বা ঘুম দাও!"

অরিজিৎ আবার বলল, "কাকাবাবু, তুমি বুঝতে পারছ না…"

কাকাবাবু তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "আমার আর বোঝার দরকার নেই।"

তারপর তিনি গলা চড়িয়ে ডাকলেন, "সন্তু! সন্তু!"

সন্তু একটু আগেই ব্যাডমিণ্টন খেলে ফিরেছে। কাকাবাবুর ঘরে একবার উঁকি মেরে ওপরের ঘরে চলে গেছে। কাকাবাবুর ডাক শুনে নীচে নেমে এল তরতর করে। মা-বাবা বেড়াতে গেছেন পুরী, বাড়িতে আর বিশেষ লোকজন নেই।

কাকাবাবুর ঘরে একজন ভদ্রলোককে দেখতে পেল সন্তু, মুখটা চেনা-চেনা। খুব সম্ভবত মধ্যপ্রদেশে কোথাও দেখা হয়েছিল। কিন্তু এখন তার মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি। মাথার চুল ধুলোবালি-মাখা, তার গায়ের প্যাণ্টশার্ট দোমড়ানো-মোচড়ানো, কেমন যেন পাগল-পাগল চেহারা।

কাকাবাবু বললেন, "অরিজিৎকে চিনতে পারছিস তো, সন্তু? অরিজিৎ সিকদার। সেই একবার বস্তার জেলায় নারানপুরে এর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।"

সঙ্গে-সঙ্গে সন্তুর মনে পড়ে গেল, ভদ্রলোক একজন বটানিস্ট। সারা ভারতের বিভিন্ন জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে বিচিত্র সব গাছ খুঁজে বেড়ান। সেবারে তিনি বস্তার জেলার জঙ্গলে বুনো চা-গাছ খুঁজছিলেন। অনেক জঙ্গলেই নাকি এরকম বুনো চা-গাছ আছে, চাষ করতে হয় না। নিজে-নিজেই জন্মায়, আগে কেউ তার সন্ধান রাখত না।

কিন্তু সেবারে তো ভদ্রলোককে খুব শান্ত আর ভদ্র মনে হয়েছিল, হঠাৎ তার এই রকম চেহারা হল কী করে।

কাকাবাবু আবার বললেন, "দিল্লিতে আমার সঙ্গে কাজ করত সত্যেন. এই অরিজিৎ তার ভাইপো। ওকে অনেক ছোট বয়েস থেকে দেখেছি, তখন থেকেই ও আমাকে কাকাবাবু বলে ডাকে। অরিজিৎ আজ রাত্তিরে এখানেই থাকবে, বুঝলি। ওর খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করতে বল রঘুকে, আর চান করার জন্য ওকে বাথরুমটা দেখিয়ে দে।"

অরিজিৎ-এর দিকে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কাছে আর তো কোনও পোশাক নেই। তুমি আমারই একটা পাজামা, পাঞ্জাবি পরে নাও আজ।"

অরিজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে একবার কাকাবাবু আর একবার সন্তুর দিকে তাকাতে লাগল। তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। তার এক হাতে একটা ছোট্ট টিনের কৌটো।

কাকাবাবু আলমারি খুলে পাজামা, পাঞ্জাবি বার করলেন, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "অরিজিৎ, তোমার ওই কৌটোটা আমার কাছে রেখে যাও।"

অরিজিৎ হঠাৎ জোরে চেঁচিয়ে বলল, "না, এটা আমার কাছেই থাকবে!"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি চান করতে যাচ্ছ, ওটা সঙ্গে নিয়ে যাবে নাকি? ওটা আমার কাছেই থাক।"

অরিজিৎ কৌটোটা পেছন দিকে লুকিয়ে প্রায় হুঙ্কার দিয়ে বলল, "না! এটা আমি কাউকে দিতে পারব না!"

তার চোখ দুটো এমন জ্বলছে যে, সেদিকে তাকালে গা ছমছম করে।

কাকাবাবু অবশ্য বিচলিত হলেন না। তিনি অরিজিৎ-এর চোখের দিকে কয়েক মুহূর্ত অপলকভাবে চেয়ে রইলেন। তারপর হাত বাড়িয়ে গম্ভীর আদেশের সুরে বললেন, "দাও দাও ওটা আমাকে।"

কাকাবাবুর ওইরকম গলার আওয়াজ শুনে অনেক বাঘা-বাঘা বদমাশকেও ঘাবড়ে যেতে দেখেছে সন্তু। অরিজিৎ আর কিছু বলতে পারল না। কৌটোটা সে তুলে দিল কাকাবাবুর হাতে। তার হাতটা কাঁপছে।

কৌটোটার মধ্যে কী আছে, তা দেখার দারুণ কৌতূহল হল সন্তুর, কিন্তু কাকাবাবু সেটা খুলেও দেখলেন না। রেখে দিলেন জামা-কাপড়ের আলমারিতে। তারপর এমনভাবে পেছন ফিরে একটা বই হাতে তুললেন যাতে তাঁর সঙ্গে আর কোনও কথা বলা না চলে।

সন্তু অরিজিৎকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিল দোতলার বাথরুমটা। একটা নতুন সাবান

নর তোয়ালে এনে দিল। তারপর জিজ্ঞেস করল, আপনি দাড়ি কামাবেন? কাকাবাবুর কাছ থেকে ব্লেড এনে দেব?"

অরিজিৎ রুক্ষভাবে বলল, "না, দরকার নেই!"

অরিজিৎ স্নান করল প্রায় এক ঘণ্টা ধরে।

এর মধ্যে সন্তু দু-তিনবার কাকাবাবুর ঘরে উঁকি মেরেছে, যদি কৌটোটা সম্পর্কে কিছু জানা যায়। কাকাবাবু একমনে বই পড়েই চলেছেন। এই সময় তাঁকে বিরক্ত করা সম্ভব নয়।

ঠিক আটটার সময় খাবার দিয়ে দেওয়া হল। কাকাবাবু রাত্তিরে রুটি খান। সন্তু ভাত ভালবাসে। রঘু ভাত আর রুটি দু'রকমই বেশি করে বানিয়েছে, তার সঙ্গে ডাল, বেগুনের ভর্তা আর মুরগির মাংস।

খাবার টেবিলে বসার পর কাকাবাবু অরিজিৎকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি রুটি খাবে, না ভাত?"

অরিজিৎ বলল, "ভাত! না, রুটি। থাক, ভাতই খাব। কিংবা, রুটি কি বেশি আছে?"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি দুটোই খাও।"

কাকাবাবু রুটি খান ঠিক তিনখানা। অরিজিৎ খেল আটখানা রুটি। তারপর সে ভাত নিল। সন্তু যতটা ভাত খায়, অরিজিৎ নিল তার তিন গুণ। রঘু তাকে ভাত দিয়েই যাচ্ছে, দিয়েই যাচ্ছে, সে না বলছে না।

সে এমনভাবে খাচ্ছে, যেন বহুদিন খেতে পায়নি। কিন্তু কয়েকদিন উপোস করলেও কি মানুষ একসঙ্গে বেশি খেতে পারে? অরিজিৎ-এর রোগা-পাতলা চেহারা। এরকম চেহারায় কোনও লোককে সন্তু কখনও এতখানি খেতে দ্যাখেনি।

সবটা ভাত শেষ করার পর অরিজিৎ আরও দুটুকরো মাংস আর একটু ঝোল নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আর রুটি নেই?"

আর-একখানা মোটে রুটি বাকি ছিল, রঘু সেটাই দিয়ে দিল।

কাকাবাবু এঁটো হাতে চুপ করে বসে অরিজিৎ-এর খাওয়া দেখলেন। তারপর বললেন, "এইবার গিয়ে একটা ঘুম দাও। মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। দিল্লীতে টেলিফোনে তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলতে চাও?"

অরিজিৎ দু'দিকে শুধু মাথা নাড়ল।

হাত ধোয়ার পর অরিজিৎ কাকাবাবুর ঘরে এসে বলল, "এবার আমার কৌটোটা দিন, ওটা আমার ঘরে রাখব।"

কাকাবাবু বললেন, "ওটা আমার কাছে থাকলে অসুবিধের কী আছে?"

অরিজিৎ বলল, "আপনি বুঝতে পারছেন না, ওটা কোনওক্রমে নষ্ট হয়ে গেলে মহা ক্ষতি হয়ে যাবে।"

কাকাবাবু বলেন, "আমার কাছে থাকলে নষ্ট হবে কেন? আমি গগন বোসের সঙ্গে কথা

বলে রেখেছি, কাল সকাল এগারোটায় জিনিসটা সায়েন্স কলেজে নিয়ে যাব।"

অরিজিৎ উত্তেজিতভাবে বলল, "সায়েন্স কলেজে? ওরা কিছু বুঝবে না। ওটা সুইডেনে পাঠাতে হবে। সেখানে এই ব্যাপার নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, সুইডেনে পাঠাবারই ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু আজ রাত্তিরে আমার কাছে রাখতে তোমার এত আপত্তি কেন?"

ওটা আমার জিনিস। আমি ছাড়া কেউ এর সন্ধান জানে না!"

ওটা তোমার জিনিস, তা মানছি! কিন্তু আমাকে যদি তোমার এতই অবিশ্বাস, তা হলে ওটা নিয়ে আমার বাড়িতে এসেছ কেন! আর এসেই যখন পড়েছ, তখন তোমাকে আমি মোটেই পাগলামির প্রশ্রয় দিতে পারি না। জিনিসটা আমার কাছেই থাকবে।"

সন্তু আর কৌতূহল দমন করতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, কৌটোটার মধ্যে কী আছে!"

কাকাবাবু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে অরিজিৎকে বললেন, "আচ্ছা, একটুখানি বসে যাও। তোমার ঘটনাটা সন্তুকে বলো। বারবার নিজের মুখে বললে এক সময় নিজেই তুমি বুঝতে পারবে যে, সবটাই বানানো। তোমার কল্পনা। হয়তো এরকম একটা ব্যাপার কখনও স্বপ্নে দেখেছ, তারপর সেটাকেই সত্যি বলে ধরে বসে আছ। এরকম কিছু বাস্তবে হতে পারে না।"

অরিজিৎ একটা চেয়ারে বসে পড়ে মুখ গোঁজ করে বলল, "ও ছোট ছেলে ও এসবের কী বুঝবে?"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু তোমার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট হতে পারে, কিন্তু ওর অভিজ্ঞতা কম নয়। তুমি যে-অঞ্চলটার কথা বলছ, সন্তুও সেখানে আমার সঙ্গে গিয়েছিল। সন্তু, সেই যে, সেবারে আমরা নেপাল থেকে এভারেস্টের রুট ধরে গিয়েছিলাম, মনে নেই? সেই একটা অতি-মানবের দাঁতের খোঁজে?"

সন্তু বলল, "সে-ঘটনা কখনও ভোলা যায়? উঃ, কী শীত ছিল, তারপর সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে..."

কাকাবাবু বললেন, "অরিজিৎ-এর ঘটনার ব্যাকগ্রাউণ্ডটা আমি তোকে বলে দিচ্ছি। অরিজিৎ তো বনে-জঙ্গলে নানারকম অদ্ভুত-অদ্ভুত গাছপালা খুঁজে বেড়ায়? এবার সরকার থেকে থেকে ওকে পাঠানো হয়েছিল নেপালে। বারো-তেরো হাজার ফিট উঁচুতেও কিছু-কিছু গাছ জন্মায়। সেখানে নাকি কোথাও-কোথাও এ রকম স্ট্রবেরি গাছ দেখতে পেয়েছে কেউ-কেউ। অত ঠাণ্ডায় স্ট্রবেরি গাছ কী করে বেঁচে থাকে সেটাই ওর গবেষণার বিষয়। কী তাই তো?"

অরিজিৎ ঘাড় নাড়ল।

কাকাবাবু বললেন, "অরিজিৎ যে-জায়গাটা বেছে নিয়েছিল, সেখানে দু-একটা গ্রাম আছে, সেখানে ইয়েতিরা এসে মাঝে-মাঝে উপদ্রব করে বলে গুজব আছে।"

সন্তু হাসতে-হাসতে বলল, "আপনি একটু আগে যে-অভিযানের কথা বললেন, সেবারে

আমরা বেশ কয়েকটা ইয়েতি দেখেছিলুম, তাই না ?"

কাকাবাবুও এবার একটু মুচকি হেসে ফেললেন।

অরিজিৎ বলল, "তোমরা ইয়েতি দেখেছিলে ? সত্যি ?"

সন্তু বলল, "এমন মেকআপ দিয়েছিল যে, আসল না নকল, তা বোঝাই যায়নি অনেকক্ষণ!"

অরিজিৎ জিজ্ঞেস করল, "মেক-আপ দিয়েছিল মানে ? সেজেছিল ? কারা ?"

কাকাবাবু, বললেন, "সে অনেক লম্বা গল্প। সেটা পরে শুনে নিও। আসল ব্যাপার হচ্ছে, ইয়েতি বলে খুব সম্ভবত কোনও প্রাণী নেই।"

অরিজিৎ জোর দিয়ে বলল, "আলবত আছে !"

"তুমি বললেই তো হবে না। এ পর্যন্ত কেউ কোনও প্রমাণ দিতে পারেনি। কত লোকই তো বলেছে যে, ইয়েতি দেখছে নিজের চোখে। কিন্তু কেউ একটা ছবি তুলতে পেরেছে ?"

"ইয়েতির পায়ের ছাপ অনেকেই দেখেছে। মস্ত বড় পায়ের ছাপের ছবিও তোলা হয়েছে।"

"বরফের ওপর পায়ের ছাপ, সেটা আবার প্রমাণ নাকি ? মানুষের পায়ের ছাপও বরফের ওপর কিছুক্ষণ বাদে অন্যরকম হয়ে যায়।"

"তবু আমি বলছি ইয়েতি আছে।"

"না নেই ! আমি নেপালে অন্তত তিন-চারজনের মুখে শুনেছি, তারা ইয়েতি দেখেছে। কিন্তু তাদের একটু জেরা করতেই তারা উল্টো-পাল্টা বলতে শুরু করেছে। কেউ বলে গোরিলার মতন দেখতে, কেউ বলে ভাল্লুকের মতন। আবার কেউ বলে, দশ হাত লম্বা মানুষের মতন। তাদের দু-একজনের সঙ্গে ক্যামেরাও ছিল, তবু ছবি তুলতে পারেনি, তার কারণ নাকি ইয়েতিকে একপলক দেখার পরই অদৃশ্য হয়ে গেছে। যত্ত সব গাঁজাখুরি কথা! আসলে বরফের ওপর দিয়ে অনেকক্ষণ হাঁটলে ক্লান্ত হয়ে অনেকে চোখে ভুল দেখে। মরুভূমিতে যেমন মানুষ মরীচিকা দেখে।"

"কাকাবাবু, আসল ব্যাপারটা কিন্তু আপনিই ঠিক বলেছিলেন।"

"তার মানে ?"

"ইয়েতিরা অদৃশ্য হয়ে যায়।"

"অরিজিৎ, এবার ঘুমোতে যাও। আবার কাল সকালে কথা হবে!"

"আমার কথাটা ভাল করে শুনুন, কাকাবাবু। আমিও তো বিজ্ঞান পড়েছি, কোনও প্রমাণ না পেলে একেবারে গাঁজাখুরি কথা আমি মেনে নেব কেন ? নেপালের অন্তত দুটো পুরনো পুঁথিতে লেখা আছে, ইয়েতিদের হঠাৎ-হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাবার ক্ষমতা আছে। আমি নিজেও তার প্রমাণ পেয়েছি। এইজন্যই ইয়েতির ছবি তোলা যায় না। মানুষের চোখের সামনে পড়ে গেলেই ওরা অদৃশ্য হয়ে যাব!"

"পুঁথিতে যা কিছু লেখা থাকে, তাই-ই সত্যি নয়।"

"বললাম যে, আমি নিজের চোখে দেখেছি। এমন কী আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি।"

কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "অরিজিৎ বলতে চায়, হিমালয়ের কোনও একটা জায়গায় নাকি এক রকমের ফল পাওয়া যায়, যা খেলে অদৃশ্য হওয়া যায়। ইয়েতিরা নাকি সেই ফল খায়। আমাদের অরিজিৎ সেই ফলের সন্ধান পেয়েছে। এমনকী নিজে সেই ফল খেয়েও দেখেছে!"

অরিজিৎ ব্যাকুলভাবে বলল, "আপনি এখনও আমার কথা বিশ্বাস করছেন না?"

কাকাবাবু বললেন, "এসব রূপকথার মতো গল্প, শুনতেই ভাল। কিন্তু বিশ্বাস করার তো কোনও প্রশ্নই ওঠেনা। শোনো, জল জিনিসটা গরম হলে বাষ্প হয় তারপর সেই বাষ্প উড়ে যায়। এমনকী অনেক ধাতুকেও প্রচণ্ড উত্তাপে গলিয়ে বাষ্প করা যায়, আবার ঠাণ্ডা হলে সেই ধাতু বা জল ফিরে আসে। কিন্তু কোনও জীবন্ত প্রাণীকে বেশী গরমে রাখলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, সেই ছাইটাকে ঠাণ্ডা করলে কিন্তু সেই প্রাণীটাকে ফেরত পাওয়া যাবে না! কোনও জীবন্ত প্রাণী, এমনকী একটা পিপড়েকেও, অদৃশ্য করে আর ফিরিয়ে আনা অসম্ভব"!

সন্তু আমতা-আমতা করে বলল, কিন্তু কাকাবাবু, বৈজ্ঞানিকরা টাইম-মেশিনে কি মানুষকে অদৃশ্য করতে পারবে না? স্টার-ওয়র্স ফিলমে যে দেখি, একটা যন্ত্রের মধ্যে দাঁড়ালে মানুষ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আবার অন্য জায়গায় ফিরে আসছে?"

কাকাবাবু বললেন, "ওসব এ-যুগের রূপকথা। আগেকার গল্পে যেমন রাজপুত্র পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে আকাশে উড়ে যেত, এখনকার গল্পেও তেমনি নায়করা স্পেস-শিপে চেপে অন্য' গ্রহে যায়, এমনকী এই গ্যালাক্সি পেরিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করে আসে। এসব রূপকথা ছাড়া কিছুই না।'

অরিজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি যদি আপনার চোখের সামনে করে দেখাতে পারি? আমাকে কৌটোটা একবার দিন!"

কাকাবাবু আর কিছু বলার আগেই সে ছুটে গিয়ে জামা-কাপড়ের আলমারিটা খুলে কৌটোটা বার করে এনে বলল, "আমি নিজে দুবার এক্সপেরিমেণ্ট করেছি। দুবারই সাকসেসফুল।"

কৌটোটা খুলে সে সন্তুকে দেখাল।

ভেতরের জিনিসটা দেখে সন্তু খানিকটা নিরাশ হয়ে গেল। এটা তা একটা লঙ্কা। বেশ বড়সড় টাবাটোবা গোলগাল লাল-লঙ্কা!

অরিজিৎ যেন তার মনের কথাটাই বুঝতে পেরে বলল, "এটা লঙ্কা বলে মনে হচ্ছে তো? কিন্তু এটা এক ধরনের স্ট্রবেরি। এটা ঝাল নয় মোটেই, বরং টক-মিষ্টি। কাকাবাবু শুনলে বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু তোমাকে বলছি সন্তু, একেবারে সত্যি কথা বলছি! পাহাড়ে স্ট্রবেরি খুঁজতে-খুঁজতে, ঝোপঝাড়ে যেখানে যে ফল দেখতাম, অমনি আমি তা খেয়ে স্বাদ নিতাম। কোনও বিষাক্ত ফল খেয়ে ফেলারও ঝুঁকি ছিল অবশ্য। একদিন আমি এই ফল একটা খেয়েই অদৃশ্য হয়ে গেলুম!"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ!"

সন্তু বলল, "সত্যি বলছেন?"

অরিজিৎ বলল, "দেড়দিন সেই অবস্থায় ছিলুম। সিংবোচি গ্রামে এসে ঘুরেছি, লোকজনের মধ্যে, কিন্তু কেউ আমাকে দেখতে পায়নি। আমিও ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম খুব। পরে ওইরকম আর-একটা ফল খেয়ে নেবার পর আবার সব ঠিক হয়ে গেল।"

সন্তু একবার কাকাবাবু আর একবার অরিজিৎ-এর দিকে তাকাল। তারপর কৌটোটা হাতে তুলে নিল।

অরিজিৎ বলল, "দারুণ ভাল লাগে সেই সময়টা। কোনও খিদে-তেষ্টা থাকে না। দারুণ হালকা লাগে শরীরটা, মানে, শরীরটা অন্য কেউ দেখতে না পেলেও সেটা তো থাকেই। মনটা খুব ফুরফুর করে। যেখানে ইচ্ছে চলে যাওয়া যায়। কতরকম মজা হয়।"

কাকাবাবু বিদ্রুপের সুরে বললেন, "ইয়েতির গায়ে তো পোশাক থাকে না। মানুষের গায়ে যে প্যাণ্ট-জামা-জুতো থাকে, সেগুলোও অদৃশ্য হয়ে যায়?

অরিজিৎ বলল, "দেখবেন? দেখবেন? এক্ষুনি দেখাব? আমি টপ করে ফলটা খেয়ে নেব, তারপর এক মিনিটের মধ্যেই আপনাদের চোখের সামনেই মিলিয়ে যাব! ওটা দাও তো, সন্তু!"

অরিজিৎ হাত বাড়াতেই কাকাবাবু প্রায় গর্জন করে উঠে বললেন, "না! কোনও দরকার নেই!"

অরিজিৎ এবার হেসে বলল, "কাকাবাবু, আপনি ভয় পাচ্ছেন? আপনি অবিশ্বাস করবেন, আবার ভয়ও পাবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "ওরকম অচেনা ফল খাবার দরকার নেই!"

অরিজিৎ বলল, "দারুণ ভাল লাগে। দেখলেই খেতে ইচ্ছে। আমি মাত্র তিনটে পেয়েছিলুম, যদি আরও খুঁজে বার করা যায়, তা হলে একটা বিরাট আবিষ্কার হবে!"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, কৌটোটা আলমারিতে রেখে দে! এবার তোমরা শুতে যাও। আর কোনও কথা নয়! যাও! আমার ঘুম পেয়েছে।"

সন্তু অনিচ্ছার সঙ্গে কৌটোটা রেখে দিল যথাস্থানে। কাকাবাবু এমনভাবে চেয়ে আছেন যে, বেরিয়ে যেতেই হল দুজনকে।"

অরিজিৎ সন্তুর কাঁধে হাত দিয়ে বলল, "সন্তু, আমি কিন্তু বানিয়ে বানিয়ে গল্প শোনাইনি। সত্যি ওই ফলটার অদ্ভুত গুণ আছে। ওটা খেলে মানুষ অদৃশ্য হতে পারে। কাকাবাবু বিশ্বাস করলেন না!"

অরিজিৎকে তার ঘর দেখিয়ে দেবার পর সে শুয়ে পড়ল। সে সত্যিই খুব ক্লান্ত, একটু বাদেই তার নাক ডাকার শব্দ শোনা গেল।

সন্তু উঠে গেল তিনতলায়। বড় হবার পর সে এই ছাদের ঘরটা নিজের জন্য পেয়েছে। এখানে সে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে পড়াশুনো করতে পারে। মাঝে-মাঝে ছাদে দাঁড়িয়ে আকাশের তারা দ্যাখে।

একটা বই নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেও তার মন বসল না পড়ায়। অরিজিৎ-এর কথাগুলোই মনে পড়ছে বারবার।

ছেলেবেলা থেকেই সন্তু অদৃশ্য হবার স্বপ্ন দেখেছ। অদৃশ্য হতে পারলে সত্যিই একটা মজার ব্যাপার হয়। তাকে কেউ দেখতে পাবে না, অথচ সে সবাইকে দেখতে পাবে!

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা 'অদৃশ্য মানুষ' নামে একটা বই পড়ে সন্তুর এক সময় মনে হয়েছিল, সত্যিই ওইরকম একজন অদৃশ্য মানুষ আছে। কিন্তু কাকাবাবু বললেন, "বিজ্ঞানের দিক থেকেও নাকি অদৃশ্য হওয়া অসম্ভব। অথচ অরিজিৎ-এর কথা শুনে মনে হয় না যে, সে আগাগোড়াই মিথ্যে কথা বলছে।"

খাওয়ার সময় অরিজিৎ অতগুলো খাবার খেল। সে বলল, "অদৃশ্য হলে নাকি খিদে-তেষ্টাও পায় না। অদৃশ্য অবস্থা থেকে আবার সাধারণ অবস্থায় ফিরে এলে তখন একসঙ্গে দু-তিন দিনের খিদে পায়!"

বই পড়াতেও মন নেই, ঘুমও আসছে না। বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে সন্তু। ঘড়িতে দেখল রাত দেড়টা বাজে!

বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল সন্তু। মনে হয় সারা কলকাতাই এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। কোথাও কোনও শব্দ নেই।

পা টিপে-টিপে দোতলায় নেমে এল সে। অরিজিৎ-এর প্রচণ্ড জোরে নাক ডাকছে। কাকাবাবুরও নাক ডাকার বেশ শব্দ হয়। সারা বাড়িতে এ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

কাকাবাবুর ঘরে আলো জ্বলছে। কাকাবাবুর এই এক স্বভাব, প্রায়ই আলো জ্বেলে ঘুমিয়ে পড়েন। মা, বাবা কিংবা সন্তু কেউ একজন পরে এসে আলো নিভিয়ে দিয়ে যায়। আজ বাড়িতে মা-বাবাও নেই।

সন্তু কাকাবাবুর ঘরের দরজাটা ঠেলে খুলল। কাকাবাবু টের পেলেন না। ঘরের মধ্যেও কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সন্তু, তার খুব লোভ হচ্ছে। ফলটা খেয়ে দেখলে কী হয়? কাকাবাবু রাগ করবেন? অরিজিৎ বলেছিল, অদৃশ্য হলেও সেই অবস্থায় দেড় দিনের বেশি থাকা যায় না। দেড় দিন পরেই তো সব ঠিক হয়ে যাবে! কাকাবাবু অরিজিৎ-এর কথায় বিশ্বাস করেননি, সন্তুর কথা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন।

আলমারি খুলে সন্তু কৌটোটা বার করল। কাঠের আলমারির পাল্লায় ক্যাঁচ করে সামান্য শব্দ হলেও কাকাবাবু জাগলেন না। সন্তু টপ করে আলো নিভিয়ে, দরজা ভেজিয়ে দৌড়ে উঠে এল ছাদে।

যা থাকে কপালে, খেয়েই দেখা যাক!

সন্তু ঝাল খেতে পারে না বেশি! ফলটাকে লঙ্কার মতন দেখতে, একেবারে টকটকে লাল। যদি এটা লঙ্কা হয়, তা হলে দারুণ ঝাল হবে। সন্তু প্রথমে একটা ছোট্ট কামড় দিল। না, ঝাল নয়, একটু মিষ্টি মিষ্টিই। খানিকটা পিপারমেণ্টের মতন। খেতে ভাল লাগছে।

পুরো ফলটাই খেয়ে ফেলল সন্তু, কিন্তু কিছুই তো হল না। তা হলে কি অরিজিৎ একদম বাজে কথা বলেছে? ওঃহো, আজ তো পয়লা এপ্রিল! অরিজিৎ কাকাবাবুকে আর সন্তুকে এপ্রিল ফুল করেছে নির্ঘাত!

একটা কিসের শব্দ হতেই সন্তু ঘুরে তাকাল।

ছাদের পাঁচিলে কার যেন একটা কালো রঙের মাথা। ওটা কি কোনও মানুষ, না জন্তু?

সন্তু দৌড়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়বার চেষ্টা করেও পারল না। তার আগেই মাথাটা যেন বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল, কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ হল, সে ঝুপ করে পড়ে গেল অজ্ঞান হয়ে।

॥ ২ ॥

সদ্য বরফ গলতে শুরু করেছে বলে পাথর এখানে সাঙ্ঘাতিক পিছল। কাকাবাবু প্রতিবার ক্রাচ তুলছেন আর ফেলছেন দারুণ সাবধানে। তবু এক-একবার হড়কে যাচ্ছে।

অরিজিৎ করুণ মুখ করে বলল, "কাকাবাবু, আপনাকে আর যেতে হবে না। এরপর ওপরটায় গিয়ে আমিই খুঁজে দেখছি।"

কাকাবাবু কোনও উত্তর না দিয়ে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালেন। এখন ঘড়ি অনুযায়ী দুপুর সাড়ে তিনটে, কিন্তু এর মধ্যেই যেন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। আকাশের এক দিকটা লাল।

এই গরমেও কাকাবাবুর কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমেছে। তাঁর নিশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে। কাঠমাণ্ডুতে তাকে দু-তিনজন বারবার অক্সিজেন সঙ্গে নেবার কথা বলেছিল, কাকাবাবু তাতে কর্ণপাত করেননি। তিনি ভেবেছিলেন, আজকাল তো অক্সিজেন ছাড়াই কেউ-কেউ এভারেস্টেও ওঠার চেষ্টা করছে, সুতরাং এই বারো-তেরো হাজার ফিটে কী আর কষ্ট হবে! কাকাবাবু নিজেও এর চেয়ে উঁচুতে উঠেছেন আগে, কিন্তু এবারে তাঁর হাঁফ ধরে যাচ্ছে। হঠাৎ যেন বাতাস কমে গেছে এদিকে।

অরিজিৎ আবার বলল, "কাকাবাবু, আপনি এখানে বসেই বিশ্রাম নিন বরং। আমি ওপর দিকটা দেখে আসছি। আগেরবার এখানেই পেয়েছিলুম।"

কাকাবাবু জোর দিয়ে বললেন, "না, আমি, শেষ পর্যন্ত দেখতে চাই! তুমি আমাকে এত দূর নিয়ে এসেছ, এইটুকু আর বাকি থাকে কেন?"

অরিজিৎ বলল, "আপনি বিশ্বাস করুন, আমি আগেরবার এই জায়গাতেই পেয়েছি ওই ফল।"

কাকাবাবু বললেন, "এখন আমি তোমার সব কথাই বিশ্বাস করতে বাধ্য।"

চতুর্দিকে সাদা বরফের টোপর-পরা পাহাড়ের চূড়া। মাঝে-মাঝে ঘাসের চাপড়া ছাড়া বড় গাছ আর এদিকে নেই। এদিককার শেষ গ্রাম নাংপো থেকে ওরা বেরিয়েছে সকাল ছ'টায়।

সারা দিনে একবারও সূর্যের মুখ দেখা যায়নি।"

এই নিয়ে তিন দিন কেটে গেল এই অঞ্চলে। অনেক খোঁজাখুঁজি করে কোথাও দেখা যায়নি সেই লাল লঙ্কার মতন ফলের গাছ।

দু'জন মাত্র শেরপাকে সঙ্গে আনা হয়েছে। আং শেরিং আর ছোটা দাজু। কাকাবাবু তাঁর পুরনো বন্ধু মিংমাকে খোঁজ করেও পাননি, সে চলে গেছে অন্য কোনও অভিযাত্রীদের সঙ্গে।

আং শেরিং আর ছোটা দাজু দারুণ তেজী আর শক্তিশালী, কিন্তু তারা এই কাস্তের মতন পাহাড়টায় কিছুতেই উঠতে চায় না। তাদের ধারণা, এই পাহাড়টায় অপদেবতা আছে! খানিকটা নীচে তারা থেমে গেছে!

শোঁশোঁ করে হাওয়া বইতে শুরু করে দিল। অরিজিৎ আরও কাঁচুমাচুভাবে বলল, "কাকাবাবু, আজকে থাক, আবার কাল চেষ্টা করা যাবে!"

কাকাবাবু বললেন, "এতখানি উঠেছি যখন, এ-পাহাড়টা আজ দেখা শেষ করতেই হবে। চলো, আর দেরি করে লাভ কী"

"অন্ধকার হয়ে গেলে আর কিছু দেখা যাবে না!"

"আমার কাছে টর্চ আছে। তুমি জানো না অরিজিৎ সন্তুকে সঙ্গে না নিয়ে আমি আজকাল কোথাও যাই না! এবার সন্তুর জন্যই আমাকে এখানে আসতে হয়েছে!"

"কাকাবাবু, সন্তু যে এরকম একটা কাণ্ড করবে, আমি ভাবতেই পারিনি!"

"আলমারিটায় তালা না দিয়ে আমি ভুল করেছি। আসলে আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিনি, গুরুত্ব দিইনি! এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না!"

সেই রাতের পর থেকে সন্তুকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। ছাদের ওপর পড়ে ছিল কৌটোটা, তার মধ্যে লাল লঙ্কার মতন ফলটাও নেই। অরিজিৎ তা দেখেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিল। তার ধারণা, সন্তু সেই ফলটা খেয়ে ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেছে!

কাকাবাবু সন্তুর ঘর এবং ছাদের প্রায় প্রতিটি ইঞ্চি পরীক্ষা করে দেখেছেন। সন্তুর হঠাৎ চলে যাওয়ার কোন চিহ্নই নেই। সে পাজামা আর পাঞ্জাবি পরে ছিল, তার চটি-জোড়া পর্যন্ত রয়ে গেছে, বিছানার ওপর একটা বই আধ-খোলা। সন্তু কোনও কারণে হঠাৎ কোথাও চলে গেলে নিশ্চয়ই কাকাবাবুকে চিঠি লিখে রেখে যেত কিংবা কিছু একটা চিহ্ন রেখে যেত। সেরকম কিছুই নেই।

তবে, সন্তু যে এই লাল ফলটা চুপিচুপি খেয়েছে, তাও তো ঠিক। সে সত্যিই অদৃশ্য হয়ে গেল?

অরিজিৎ এখন বলছে যে, অদৃশ্য মানুষদের নাকি কথা বলারও ক্ষমতা থাকে না। কিংবা তাদের কথা কেউ শুনতে পায় না। সে নিজে যেবার অদৃশ্য হয়েছিল, সেবার গ্রামের মানুষদের কাঁধে হাত দিয়ে ডেকেছিল, তাও, তারা বুঝতে পারেনি কিছুই। অদৃশ্য মানুষের ছোঁয়াও টের

পাওয়া যায় না।

এইসব কথা শুনেই রাগে কাকাবাবুর গা জ্বলে গেছে!

দু'দিন অপেক্ষা করেও সন্তুর কোনও খোঁজ না পেয়ে কাকাবাবু উতলা হয়ে উঠেছিলেন। তা হলে কি অরিজিৎ-এর কথাই ঠিক? সন্তু একেবারে হাওয়ায় অদৃশ্য হয়ে গেল! তখন তিনি জেদ ধরলেন, তিনি নিজে ওই ফল একটা খেয়ে দেখবেন! সন্তু একটা ফল খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে, এরকম একটা অদ্ভুত কথা তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক-বন্ধুদের কিংবা পুলিশ-বন্ধুদেরও বলতে পারেননি! তাঁরা নিশ্চয়ই ভাবতেন কাকাবাবুর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে!

পরের দিনই টিকিট কেটে কাঠমাণ্ডু। তারপর গাড়িতে অনেকটা পথ আসার পর শুরু হয়েছে পায়ে হাঁটা।

আং শেরিং আর ছোটা দাজুকে প্রথমে আসল উদ্দেশ্যটা বলা হয়নি। কাকাবাবু বলেছিলেন তিনি সিলভার লেপার্ডদের ছবি তুলতে চান। পৃথিবীতে শুধু এই অঞ্চলটাতেই রুপোলি নেকড়েদের কদাচিৎ দেখা পাওয়া যায়। কাঠমাণ্ডুতেও তিনি এই কথা বলেই অভিযানের অনুমতি জোগাড় করে এনেছিলেন।

এই কাস্তের মতন পাহাড়টার কাছে এসে আং শেরিং বলেছিল 'সাহেব' এখানে তো সিলভার লেপার্ড পাবেন না! এখানে অপদেবতারা আসে, এখানে অন্য কোনও জন্তু-জানোয়ার থাকে না। সিলভার লেপার্ড খুঁজতে গেলে আরও হাজার ফিট উঁচুতে উঠতে হবে।'

তখন কাকাবাবু অন্য কিছু বলতে বাধ্য হলেন। তিনি সরাসরি ইয়েতির প্রসঙ্গ না তুলে বলেছিলেন, "আমি একটা লাল লঙ্কার মতন ফল খুঁজছি, যা অনেক ওষুধ হিসেবে কাজে লাগে!"

সেই কথা শুনেই আং শেরিং আর ছোটা দাজু একসঙ্গে ভয় পেয়ে বলে উঠেছিল, "বিষফল! বিষফল!"

কাকাবাবু অনেক কষ্টে তাদের কাছ থেকে আরও খবর জেনেছিলেন। ছোটা দাজুর বয়েস কম। সে কখনও ওই ফল দ্যাখেইনি। পাহাড়ে ওই ফল খুব কমই দেখা যায়। আং শেরিং বলেছিল, সে ওই ফল দুবার মাত্র দেখেছে। তেরো হাজার ফিটের কাছাকাছি উচ্চতায় ওই ফলের গাছ জন্মায় পাহাড়ের খাঁজে-খাঁজে। সেই ফল প্রথমে থাকে কালো, তারপর লাল হবার আগেই কারা যেন তুলে নেয়। ওরকম লাল ফল খুব কমই দেখা যায়। সকলেরই ধারণা, ওই লাল লঙ্কার মতন ফলগুলো অপদেবতাদের খুব প্রিয় খাদ্য।

আং শেরিং আরও একটা রোমহর্ষক কাহিনী শুনিয়েছিল। তাদের গ্রামের দুটি ছেলে একবার এই কাস্তে-পাহাড়ের (এরা বলে সরু চাঁদের পাহাড়) ওপরে গিয়ে ওইরকম দুটো বেশ লাল ফল দেখে খেয়ে ফেলেছিল। তারপর তাদের চেহারা বদলাতে শুরু করে, তাদের সারা গায়ে বড়-বড় লোম গজিয়ে ওঠে, চেহারাটা হয়ে যায় বাঁদরের মতন, তারা লাফাতে-লাফাতে গ্রাম ছেড়ে পাহাড়ের দিকে চলে যায়। আর ফিরে আসেনি। সেই থেকে ওরা সবাই ওইরকম লাল ফল কখনও দেখতে পেলেও হাত দিতে সাহস করে না।

এই ঘটনা শুনে অরিজিৎ গোল-গোল চোখে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে ছিল। তবু কাকাবাবুর বিশ্বাস হয়নি। ওই ফল নিজে খেয়ে দেখার ইচ্ছে তাঁর মনে আরও জোরালো হয়েছিল।

আং শেরিংরা আর আসতে চয়েনি, তবু কাকাবাবু চুড়া পর্যন্ত উঠে দেখতে চান।

আকাশের রং ক্রমে ম্লান হয়ে আসছে, এরপর নীচে নামতে আরও বেশি অসুবিধে হবে। তবু কাকাবাবু আস্তে-আস্তে ক্রাচ ফেলে ওপরে উঠছেন।

একটু পরে অরিজিৎ বলল, "কাকাবাবু, আমায় ক্ষমা করুন। আমার ভুল হয়েছে! ওই যে পাশের পাহাড়টা দেখুন। এখান থেকে ওটাকেও ঠিক কাস্তের মতন মনে হচ্ছে। পাশাপাশি দুটো ঠিক একই রকমের পাহাড়। আমার মনে হচ্ছে, আমি ওই পাশের পাহাড়টাতেই ফলগুলো পেয়েছিলুম।"

কাকাবাবু থেমে কয়েকবার জোরে-জোরে নিশ্বাস নিলেন। তারপর বললেন, "তোমার আর কিছু ভুল হয়নি তো? তুমি ওই লাল ফল নিজে কি সত্যি খেয়েছিলে?"

অরিজিৎ বলল, "নিশ্চয়ই। আপনার কাছে কি আমি মিথ্যে কথা বলব? তা ছাড়া এরকম একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা না হলে আপনার কাছে আমি এত দূর থেকে ছুটে যাবই বা কেন!"

কাকাবাবুর এক দিকের কাঁধে ঝুলছে ক্যামেরা, অন্য দিকে কাঁধে রাইফেল। তিনি দুটোই নামিয়ে রাখলেন। তারপর ওভারকোটের পকেট থেকে একটা ছোট ফ্লাস্ক বার করে এক ঢোঁক গরম চা খেলেন।

হঠাৎ ডান দিকে ঘুরে একটা ক্রাচ তুলে তিনি বললেন, "ওটা কী দ্যাখো তো অরিজিৎ!"

একটা অতিকায় কচ্ছপের মতন দেখতে পাথরের খাঁজে টমাটো গাছের মতন একটা গাছ উঁকি মারছে! তাতে ফলে আছে ক্যাপসিকামের মতন একটা লাল লঙ্কা!

সেদিকে তাকিয়ে অরিজিৎ-এর চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। সে কোনওক্রমে বলল, "এই তো, এই তো!"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার কথায় এইটুকু বিশ্বাস করা গেল যে, এত উঁচু পাহাড়েও ওইরকম লঙ্কার মতন ফল দেখা যায়। বেশ ভাল কথা। এবার ওটাকে ছিঁড়ে আনো। আমি খেয়ে দেখব!"

অরিজিৎ আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, "না না! কাকাবাবু, আপনি খাবেন না। সন্তুর জন্য নিয়ে চলুন।"

কাকাবাবু আর কিছু বলার আগেই একটু দূরে খুব জোরে একটা হা-হা-হা শব্দ হল। কোনও জন্তু যেন খুব যন্ত্রণায় কাঁদছে!

কাকাবাবু ফ্লাস্কটা পকেটে ঢুকিয়ে রাইফেলটা তুলে নিলেন।

অরিজিৎ বলল, "কাকাবাবু, চলুন, পালাই! কে যেন আসছে!"

কাকাবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, "ওই ফলটা না নিয়ে আমি যাব না। যে আসে আসুক।"

অরিজিৎ কাকাবাবুর হাত ধরে টানতে যেতেই কাকাবাবু এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে দিলেন। তারপর লাল ফলটা ছিঁড়ে নেবার জন্য একটু এগোতেই দেখলেন, মাত্র আট-দশ ফিট দূরে একটা প্রাণীর মুখ। সেটা ভাল্লুক কিংবা শিম্পাঞ্জির হতে পারে, কোনওক্রমেই মানুষের নয়।

কাকাবাবুর প্রথম মনে হল, ক্যামেরাটা দিয়ে ছবি তোলার। কিন্তু রাইফেল নামিয়ে রেখে ক্যামেরাটা তুলে নিতে দেরি হয়ে যাবে। জন্তুটার চোখ দুটো অসম্ভব হিংস্র, সে এক পা এক পা করে করে এগিয়ে আসছে।

কাকাবাবু ছবি তোলার বদলে রাইফেল উঁচিয়ে জন্তুটাকে গুলি করতে গেলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে অরিজিৎ কাকাবাবুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, "কাকাবাবু, গুলি করবেন না। ও আমাদের সন্তু! ও সন্তু!"

লোড-করা রাইফেলে ঝাঁকুনি লেগে গুলি বেরিয়ে গেল। তার শব্দ ছড়িয়ে পড়ল এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্তে। সেই লোমশ প্রাণীটা ভয় পাবার বদলে আরও সামনে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের দু'জনের ওপর!

অরিজিৎ-এর কথা শুনেই কাকাবাবু দ্বিতীয়বার গুলি করতে পারলেন না। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন "সন্তু? তুই কি সন্তু?"

লোমশ প্রাণীটা কাকাবাবুকে এক ধাক্কা মারল। অরিজিৎকে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে দিল নীচের দিকে। সে গড়িয়ে পড়ে যেতে লাগল।

জন্তুটার ধাক্কায় কাকাবাবুও গড়িয়ে গেলেন খানিকটা। কিন্তু এক জায়গায় থেমে যাবার পর বুঝলেন, তাঁর নিজের হাত-পা ভাঙেনি। কিন্তু অরিজিৎ তখনও গড়াচ্ছে।

তিনি চিৎকার করে বললেন, "আং শেরিং, ছোটা দাজু, ওকে ধরো!"

খানিকবাদে ছোটা দাজুর সাহায্য নিয়ে কাকাবাবু নীচে নেমে এলেন। আং শেরিং অরিজিৎকে কোলে নিয়ে বসে আছে। অরিজিৎ-এর জ্ঞান নেই, তার মাথা কেটে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে, খুব সম্ভবত একটা হাতের হাড়ও ভেঙে গেছে। জামা-টামা রক্তে মাখামাখি!

আং শেরিং শান্ত গলায় কাকাবাবুকে বলল, "সাহেব, তোমাদের বলেছিলুম না, ওই অপদেবতার পাহাড়ে উঠো না! এক্ষুনি শহরের হাসপাতালে নিয়ে না গেলে এই সাহেবটা বাঁচবে না।"

পরের দিনই কাকাবাবু অরিজিৎকে নিয়ে পৌঁছে গেলেন কাঠমাণ্ডুতে। কাকাবাবুর নিজেরও যে একটা হাত মচকে গেছে আর ডান দিকের কানের পেছনে অনেকটা জায়গা থেঁতলে গেছে, সে-কথা কাউকে বললেন না। অরিজিৎকে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে তিনি সেখানেই বসে রইলেন সারা রাত। ভোরবেলা অরিজিৎ-এর জ্ঞান ফিরেছে, আর তেমন বিপদের আশঙ্কা নেই শুনে কাকাবাবু ফিরে গেলেন হোটেলে।

সারা রাত জাগলেও সকালবেলা ঘুমোবার কোনও মানে হয় না। কাকাবাবু ভাল করে স্নান করে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিলেন। তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে আছে। তিনি কোনওদিন হার

স্বীকার করেন না। তিনি মনে মনে ঠিকই করে ফেলেছেন এর মধ্যে যে আবার তিনি ওই কাস্তে, পাহাড়ে ফিরে যাবেন। ওই লাল লঙ্কার মতন একটা ফল তাঁর চাই-ই-চাই! ওই ফল খাওয়ার পরের ফলাফল তিনি নিজে না বুঝলে সন্তুকে কিছুতেই খুঁজে বার করা যাবে না!

সবে মাত্র ব্রেকফাস্ট শেষ করেছেন, এমন সময় বেজে উঠল টেলিফোন। হাসপাতাল থেকে কোনও খবর এসেছে ভেবে তিনি রিসিভারটা তুলতেই অন্য দিকের গলার আওয়াজ শুনে আনন্দে তাঁর বুকটা কেঁপে উঠল। "সন্তু!"

সন্তু বলল, "উফ, কাকাবাবু, এতক্ষণে আপনাকে পাওয়া গেল। আমি কাল দুপুর থেকে কাঠমাণ্ডুর সব হোটেলে আপনাকে খুঁজছি!"

কাকাবাবু উত্তেজনা দমন করে জিজ্ঞেস করলেন, "সন্তু, তুই কোথা থেকে কথা বলছিস?"

সন্তু বলল, "কলকাতা থেকে। আমাদের বাড়ি থেকে!"

"আমাদের বাড়ি থেকে! তুই তা হলে অদৃশ্য হয়ে যাসনি?"

"হা-হা-হা, কী যে বলেন! আপনিই না বলেছিলেন, মানুষের পক্ষে অদৃশ্য হওয়া অসম্ভব।"

"তা তো বটেই! কিন্তু তোকে আমরা খুঁজে পাইনি কেন? তুই কোথায় গিয়েছিলি! তুই লাল লঙ্কাটা খেয়েছিলি না?"

"হ্যাঁ, কাকাবাবু, আমি ভেবেছিলুম, আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখব। কিন্তু, ওটা স্ট্রবেরিও নয়, লঙ্কাও নয়, ওটা একটা বিষাক্ত ফল। ওটা খেলে মাথা ঘুরে যায়, কান ভোঁভোঁ করে তারপর মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়। অদৃশ্য-টদৃশ্য কিছু হয় না!"

"তা হলে তুই কোথায় ছিলি, সন্তু?"

"সে একটা মজার ব্যাপার! আপনার সেই ত্রিপুরার রাজকুমারের কথা মনে আছে? আপনার ওপর তার খুব রাগ! সে দুটো গুণ্ডা পাঠিয়েছিল আমাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য। গুণ্ডা দুটো ড্রেন পাইপ বেয়ে উঠে এসেছিল ছাদে। তারা ভেবেছিল, আমাকে জোর করে, হাত-পা বেঁধে নিয়ে যাবে। কিন্তু তারা ধরবার আগেই আমি অজ্ঞান। ওরাই ঘাবড়ে গেল!"

কাকাবাবু একটুখানি চুপ করে গিয়ে শান্ত গলায় বললেন, "তোর ভয় পাবার দরকার নেই, সন্তু। আসল ব্যাপার কী হয়েছিল বল তো?"

সন্তু বলল, "আমি আসল কথাটাই বলছি তো! রাজকুমার আমাকে বেঁধে নেবার জন্য দুটো লোক পাঠিয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে আমি অজ্ঞান, কোনও বাধাই দিতে পারিনি। লাল লঙ্কাটা তক্ষুনি খেয়ে ছিলুম যে! তারপর নাকি আমি পাক্কা আড়াই দিন অজ্ঞান হয়ে থেকেছিলুম। গোড়ার দিকটা আমার মনে নেই। কিন্তু শেষের দিকে আমি আধো-আধো স্বপ্নে কত দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি! অন্যদের কথা একটু একটু শুনতে পেলেও উত্তর দিতে পারিনি! বুঝলে কাকাবাবু, এই লাল লঙ্কার রহস্যটা আমি আবিষ্কার করেছি। ওটা একটা বুনো বিষাক্ত ফল, ওটা খেলে মানুষ অনেকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকে। সেই সময় স্বপ্ন দেখে ভাবে, বুঝি অদৃশ্য হয়ে অনেক

জায়গায় ঘুরছে। আমি ডেফিনিট, অরিজিৎদার এইরকম ব্যাপারই হয়েছে!"

কাকাবাবু অবিশ্বাসের সুরে বললেন, "সেই রাজকুমার লোক পাঠিয়ে তোকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল? সেখান থেকে তুই ছাড়া পেলি কী করে!"

সন্তু হাসতে হাসতে বলল, "রাজকুমার খুব জব্দ হয়ে গেছে, কাকাবাবু! ওর লোক তো অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে ধরে নিয়ে যায়। আড়াই দিনের মধ্যে আমি জাগিনি, মাঝখানে কী ঘটেছে তা-ও আমি জানি না! এদিকে রাজকুমার ভেবেছিল, ওর শাগরেদদের হাতে মার খেয়ে আমি বুঝি মরতে বসেছি। ডাক্তার ডেকে এনে আমার চিকিৎসা করিয়েছে। ওষুধ খাইয়েছে। আমি চোখ মেলবার পর সে বলেছিল, উঃ বাঁচালে! তোমাকে দু-চারদিন আটকে রেখে তোমার কাকাবাবুর কাছ থেকে দু-চারটে জিনিস আদায় করব ভেবেছিলাম। শেষে দেখছি, মরা মেরে খুনের দায়ে পড়ার মতন অবস্থা! তুমি মরে গেলে আমাদের পুরো উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যেত! যাও বাছা, এবারের মতন ফিরে যাও ঘরে। কী খেলাই দেখালে! আড়াই দিন অজ্ঞান, অথচ শরীরে মাথায় কোনও চোট নেই। জানেন কাকাবাবু, শেষ পর্যন্ত রাজকুমার আমাকে খাতির করে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে কাল দুপুরে। তারপর থেকেই আপনাকে টেলিফোনে ধরবার চেষ্টা করছি।"

সন্তুর সঙ্গে কথা শেষ করার পর কাকাবাবু একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। অরিজিৎ-এর ওপর তাঁর রাগটাও কমে গেল। সে বেচারা ওই বিষফল খেয়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়াটাই অদৃশ্য হওয়া ভেবেছে। এইজন্যই ঝোপেঝাড়ে যেসব অচেনা ফলটল ফলে থাকে, তা হুট করে খেতে নেই। নিজের ভুলের জন্য অরিজিৎ যথেষ্ট শাস্তি পেয়েছে।

কিন্তু কাস্তে-পাহাড়ের চূড়ার কাছে যে এসে হঠাৎ হানা দিল, সে কি কোনও ছদ্মবেশী মানুষ, না, সত্যিই ইয়েতি!

কাকাবাবু ঠিক করলেন, আবার ওই পাহাড়ের চূড়ায় একবার যেতে হবে!

কাগজে সব খবর ছাপা হয় না। বিশ্বসংসারে যা ঘটে রোজ, তার কতটুকুই বা ছাপা হয়। এ-খবরটাও ছাপা হয়নি। অবশ্য আমরা ছাপানোর চেষ্টাও করিনি। না করার দুটো কারণ ছিল। আগে-আগে দু-চারবার কাগজঅলাদের অনেক বলে-কয়ে হাতে-পায়ে ধরেও কোনওদিন আমাদের খবর ছাপাতে পারিনি। ওরা আমাদের নিয়ে ঠাট্টা করেছে, মজা করেছে। বলেছে, আপনারা ব. গো. গ. স. নয়, আপনারা হলেন বোগাস। কাজেই আমরা আর ও-পথ মাড়াই না। কে যাবে অপমান সইতে কাগজঅলাদের কাছে। বঙ্গীয় গোয়েন্দা গল্পলেখক সমিতিকে যারা বোগাস বলে, তারা অভদ্র ছাড়া আর কী।

এবারে আরও একটা কারণ ছিল, যার জন্যে কারও কাছে আমাদের যাবার উপায় ছিল না। আমরা ঠিক করেছিলাম, এবার আমরা যা করব—একেবারে গোপনে করব, শুধু গোপনেও নয়, এমনভাবে করব যাতে কাকপক্ষীও না জানতে পারে। আমরা তাই এবারের সভার নাম দিয়েছিলাম, গোয়েন্দা-লেখক গুপ্তসভা। কার্যকরী সমিতির সভা আর কি। সভা বড় করার ইচ্ছে আমাদের ছিল না। মাত্র দশ-বারোজনের সভা। সত্যি বলতে কী, এটা একরকম প্রস্তুতি-সভা। মোটামুটি সব ঠিক হয়ে গেলে বেশ বড় করে এক সারা ভারত গোয়েন্দা-লেখক-সভা করার ইচ্ছে ছিল।

কালীকরালী বিশ্বাস, যিনি 'আলেয়া' ছদ্মনামে চল্লিশ-পঞ্চাশটা রহস্য কাহিনী লিখেছেন, তিনি অতি সজ্জন লোক। এবং ধনী লোক। বই লিখে ধনী নয়, পৈতৃক ধনে ধনী। করালীবাবু প্রস্তাব করেছিলেন, পাণ্ডবেশ্বরের কাছে তাঁদের একটা ভাঙা কুঠি আছে। কোলিয়ারি উঠে যাবার পর ওই কুঠি ভূতের বাড়ি হয়ে পড়ে আছে, জায়গাটা বেশ গা-ছমছম-করা, কাছাকাছি কোনও গাঁ-গ্রাম নেই, গোয়েন্দা গুপ্তসভার উপযুক্ত জায়গা হতে পারে।

আমরা সবাই রাজি হয়ে গেলাম। থাকা, খাওয়া, অণ্ডাল থেকে আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা করালীবাবুই করবেন বললেন। আমরা হব তাঁর অতিথি।

গুপ্তসভায় যোগ দিতে গিয়ে দেখি, আমাদের বারোজনের মধ্যে তিনজন আসতে পারেননি। একজন ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়েছেন, একজন বাতে কাবু। আর দুলাল দত্ত মিনিবাসের গুঁতো খেয়ে হাত ভেঙেছে। দুলাল বেশ বলিয়ে-কইয়ে ছেলে। কম বয়েস, গোটাদশেক মাত্র বই লিখেছে, তাতেই তার নামডাক হয়েছে যথেষ্ট। সে নাকি ফরাসি কায়দায় গোয়েন্দা-গল্প লেখে।

তা আমরা ন'জনে পাণ্ডবেশ্বরে জমায়েত হলাম গুপ্তসভা করতে। কুঠি-বাড়ি দেখে চোখ-মন ভরে গেল। বেশ পুরনো বাড়ি। ভাঙাচোরা। দেওয়ালে ফাটল। মাথার ছাদ ভেঙে পড়ো-পড়ো। ইঁদুর, গিরগিটি, ছুঁচো, আরশোলার অভাব নেই। ভাঙা দরজা-জানলা। সাপখোপও হয়তো আছে। তবে ডিসেম্বর মাসের কড়া শীত বলে আর গর্ত ছেড়ে বেরোচ্ছে না।

কুঠির চারদিক আগাছায় ভরা। দু-চারটে বড়সড় গাছ ছাড়া বাকি সবই আগাছা। কুলঝোপ, বনতুলসী, আকন্দ, কাঁটাগাছ, নয়নতারা।

বাড়ি যেমনই হোক, করালীবাবু লোকলশকর লাগিয়ে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা মন্দ করেননি। টাকা ফেললে কী না হয়। বাঘের দুধও জুটে যায়।

রাত্রে আমাদের গুপ্তসভার অধিবেশন বসল। চমৎকার ব্যবস্থা। বসার জায়গা বলতে ভাঙা চেয়ার, তে-পায়া টুল, মচকানো বেঞ্চি। প্যাকিং বাক্স। একটা হেলে-পড়া গোল টেবিলও ছিল। আলো বলতে লণ্ঠন। লণ্ঠনের কাচ ছিল নীল রঙ করা। ফলে আলোর চেয়ে অন্ধকারটাই বেশি জমছিল। আর আমরা মাথা থেকে পা পর্যন্ত, যে যা পেরেছি, গরম পোশাকে মুড়ে বসে পড়েছি। চা, সিগারেট, চুরুট, যার যা ইচ্ছে নাও আর খাও।

করালীবাবুকে সভাপতি করে আমাদের সভা যখন মাঝপথে, বেশ জমে উঠেছে আলোচনা, তখন কে একজন ভারী গলায় বারকয়েক কেসে উঠল। আমরা কান করলাম না। আমাদের মধ্যেই কেউ হবে। যা শীত আর ঠাণ্ডা, হাঁচি-কাসি তো হবেই।

প্রতুল মুখুজ্যেকে লোকে বলে বাঙালি গোয়েন্দা-লেখকদের রাজা। গোয়েন্দা সম্রাট। ওঁর বইয়ের সংখ্যা বিরাশি। উনি বলছিলেন, আমাদের উচিত একটা গিল্ড করা। বিদেশে এ-রকম অনেক গিল্ড, অ্যাসোসিয়েশান আছে গোয়েন্দা লেখকদের। গিল্ড না থাকলে আমরা নিজেদের স্বার্থ আর বাঁচাতে পারব না। লোকে আমাদের ছোট নজরে দেখবে। সাহিত্যিক, সমালোচক, মায় পাবলিশাররাও সম্মান দেবে না। আমরা কোনওদিন মেডেল বা পুরস্কার পাব না।

প্রতুল মুখুজ্যের কথা শেষ হতে আমরা সবাই যখন হাততালি দিচ্ছি, তখন হঠাৎ আবার সেই কাসির শব্দ। এবার ভারিক্কি কাসি। তারপর কার যেন বিশ্রী গলা শুনলাম, "স্টপ ইট। যত্ত সব ফেকলুর দল।"

কে? কে কথা বলল? ফেকলুর দল মানে?

আমরা সবাই মুখ ঘুরিয়ে লোকটাকে দেখার চেষ্টা করলাম। অন্ধকারে ঠাওর করা

যায় না।

প্রতুল মুখুজ্যে কড়া গলায় বললেন, "কে কথা বলল ?"

"আমি।" গলা তো নয়, যেন এঞ্জিনের ভোঁ।

"কে আপনি ?"

"পাঁচকড়ি পালিত।"

পাঁচকড়ি পালিত ! আমরা অবাক। এমন নাম তো আমাদের কারও নয়। কে পাঁচকড়ি পালিত ? জীবনেও এমন নাম শুনিনি। পাঁচকড়ি নামে এক বিখ্যাত গোয়েন্দা-লেখক ছিলেন এককালে। কিন্তু তিনি তো স্বর্গে। পাঁচকড়ি ?!

করালীবাবু বললেন, "পাঁচকড়ি পালিত বলে কেউ এখানে নেই। তুমি কে ? ঠিক করে বলো ?"

অট্টহাসি না হলেও একটা হাসি শোনা গেল। তারপর দেখি, প্রায় দরজার কাছ থেকে একটা লোক উঠে দাঁড়াল। অন্ধকারে ছাই দেখাই যায় না ভাল করে, তবু মনে হল, লোকটা বেজায় মোটা, বেঁটে। একেবারে পিপের মতন। কালো কম্বলে আপাদমস্তক ঢেকে রাখলে যেমন দেখায় মানুষকে, ভূতের মতন, সেইরকম দেখাচ্ছিল। বোধহয় কালো কম্বল কেটে প্যাণ্ট-কোট বানিয়েছে, কিংবা ভুট কম্বলের অলেস্টার চাপিয়ে এসেছে। গলায় মাফলার। মাথায় টুপি।

"হিয়ার আই অ্যাম, পাঁচু পালিত। পি. পি.।"

খগেনবাবু বললেন, "তুমি পি. পি. হও, আর হিপি হও, তুমি এখানে কেন ? কে তোমায় ঢুকতে দিয়েছে ? এটা আমাদের গুপ্তসভা। সিক্রেট মিটিং। তুমি এলে কেমন করে ! আশ্চর্য।"

পাঁচু পালিত রগড়ের গলায় বলল, "আমি কেমন করে ঢুকলাম সেটা তোমাদের মাথায় ঢুকলে তোমরা তো মানুষ হতে। তোমরা গাধা।"

আমরা গাধা। লোকটা বলে কী। আমাদের এখানে প্রতুল মুখুজ্যে, রজনী সারখেল, খগেন পুরকায়স্থর মতন বিখ্যাত গোয়েন্দা-লেখকরা রয়েছেন, রয়েছেন করালীবাবু, এঁরা শুধু সুপরিচিত লেখক নন, বয়স্ক ব্যক্তি, এঁদের গাধা বলছে লোকটা। কী আস্পর্ধা।

জগদীশ বসাকের গলা পেলাম। রেগে গিয়েছে। চিৎকার করে বলল, "তুমি কে হে, অসভ্য বাঁদর ইতর কোথাকার ? হু আর ইউ ? এখানে কেমন করে ঢুকেছ ? তোমায় কে আসতে দিয়েছে ? আর-একটা যদি কথা বলো, মেরে ফ্ল্যাট করে দেব। যাও, বেরিয়ে যাও। না গেলে, ঘাড় ধরে বার করে দেব।"

জগদীশের হুঙ্কার শুনে মনে হল, পাঁচু পালিতকে সে হয়তো সত্যিই মারধোর করবে। জগদীশ সেটা করতে পারে। রগচটা লোক। বয়েসও বছর চল্লিশ। এক সময় বক্সিংয়ে মেডেল পেয়েছে মুঠো-মুঠো।

ভেবেছিলাম পাঁচু পালিত ভয় পাবে। কিন্ত হায় হরি, ভয় কোথায়, লোকটা বরং আরও

তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বলল, "ঘাড় ধরবে কে? জগদীশ বসাক নাকি? এসো, ধরো ঘাড়। তারপর দ্যাখো তোমার কী অবস্থা হয়। কান ধরে দু' গালে দুটি থাপ্পড় মেরে থানায় ভরে দেব।"

থানা! থানায় ভরে দেবে? ব্যাপারটা কী? পাঁচু পালিত থানায় ভরে দেবার ভয় দেখাচ্ছে। তা ছাড়া ও জগদীশের নাম জানল কেমন করে?

জগদীশ প্রায় উঠে পড়তে যাচ্ছিল, করালীবাবু তাকে বসিয়ে দিয়ে বললেন পাঁচুকে, "এ-বাড়ি আমার। আমি এখানে বন্ধুদের নিয়ে বসে মিটিং করছি। তুমি কার হুকুমে এখানে এসেছ? কেন এসেছ? আমরাই তো তোমাকেই থানায় দিতে পারি। তুমি কে?"

পাঁচু তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, "আমায় থানা চেনাবেন না, করালীবাবু। আমার নাম পাঁচকড়ি পালিত, ওরফে পাঁচু পালিত, ওরফে পি. পি., ওরফে পাজির পাঝাড়া, ওরফে পাষণ্ড পীড়ন, ওরফে পুলিশ..."

"পুলিশ!" আমরা যেন আঁতকে উঠলাম।

পাঁচু পালিত উপহাসের গলায় বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। দেখেছেন পুলিশ?"

প্রতুল মুখুজ্যে হঠাৎ নরম হয়ে বললেন, "পুলিশ দেখব না! কত রকম পুলিশ দেখলাম? থানা-পুলিশ, ট্রাফিক-পুলিশ, রেল-পুলিশ, জল-পুলিশ আমাদের তো ভাই পুলিশ নিয়েই কারবার"।

পালিত মানে পি. পি. একটা সিগারেট ধরাল। ওর কাছেই ছিল বোধহয়। বলল, "লাশ-পুলিশ নিশ্চয় দেখেননি।" পালিত এবার আর তুমি-টুমি বলল না। সম্মান দেখিয়েই কথা বলল।

লাশ শুনে আমরা থ। সে আবার কী?

প্রতুল মুখুজ্যে হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, "সেটা কী ভাই?"

পাঁচু পালিত শোঁ-শোঁ করে সিগারেট টানতে লাগল। গন্ধটা বিড়ির মতন। বারকয়েক কাসল। তারপর বলল, "লাশ-পুলিশ হল সেই পুলিশ, যারা লাশ উদ্ধার করে।"

"মানে?" করালীবাবুর গলা উঠল না ভাল করে।

পালিত বলল, "মানে আজ একটা লাশ পড়ার কথা।"

"লাশ। কোথায়?"

"এ-বাড়িতে।"

"এ-বাড়িতে?" আমরা চমকে উঠে বললাম।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এ-বাড়িতে। এখানে। এই ঘরে।"

আমরা শিউরে উঠলাম। এ-বাড়িতে, লাশ! লোকটা বলে কী।

করালীবাবু বললেন, "কে বলল লাশ পড়বে?"

"আমি বলছি," পাঁচু যেন ধমক মারল। তারপর হঠাৎ বলল, "আপনারা এই ভূতুড়ে' বাড়িতে কেন এসেছেন, মশাই?"

"সভা করতে।"

"সভা করার আর জায়গা ছিল না।"

"থাকবে না কেন ?···তবে কী জানেন পাঁচুবাবু, আমরা হলাম গোয়েন্দা বইয়ের লেখক। বাঙালি লেখক। আমরা একটু অন্যভাবে সভাটা করব ভেবেছিলাম রোমাঞ্চকরভাবে, নতুন ভাবে।"

পাঁচু বলল, "আপনারা যে কী, আমি জানি। আপনাদের খবরাখবর অল্পবিস্তর জেনে নিয়েছি। আপনারাই শুধু জানেন না, কাল আপনারা এখানে আসার পর থেকে আপনাদের উপর নজর রাখা হচ্ছে।

খবরটা সত্যিই আমাদের জানা ছিল না। চমক লাগল। কে বা কারা যে আমাদের ওপর নজর রাখছে, তাও বুঝলাম না। নজর রাখার লোক কোথায় ? আমরা ছাড়া আছে তো মাত্র তিনটি লোক, রাখাল, ভোলা আর পল্টু। তিনজনই কাজের লোক। রান্নাবান্না-জল তোলা, বিছানা পাতা, ফাই-ফরমাশ খাটা—সবই তারা করছে। পল্টুটা আবার ছোঁড়া গোছের। এরা সকলেই করালীবাবুর লোক। তা হলে নজরটা রাখবে কে ? সিকি মাইলের মধ্যে কোনও জনবসতি নেই। শুধু মাঠ আর ঝোপঝাড়।

প্রতুল মুখুজ্যে বিনীতভাবে বললেন, "আমাদের ওপর চোখ রেখেছেন মানে ? আমরা কি ক্রিমিন্যাল ?"

পাঁচু বলল, "আপনারা ক্রিমিন্যাল নন তার প্রমাণ কী ? এত জায়গা থাকতে এখানে এভাবে আপনারা আসবেন কেন সভা করতে ?"

করালীবাবু বললেন "এ তো বড় অন্যায় কথা পাঁচুবাবু। আমরা আমাদের খুশিমতন জায়গায় সভা করতে পারব না ? বিশেষ করে এই বাড়ি যখন আমার।"

পাঁচু বলল, "আপনারা এমন বাড়িতে আসবেন কেন, যে-বাড়িতে একটা লাশ পাওয়া যাবে।"

"লাশের কথা আমরা জানতাম না, বিশ্বাস করুন।"

পাঁচু সিগারেটটা ফেলে দিল। নিবিয়ে দিল। বলল, "ও-কথা আমার কাছে বলে লাভ নেই। কোর্টে বলবেন।"

"কোর্ট ?" খগেনবাবু আঁতকে উঠে বললেন, "এর মধ্যে আবার কোর্টকাছারি আসে কেন ? সভা করতে এসে ফ্যাসাদে পড়ে গেলুম যে !"

আমাদের মধ্যে বটকৃষ্ণ সেন খুবই ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। বটকৃষ্ণ একসময় আইন পড়তে ঢুকেছিলেন। ছেড়ে দিয়ে এক সওদাগরি অফিসে কাজ করতে ঢোকেন। কুড়ি বছর বয়েস থেকে গোয়েন্দা গল্প লিখছেন। এ-যাবৎ পঞ্চাশটা বই লিখেছেন। তাঁর বইপত্র তেমন বিকোয় না। তবে তিনি লেখেন ভাল।

বটকৃষ্ণ এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। এবার বললেন, "আমাদের সন্দেহ করার কারণ ?"

পাঁচু বলল, "কারণটা সহজ। আপনারা আমায় কারণ জিজ্ঞেস করবেন না। এখন বলুন, লাশটা কার হবে, বা হতে পারে ?"

এ তো মহা মুশকিল হল। যে-লাশ আমরা দেখলাম না, কোনও সম্পর্ক নেই যে লাশের সঙ্গে, সেই লাশের লোকটা কে তা আমাদের বলতে হবে? পাঁচু কি পাগল? না, আমাদের সঙ্গে অকারণ ফাজলামি করছে?

বটকৃষ্ণ বলল "এটা কেমন কথা হল পাঁচুবাবু? লাশ কি আমরা দেখেছি, না জানি?"

পাঁচু বলল, মশাই লাশ দেখে তাকে চেনা সহজ। আপনার লাশ যদি পড়ে থাকে, আমরা সবাই চিনতে পারব। কিন্তু বাজে কথা থাক। রাশি রাশি গোয়েন্দা বই লিখেছেন, আর একটা লাশের বেলায় সবাই ন্যাকা সাজতে চাইছেন।"

"এ তো বড় জ্বালা হল করালীবাবু? এ আপনি আমাদের কোথায় নিয়ে এলেন?" প্রতুল মুখুজ্যে বললেন।

করালীবাবু বিরক্তবোধ করছিলেন। বললেন, "পাঁচুবাবু, আপনার মাথায় ঘিলু আছে?"

"কেন?"

"ঘিলু থাকলে এসব কথা বলতেন না।"

পাঁচু বলল, "আপনাদের মাথায় যতটা ঘিলু আছে আমার মাথায় তার চেয়ে বেশি বই কম নেই। তবে কী জানেন করালীবাবু, আপনাদের মাথার ঘিলু ভেজাল তাতে কোনও কাজ হয় না।"

"কী বলতে চান আপনি।"

পাঁচু রঙ্গ করে বলল, "ডোণ্ট মাইণ্ড করালীবাবু। আপনারা যারা এখানে এসেছেন, তাঁরা এক-একটি গবেট।"

"হোয়াট?"

"রাগ করবেন না।···ওই যে আপনাদের গোয়েন্দা সম্রাট, কিং···মানে প্রতুল মুখুজ্যে। উনি পাঁচ ধামা বই লিখেছেন। উনি নাকি লাশের পর লাশ ফেলেন, গায়েব করেন। কিন্তু আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, উনি জীবনে একটা লাশও দ্যাখেননি। কী মশাই, ঠিক কি না। সত্যি কথা বলবেন। মিথ্যে বললে আপনাকে থানায় ভরব।"

প্রতুল মুখুজ্যে বললেন, "রাস্তা দিয়ে মড়া বয়ে নিয়ে যেতে দেখেছি, লাশ দেখিনি। পাড়ায় কেউ মারা গেলে দেখেছি।"

"ওগুলো লাশ নয়, মৃতদেহ। সোজা বাংলায় মড়া লাশের গ্ল্যামার আছে, মড়ার নেই। যাকগে, খগেনবাবু, আপনি লাশ, রিভলবার, পিস্তল, ছোরা দেখেছেন?"

খগেনবাবু বললেন, "ছোরা দেখছি। আর পিস্তল না দেখলেও কলকাতার সার্জেণ্টদের কোমরে বাঁধা চামড়ার খাপ দেখেছি পিস্তলের।"

পাঁচু হেসে উঠল। তারপর ধরল, জগদীশকে। টিপ্পনি কেটে বলল, "এই যে জগদীশ বসাক। তুমি চাঁদ, 'বিষ'-এক্সপার্ট তোমার ওই ছেলেভুলনো বইগুলোতে ফটাফট বিষ খাইয়ে লোক মারো। তুমি বিষ দেখছ? আরসেনিক কাকে বলে জানো? কভি-ভি দেখা হ্যায়?

পটাসিয়াম সায়োনাইড-এর গন্ধ শুঁকেছো কখনও? সাপের বিষ কতরকম হয় জানো? কোন-কোন সাপের বিষ থাকে বলতে পারো? ···তুমি তা সারা জীবন বাতের মালিশ ছাড়া কিছু দ্যাখোনি। কী জানো হে তুমি বিষের?"

জগদীশ একবারে চুপ। কথা বলতে পারল না।

তারপর আমার পালা। পাঁচু আমায় যেন খোঁচা মেরে বলল, "ওহে অখিলবন্ধু, তুমি তো একটা চোর। তুমি যা বই লেখো সব চুরি। কলকাতার রাস্তা থেকে চার-ছ' আনা দিয়ে ছেঁড়া-ফাটা ময়লা বই কেনো, আর সেইসব মেরে মেরে তোমার বই লেখা। তোমার ওই বইটা আমি পাতা উলটে দেখেছি। কী যেন নাম বইটার। 'তুফান এক্সপ্রেসে খুন'। অখাদ্য বই, অখাদ্য লেখা। চুরি বিদ্যেও জানতে হয়, তুমি তাও জানো না। তোমার আবার বারো আনা খুন গলায় ফাঁস লাগিয়ে। ওরে গাধা, নাইলন রোপ গলায় ফাঁস লাগিয়ে টানলেই মানুষ মরে না। কার গলা, কেমন গলা দেখতে হবে। একটা দেড়মনি মানুষের গর্দানে ফাঁস লাগাতে হলে কত মোটা, কী স্ট্রেংথের রোপ চাই, বলতে পারো? জানো, এর জন্য অংক জানা দরকার। গর্দানের বেড় আর দড়ির স্ট্রেংথ হিসেব করতে হবে। তুমি অংকেতে অক্কা। কেন বুজরুকি করতে চাও হে?"

আমি একেবার হতভম্ব। ভাগ্যিস সব অন্ধকারের মতন হয়ে আছে, নয়তো আমার দেখে থেকে অন্যরা হাসত।

অবশ্য আমার দশা আর অন্যদের দশায় তফাত কী পাঁচু পালিত কাউকেই ছাড়ছে না। এক একজনক ধরছে আর কচু কাটা করছে। খগেনবাবু, বটকৃষ্ণ, করালীবাবু কাউকেই রেহাই দিল না সে। মণি সমাদ্দারকে পথে বসালে। ধীরাজ, গৌতমকে নাকানিচোবানি খাওয়ালে। মানে, আমাদের সক্কলকে একেবারে যেন গাঁটরি বেঁধে আছাড় মারল।

আর ঠিক এই সময় আচমকা শুনি অ্যালার্ম বাজছে। মানে, অ্যালার্ম ঘড়ির ক্রিরিরিং ক্রিরিরিং আওয়াজ। আমরা একেবারে থ। অ্যালার্ম ঘড়ি বাজল কেমন করে? আমাদের সঙ্গে কেন, এ-বাড়িতে কোথাও অ্যালার্ম ঘড়ি নেই। ব্যাপারটা কী?

ঘরের মধ্যে অ্যালার্ম ঘড়ি বাজছে তো বাজছেই। শেষে যখন থামল, তখন গম্ভীর গলায় পাঁচু পালিত বলল, "সময় হয়ে গেছে। আর তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে লাশ পড়বে। বি রেডি।"

কী সর্বনাশ, তা হলে কি ওই ঘড়িটায় টাইম বোমা ফিট করা আছে? আমার হাত-পা কাঁপতে লাগল। গলা শুকিয়ে কাঠ।

অন্যদেরও একই অবস্থা।

পালাবার জন্য উঠেই পড়েছিলাম, হঠাৎ একটা আওয়াজ হল। কলিংবেলের আওয়াজের মতন। আলোর চিড়িক্ মারল একটু। তারপর কী যেন পড়ে গেল মেঝেতে শব্দ করে। নীল কাচের লণ্ঠন ভেঙে চুরমার। টেবিলটাও উলটে গিয়েছে। ঘর অন্ধকার। ঘুটঘুট করছে।

কার লাশ পড়ল? আমার যে নয়, আমি বুঝতে পারছিলাম। হাত-পা থরথর করে

কাঁপছে। গলা দিয়ে শব্দ ফুটছে না। নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এসেছে।

ঘরে কোনও সাড়াশব্দ নেই। শুধু একটা বারুদ-বারুদ গন্ধ বেরোচ্ছিল।

অনেকক্ষণ পরে করালীবাবুর গলা পেলাম, "হায় ভগবান।"

করালীবাবু তা হলে বেঁচে আছেন। আমি সাড়া দিলাম, "করালীবাবু।"

"অখিলবন্ধু। তুমি আছ। কে গেল তা হলে ?"

প্রতুল মুখুজ্যের গলা পাওয়া গেল। বললেন, "আমি আছি।"

একে-একে সবাই সাড়া দিতে লাগল। দেখলাম, আমরা সবাই বেঁচে আছি। তা হলে লাশটা কার পড়ল ? কেই বা গুলি চালাল। পাঁচুর কোনও সাড়াশব্দ নেই কেন ?

জগদীশ পকেট থেকে দেশলাই বার করে জ্বালল। দেখি, বিরাট একটা লাশ মেঝেতে পড়ে আছে। পাঁচু পালিতেরই।

কী সর্বনাশ !

করালীবাবু 'আলো আনো, আলো আনো' বলে চেঁচাতে লাগলেন। আমরা তখন ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। পাঁচু পালিতকে খুন করার দায় যে আমাদের বর্তাবে ! হায় ঈশ্বর !

রাখাল আর ভোলা আলো নিয়ে ছুটে এল।

হ্যাঁ, পাঁচু পালিতই মেঝেতে পড়ে আছে। তার ওভারকোটের বোতাম খোলা। একটা অ্যালার্ম ঘড়ি তার বুকের কাছে ঝুলছে। দড়ি দিয়ে বেঁধে গলায় ঝুলিয়েছিল। ডান হাতে একটা পিস্তল।

আশ্চর্য, কোথাও কোনও রক্তের দাগ নেই। কপালে না, গলায় না, মাথায় নয়।

তা হলে ?

করালীবাবু ভয়ে-ভয়ে বসে পড়ে পাঁচুর নাড়ি দেখতে লাগলেন, বললেন, "ব্যাটা বেঁচে আছে !"

জগদীশ পাকা গোয়েন্দার মতন পকেট থেকে রুমাল বার করে পাঁচুর পিস্তলটা হাত থেকে টেনে নিল। দেখল ভাল করে। তারপর বলল, "করালীদা, এটা-থিয়েটার যাত্রার পিস্তল। দেখুন। টোটা লাগিয়ে ঘোড়া টেপে।"

আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়লাম পিস্তল দেখতে।

আর তখন পাঁচু তার বাঁ হাত তুলে মুঠোয় রাখা কাগজটা এগিয়ে দিল।

আমিই নিলাম কাগজটা। দেখলাম। লেখা আছে, 'মফস্বলের এক গোয়েন্দা-লেখকের কেরামতি দেখলাম। পি. পি.।

"সাতচল্লিশ লক্ষ বীজকণিকা!" কর্নেল নীলাদ্রি সরকার 'নেচার' পত্রিকার পাতা থেকে মুখ তুলে বললেন, "কল্পনা করো, জয়ন্ত! একটা অর্কিডের ফুল শুকিয়ে যাওয়ার পর বাতাসে চারদিকে ছড়িয়ে যায় সাতচল্লিশ লক্ষ বীজ, যা সাধারণ মাইক্রোস্কোপে দেখতে পাওয়া যায় না। এমনই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জিনিস! তাই আমি বলি, যদি সত্যিকার কোনও রহস্য থাকে, তা আছে প্রকৃতিজগতেই।"

কর্নেলের মুখে বিস্ময় মেশানো একটা দিব্য ভাব লক্ষ্য করলাম। বললাম, "অর্কিড নিয়ে এই সক্কালবেলায় মাথাখারাপ করার কারণ কী?"

"ও। তোমাকে আসল কথাটা বলাই হয়নি।" কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুটটি ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "এগুলোকে বলা হয় ক্রাউন অর্কিড। দুটো কারণ আছে এর। একটা হল, এই অর্কিডের ফুল সোনালি রঙের ক্রাউন বা রাজমুকুটের মতো দেখতে। দ্বিতীয়টা হল, এগুলো খুব উঁচু গাছের ডগার দিকের ডালে থাকে। কাজেই ফুল ফুটলে সেই গাছটাকে মনে হয় মুকুটপরা রাজা। মাটি থেকে অন্তত চল্লিশ ফুট উঁচু হওয়া চাই গাছটা। গতবার ক্যালিফোর্নিয়ার ইয়োসোমিটি ন্যাশনাল পার্ক এলাকার রেডউড গাছের ডগায় ক্রাউন অর্কিড দেখে এসেছি। জায়গাটার নাম মারিপোসা গ্রোভ। তো আজকের কাগজে—"

ডোরবেল বাজল। কর্নেল বিরক্ত হয়ে হাঁকলেন, "ষষ্ঠী!"

একটু পরে ষষ্ঠী এক ভদ্রলোককে নিয়ে এল কর্নেলের ড্রয়িংরুমে। ভদ্রলোকের পরনে যেমন-তেমন প্যান্টশার্ট, পায়ে সাধারণ চপ্পল। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশের মধ্যে। মুখে পোড়খাওয়া ভাব। বিষণ্ণ এবং উত্তেজিত দেখাচ্ছিল তাঁকে। নমস্কার করে বললেন, "আমিই গতরাতে আপনাকে ট্রাংককল করেছিলাম ভীমগড় থেকে।"

কর্নেল বললেন, "আপনিই কাত্যায়ন সিংহ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাকে অকারণ পুলিশ অ্যারেস্ট করে দুর্ভোগে ফেলেছে। গতকাল জেলা জজের কোর্টে জামিনে ছাড়া পেয়েছি। আমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই সার! ছোট কুমারবাহাদুর মরার সময় নাকি আমার নাম করে গেছেন। অথচ আমি তখন ধারে-কাছে ছিলাম না।"

কাত্যায়নবাবু বললেন, "আমাকে বাঁচান সার! কাগজে আপনার কত কীর্তিকলাপ পড়েছি। একমাত্র আপনিই আমাকে বাঁচাতে পারবেন।"

"আপনি আগে কফি খেয়ে চাঙ্গা হোন। তারপর বলুন কী হয়েছে।"

কর্নেলের হাঁকে ষষ্ঠীচরণ ঝটপট কফি তৈরি করে আনল। কাত্যায়নবাবু কফিটা ফুঁ দিয়ে তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেললেন। তারপর রুমালে মুখের ঘাম মুছে ঘটনাটি শোনালেন। সংক্ষেপে তা হল এই ঃ

"ভীমগড় এস্টেটের রাজা খেতাবধারী হর্ষবর্ধন রায়ের দুই পুত্র জয়বর্ধন এবং আনন্দবর্ধন। তাঁরা পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই। প্রায় সমবয়সী দুই সৎ ভাইয়ের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই খুব একটা বনিবনা ছিল না। ভারত সরকারের কাছে রাজাবাহাদুর হর্ষবর্ধন বার্ষিক নয় লক্ষ টাকা ভাতা পেতেন। পরে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আমলে সেই ভাতা বা 'প্রিভি পার্স" আইন করে বন্ধ হয়। রাজাবাহাদুর মারা যান। দুই ভাইয়ের মধ্যে পারিবারিক সম্পত্তি ভাগবণ্টন করা হয়। কিন্তু বিবাদ বাধে একটা মণিমুক্তাখচিত সোনার মুকুট নিয়ে। মুকুটটি মুঘল আমলের। রাজাবাহাদুর মুকুটটি বাড়ির একাংশে শিবমন্দিরে কোনও গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রাখেন। কারণ প্রিভি পার্স আইনের ফলে রাজভাণ্ডারের সব সোনাদানাও সরকার আটক করেছিলেন।

মৃত্যুর আগে রাজাবাহাদুর সেই গোপন সিন্দুকের একটি অদ্ভুত তালাচাবি তৈরি করিয়ে এনেছিলেন। তালাটি দুটি চাবি ছাড়া খোলা যাবে না। একটি চাবি জয়ের কাছে এবং দ্বিতীয় চাবিটি আনন্দের কাছে আছে! তার ফলে, সিন্দুক খুলে রাজমুকুট বের করতে হলে দুই ভাইকেই একসঙ্গে খুলতে যেতে হবে।

এক সপ্তাহ আগে ভোরবেলা মন্দিরের পুরোহিত কানু ভট্টচার্য মন্দিরের ভেতর ছোট কুমারবাহাদুর আনন্দকে পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁর মাথার পেছনে ভোঁতা কোনও জিনিস দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। কিন্তু তখনও তাঁর মৃত্যু হয়নি। কানু ভট্টচার্য তাঁকে এই অবস্থায় দেখে মুখে জল দিয়ে ওঠানোর চেষ্টা করেন। তখন নাকি আনন্দবর্ধন অতিকষ্টে উচ্চারণ করেন "কা-কা-কা—" তারপর তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে পুরোহিতের মুখে 'কা-কা-কা' শুনে রাজপরিবারের ম্যানেজার এই কাত্যায়ণ সিংহকে গ্রেফতার করে।..."

এ পর্যন্ত শোনার পর কর্নেল বললেন, "কা-কা-কা বলে মারা যান আনন্দবর্ধন ?"

কাত্যায়নবাবু বললেন, "হ্যাঁ সার।"

"কিন্তু পুরোহিতের নামের আদ্যক্ষরও তো কা ?"

"আমি বললাম পুলিশকে। কিন্তু পুলিশের মতে, কানু ভট্টচার্য রোগা বেঁটে হাড়জিরজিরে

লোক। বাঁ হাত জন্ম থেকে সরু এবং পাঁকাটি। ডান হাতেও জোর নেই। তাঁর পক্ষে শক্তিমান যুবক আনন্দকে এক আঘাতে মেরে ফেলা সম্ভব নয়। তা ছাড়া ঘটনাস্থলে একটা লোহার মুগুর পড়ে আছে। তাতে রক্ত লেগে ছিল। কাজেই ওটা মার্ডার উইপন। ওই পনেরো কিলো ওজনের মুগুর তোলা কানু ভট্টাচার্যের পক্ষে সম্ভব নয়।"

"বড় কুমারবাহাদুর জয়বর্ধনের বক্তব্য কী?"

"উনি সার গোঁড়া মানুষ। বছর দুই আগে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ওঁর এক পায়ের হাড় ভেঙে যায়। পা কেটে বাদ দিতে হয় কলকাতার একটা নার্সিং হোমে। তাই উনি কাঠের পায়ে কষ্টে চলা ফেরাকরেন। তা-ও দু বগলে ক্রাচে ভর করে কোনও রকমে হাঁটাচলা করেন। উনি আমাকে সমর্থন করছেন। তা ছাড়া ওঁদের বাড়ি তিরিশ বিঘে জমি নিয়ে। চারদিকে পাঁচিল। বাড়ি থেকে মন্দির অন্তত সাতশো মিটার দূরে!"

"লোহার মুগুরটা কার?"

"মন্দিরের পাশে ছোট কুমারবাহাদুর আনন্দবর্ধনের ব্যায়ামের আখড়া। উনি মুগুর ভাঁজবেন। তাগড়াই মানুষ, সার। ওঁকে আমি ওই মুগুর তুলে মারতে পারি?" কাত্যায়নবাবু নিজের হাত দেখালেন। ফের বললেন, "খুব শক্তিমান খুনির কাজ সার।"

"ছোট কুমারবাহাদুরের কাছে সেই গোপন সিন্দুকের চাবি ছিল?"

আজ্ঞে হ্যাঁ! ওঁর হাতের মুঠোয় ছিল। মুকুট চুরি গেছে কি না দেখার জন্য বড় কুমারবাহাদুরকে ডাকা হয়েছিল। ওঁর চাবি প্রথমে তালায় ঢোকাতে হবে। তারপর ছোটর চাবি ঢোকালে তবে সিন্দুক খুলবে। সিন্দুক বলছি বটে, তবে ওটা শিবলিঙ্গের বেদি সার! বেদিটাই সিন্দুকের গড়ন। কালো পাথরে তৈরি। চাবির ছিদ্র, মানে তালার ওপর সিঁদুরের গাড় ছাপ। তাই তালার ছিদ্র দেখা যায় না।"

"সিন্দুক-বেদী খোলা হল?"

"পুলিশের সামনে খুললেন জয়বর্ধন।"

"ভেতরে মুকুট ছিল?"

"ছিল সার। ওটা পুলিশ আটক করেছে। আইনের বলে নাকি পুরনো জিনিস সরকার বাজেয়াপ্ত করতে পারেন।"

"হ্যাঁ। প্রিভি পার্স বাতিলের আইনেও পারেন। আবার ঐতিহাসিক বা পুরাদ্রব্য-সংক্রান্ত আইনেও সরকার এটা পারেন।" বলে কর্নেল সাদা দাড়িতে হাত বুলোতে থাকলেন। চোখ বন্ধ করে চেয়ারে হেলানও দিলেন।

বুঝলাম, প্রাজ্ঞ, রহস্যভেদী ঘটনার তথ্য থেকে থিওরি গড়ে তুলছেন এবার।

কাত্যায়নবাবু আবার করজোড়ে বললেন, "আমি রাজপরিবারের দু'শো টাকা মাইনের কর্মচারী সার। আমি বড় বিপদে পড়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। বড় কুমারবাহাদুরই আপনার কাছে যেতে বলেছিলেন।

কর্নেল মাথার টাকে এবার হাত বুলোচ্ছিলেন। চোখ বুজে বললেন, "আনন্দবর্ধন মৃত্যুর সময় কা-কা-কা বলেছিলেন ?"

"হ্যাঁ সার।

"রাজমুকুট পুলিশের কাছে আছে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।

"পুলিশের সামনে জরবর্ধন সিন্দুক-বেদির তালা খুললেন ?"

"আজ্ঞে। প্রথমে নিজের চাবি ঢুকিয়ে ঘোরালেন। তারপর ভাইয়ের চাবি দিয়ে।"

কর্নেল চোখ খুলে সোজা হয়ে বললেন। "ঘটনাস্থলে না গিয়ে কিছু করার নেই। যথাসময়ে আমি ভীমগড় যাব।"

কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ভীমগড় রাজপরিবারের ম্যানেজারবাবু চলে গেলেন।

পরদিন আমরা দু'জনে ভীমগড়ে গেলাম। রাজবাড়ির চারদিকে গভীর গড়খাই। তার ওপর একটা ব্রিজ আছে। গড়খাই এখন গ্রীষ্মে শুকনো। তিরিশ বিঘে মাটির চারদিকের পাঁচিল জেলখানার পাঁচিলের মতো উঁচু। তাই ব্রিজের ওপর দিয়ে ঢুকতে হয়। বিশাল ফটকে দরোয়ান আছে। কর্নেলের গলা থেকে বাইনোকুলার এবং ক্যামেরা ঝুলছে। হাতে প্রজাপতিধরা নেট-স্টিক, যা দেখতে গুটোনো ছাতার মতো। দরোয়ানকে দশটা টাকা দিয়ে রাজমন্দির দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন কর্নেল। দরোয়ানের কাছেই জানা গেল, মন্দিরে জাগ্রত দেবতার দর্শনে মাঝে-মাঝে ট্যুরিস্ট আসে। তাতে দরোয়ানের কিছু রোজগার হওয়া স্বাভাবিক।

ভেতরে ঢুকে দেখি, একটেরে বিশাল প্রাচীন মন্দির ঘন গাছপালার ভেতর মাথা তুলেছে। রাজপ্রাসাদ একটু তফাতে। তার ওদিকে একটা চৌকো পুকুর।

মন্দির দর্শনে পুরুতঠাকুর কানুহরি ভট্টচার্যকেও কিছু দক্ষিণা বা প্রণামী দিতে হল। কানুঠাকুর আমাদের গাইড হলেন। মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢুকে দেখলাম, কালো বেদিতে বসানো আছে প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ। কেমন একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ। কথায়-কথায় কর্নেল আনন্দবর্ধন কুমারবাহাদুরের মৃত্যুর ঘটনা জেনে নিলেন। কাত্যায়নবাবুর বর্ণনার সঙ্গে মিলে গেল। পেছন দিকে ব্যায়ামাগারটিও দেখলাম আমরা। ঘাসের ওপর মরচেধরা একটা পেল্লায় লোহার মুগুর পড়ে আছে। যে মুগুরটা মার্ডার উইপন, সেটা পুলিশ নিয়ে গেছে। কানু ভট্টচার্যের একটা হাত জন্মাবধি পঙ্গু। অন্য হাতে কোথায় আনন্দবর্ধনের লাশ পড়ে ছিল দেখিয়ে দিলেন।

কর্নেল সব দেখেশুনে বেরিয়ে এলেন। কানু ভট্টচার্য এসে বললেন, "দুধ-দুধ দিয়ে সাপ পুষেছিলেন রাজপরিবার। সেই সাপ দংশেছে। ওই ম্যানেজারবাবুই মুকুট চুরির লোভে মেরেছে ছোট কুমারবাহাদুরকে।"

কর্নেল বললেন, "মৃত্যুর সময় কোনও কথা বলেননি উনি ?"

"ওই তো বললাম, কা-কা-কা বলেই হেঁচকি উঠল। তারপর সব শেষ।"

"আমি একটু বড় কুমারবাহাদুরের সঙ্গে দেখা কবতে চাই।"

"ভাইয়ের শোক সামলাতে পারেননি। বনিবনা না থাকলেও ভাই তো বটে।" কানু ভট্টচার্য বললেন, "চলুন তো দেখি।"

হলঘরে আমাদের বসিয়ে পুরুতঠাকুর ভেতরে গেলেন। একটু পরে ক্রাচে ভর দিয়ে জয়বর্ধন এলেন। কর্নেল নিজের পরিচয় দিতেই তিনি খুব ব্যস্ত হয়ে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে বললেন ভট্টচার্যমশাইকে। তারপর বললেন, "আমিই কাত্যায়নকে আপনার কথা বলেছিলাম ও সম্পূর্ণ নির্দোষ! আমার ধারণা আনন্দ মৃত্যুর সময় যন্ত্রণা প্রকাশ করেছিল। বোকা ভট্টচার্য শুনেছে কা-কা-কা। আর পুলিশ তো সবসময় উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাতে ওস্তাদ! কর্নেলসায়েব! আমিও চাই আনন্দের মৃত্যু-রহস্যের কিনারা হোক।"

কর্নেল বললেন, "সিন্দুক-বেদির দুটো চাবিই তো এখন আপনার কাছে আছে।"

"আছে। দেখাচ্ছি।" বলে জয়বর্ধন পকেট থেকে দুটো রিঙে ভরা দুটো চাবি বের করে দিলেন।

কর্নেল চাবি দুটো খুঁটিয়ে দেখে বললেন, "কোনটা আপনার চাবি?"

জয়বর্ধন দেখালেন। বললেন, "আমার চাবি আগে তালায় ঢুকিয়ে তিনবার ঘোরাতে হবে। তবে আনন্দের চাবি তালায় ঢুকবে। অথচ বুঝতে পারছি না কেন আনন্দ ব্যর্থ-চেষ্টা করতে গেল?"

আমি বললাম, "উনি আপনার চাবির নকল তৈরি করে নিতেও পারেন।"

জয়বর্ধন একটু হাসলেন। "সেটাই আমার সন্দেহ ছিল। কিন্তু..."

কর্নেল বললেন, "কিন্তু ওঁর কাছে সেই নকল চাবি পাওয়া যায়নি।"

জয়বর্ধন বললেন, "যে ওকে মেরেছে, সে-ই ওটা নিয়ে পালিয়ে গেছে। কানুঠাকুর ধপাস করে একটা শব্দ শুনেই মন্দিরে গিয়ে ঢুকেছিল। বেগতিক দেখে মন্দিরে পেছনের দরজা দিয়ে খুনি পালিয়ে যায়। আমি গিয়ে দেখেছিলাম পেছনের দরজা খোলা ছিল।"

"কাত্যায়নবাবু কোথায় আছেন এখন?"

"ওর বাড়িতে থাকতে পারে। বেচারা লজ্জায় কাউকেও মুখ দেখাতে পারছে না। বাজার এরিয়ায় ওর বাড়ি।"

কর্নেল জয়বর্ধনের চাবিটা দেখিয়ে বললেন, "এতে ইংরেজি 'ভি' লেখা আছে কেন?"

"বাবার খেয়াল। আমার চাবিতে 'ভি' এবং আনন্দের চাবিতে 'পি' লেখা আছে দেখুন।"

"রায়সায়েব! আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই। সঠিক জবাব পেলে কাত্যায়নবাবুকে বাঁচানো যাবে।"

জয়বর্ধন গম্ভীর হয়ে বললেন, "বলুন!"

"আপনি কি নিশ্চিত যে, আপনার চাবিটা সে রাতে কেউ চুরি করে নিয়ে গিয়ে বেদির তলায় ঢুকিয়ে রেখে আসেনি, যাতে আনন্দবর্ধনের মুকুট চুরিতে সুবিধে হয়?"

"কর্নেলসায়েব! ঠিক এটা আমারও সন্দেহ। আমার চাবি শোবার ঘরের আলমারিতে

লকারে ভরা ছিল। আমার স্ত্রী ঘটনার দিন কলকাতায় ছিলেন। সেই সুযোগ আমার কাজের লোক কাল্লু আনন্দের প্ররোচনায় টাকার লোভে কাজটা করতেও পারে। আমি তো সবসময় শোবার ঘরে থাকি না।"

"কাল্লুর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।"

জয়বর্ধন তেতোমুখে বললেন, "শয়তানটাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি। তবে পরে সন্দেহ হয়েছে, কা-কা-কা বলে আনন্দ কাল্লুর কথা বলতে চায়নি তো?"

জয়বর্ধন আমাদের চা-সন্দেশ খেতে পীড়াপীড়ি করছিলেন। কর্নেল খেলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চলি মিঃ রায়। পরে আবার দেখা হবে।"

একটা সাইকেল রিকশ নিয়ে আমরা এবার থানায় গেলাম। ও সি দিলীপ ব্রহ্ম কর্নেলকে দেখে অবাক হয়ে হাসতে-হাসতে বললেন, "কী কাণ্ড! আপনি ভীমগড়ে! আশা করি পাখি-প্রজাপতির খোঁজে আসেননি?"

"নাহ্ মি ব্রহ্ম!"

দিলীপবাবু চোখ বড় করে বললেন, "মাই গুডনেস! রাজবাড়ির মার্ডার কেস—"

হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে কর্নেল বললেন, "আমি রাজমুকুটটা একবার দেখতে চাই মিঃ ব্রহ্ম!"

একটু পরে দিলীপবাবু রাজমুকুটা নিয়ে এলেন থানার মহাফেজখানা থেকে। কর্নেল সেটা দেখার পর একটু হাসলেন, "মিঃ ব্রহ্ম, এটা নকল রাজমুকুট। সোনাটা রোলগোল্ড এবং পাথরগুলোও নকল।"

"বলেন কী!"

"হুঁ্যা। স্বর্ণকার দিয়ে পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন।"

"তা হলে আসলটা কাত্যায়ন হাতিয়ে নিয়েছে।"

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, "নাহ্! আমার থিওরি অনুসারে আসল রাজমুকট বড় কুমারবাহাদুরের ঘরে আছে। এখনই গিয়ে সার্চ করুন। পেয়ে যাবেন। দেরি করবেন না। আমি এখানে অপেক্ষা করছি।"

ও সি দিলীপবাবু সদলবলে বেরিয়ে গেলেন।

কর্নেলকে বললাম, "আপনি সিওর হলেন কী করে? যদি সত্যিই আসল রাজমুকুট জয়বর্ধন রায়ের ঘরে না পাওয়া যায়?"

কর্নেল হাসলেন। "পাওয়া যাবে। আমার থিওরি, ডার্লিং!"

"থিওরিটা কী?"

"খুব সহজ ব্যাপার। আনন্দবর্ধন জানতেন, তাঁর চাবি তালায় ঢুকবে না। কাজেই একা তিনি মুকুট হাতাতে যাবেন কেন? জয়বর্ধন ভোলার কথা বললেন। সেটা কি বিশ্বাসযোগ্য? আলমারির চাবি—বিশেষ করে যার ভেতর কিনা সিন্দুক-বেদির চাবি লুকনো আছে, সেই চাবি

জয়বর্ধন হেলাফেলায় রাখবার লোক? আসলে সে-রাতে দুই ভাই-ই গিয়েছিলেন মুকুট বের করতে। কানুঠাকুরের চেহারায় আফিমখোরের ছাপ আছে। নেশার ঘোরে ঘুমোচ্ছিলেন। ভোরবেলা নেশা কাটার পর মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে আনন্দবর্ধনকে পড়ে থাকতে দেখেন। উনি কিন্তু ধপাস শব্দের কথা বললেন না, তুমি নিশ্চয় শুনেছ!''

''হ্যাঁ। উনি বললেন, পুজো দিতে গিয়ে লাশ দেখতে পান।''

''কিন্তু জয়বর্ধন ধপাস শব্দের কথা বললেন। তখনই বুঝলাম, কী ঘটেছে। বৈমাত্রেয় ভাইকে সম্ভবত ভুলিয়ে-ভালিয়ে মুকুট দেখাতে নিয়ে এসেছিলেন। তারপর···''

কর্নেলের কথার ওপর বললাম, ''তা হলে জয়বর্ধন খুনি সাব্যস্ত হচ্ছেন। কিন্তু ওঁকে লোহার মুগুর আনতে দেখে আনন্দবর্ধনের ভয় পাওয়ার কথা।''

কর্নেল চুরুটের ধোয়ার মধ্যে বললেন. ''ভাইকে খুন করে পরে মুগুর এনে রক্ত মাখিয়ে ফেলে রেখেছিলেন।''

''কী করে বুঝলেন?''

''কা-কা-কা শব্দে।''

''তার মানে?''

''মানে খুব সোজা, জয়ন্ত। জয়বর্ধনের কাঠের পা দেখে মাথায় এল, ওটা মার্ডার উইপন করা যায়। কানুঠাকুর কা-কা-কা শুনেছেন। আসলে আনন্দবর্ধন বলতে চেয়েছিলেন 'কাঠের পা'। উনি শুনেছেন কা-কা-কা! এদিকে তিন 'কা' হল কাল্লু, কাত্যায়ন এবং কানু ভট্টচার্য। বড় জটিল কেস সাজিয়েছিলেন জয়বর্ধনবাবু।''

''তা হলে কাঠের পা খুলতে হয়েছিল জয়বর্ধনকে।''

কর্নেল হাসলেন, ''কাঠের পা হঠাৎ খুলতে দেখেই সম্ভবত আনন্দবর্ধন ভয় পেয়েছিলেন। তাই মৃত্যুর সময় কাঠের পা কথাটাই বলতে চেয়েছিলেন।''

তখনই পুলিশের দলটি এসে গেল। দিলীপ ব্রহ্ম ভেলভেটের একটি চৌকো বাক্স টেবিলে রাখলেন। ঢাকনা খুলতেই একটা কারুকার্যখচিত মুকুট দেখা গেল। জয়বর্ধনকে গ্রেফতার করে আনা হয়েছে। তিনি ক্রুর দৃষ্টিতে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কর্নেল বললেন, ''এই কালো ভেলভেট বাক্সের মধ্যেই সোনাদানা রাখার নিয়ম। মিঃ ব্রহ্ম খালি মুকুট পেয়েছেন, বাক্স পাননি—এই দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, এটা নকল রাজমুকুট। জয়বর্ধনবাবু! একটু বোকামির জন্য ধরা পড়লেন। বুদ্ধি করে ভেলভেটের বাক্সর মধ্যে নকল মুকুট রাখলে আপনার কীর্তি ধরতে পারতাম না সম্ভবত।''

জয়বর্ধন মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটু পরে তাঁকে হাজতে নিয়ে যাওয়া হল।

বললাম, ''চাবিতে 'ভি' এবং 'পি' কেন খোদাই করা, বলুন কর্নেল?''

''ভি ফর ভিকটরি অর্থাৎ জয়। পি ফর প্লেজার অর্থাৎ আনন্দ। জয়বর্ধন এবং ''আনন্দবর্ধন।''

দিলীপবাবু হাসলেন। "ঘরে খাল কেটে কুমির আনার মতো জয়বর্ধনবাবু আপনাকে আনিয়েছেন!"

কর্নেল বললেন, "আসলে উনি আমাকে দিয়ে যাচাই করতে চেয়েছিলেন, ওঁর মোডাস অপারেণ্ডিতে কোনও খুঁত আছে কি না, যাতে উনি ধরা না পড়েন।"

সবাই হেসে উঠলেন। আমি ভাবছিলাম, ক্লাউন অর্কিডের কথা বলতে-বলতে ক্লাউন নিয়ে খুনের খবর আনা কি নেহাত আকস্মিক যোগাযোগ? স্টেশনে ফেরার পথে কথাটি তুললে আমার রহস্যভেদী বন্ধু বললেন, "তোমাদের দৈনিক সত্যসেবকেই খবরটা বেরিয়েছিল। হেডিং ছিল, 'রাজমুকুট নিয়ে খুন'। ডার্লিং! কাগজের লোক হয়েও তুমি কাগজ পড়ো না, এটা একটা বদ অভ্যাস।"

ইন্দ্রনাথকে ফোন করেছিলাম। উদ্দেশ্য জমিয়ে আড্ডামারা। ও বড্ড একলা থাকে। সঙ্গ দেওয়া দরকার। আমারও দরকার সুভাষ সরোবরে টাটকা হাওয়া।

টেলিফোনের ঘণ্টা বাজল। তারপরেই শুনলাম ইন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর :

নস্যি নিয়ে রাতে ফিরব···নস্যি নিয়ে রাতে ফিরব···নস্যি নিয়ে রাতে ফিরব···

খুট করে কেটে গেল লাইন। হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। ইন্দ্রনাথের গলা চিনতে ভুল হয়নি। কিন্তু এরকম বিদঘুটে রসিকতাও আশা করিনি।

আবার ডায়াল করলাম। আবার সেই একঘেয়ে বয়ানের গা-জ্বালানে পুনরাবৃত্তি :

নস্যি নিয়ে রাতে ফিরব···নস্যি নিয়ে রাতে ফিরব···নস্যি নিয়ে রাতে ফিরব···

এবারও লাইন কেটে যেতে রিসিভার রেখে দিয়ে বললাম, "শুনছ ?"

কবিতা বললে, "কী ?"

"ইন্দ্রনাথের এই নতুন মজাটা একদম ভাল লাছে না।"

"কী মজা ?" ঝুঁকে বসল কবিতা। গোয়েন্দা ইন্দ্রঠাকুরপোর নাম শুনলেই রাজ্যের কৌতূহল জড়ো হয়, কবিতার চোখেমুখে। গোয়েন্দা ইণ্ডিয়ান পোকা যদি কাউকে বলতে হয়, তবে সে এই কবিতা, আমার বউ।

"যতবার ফোন করছি, ততবার 'নস্যি নিয়ে রাতে ফিরব···নস্যি নিয়ে রাতে ফিরব' বলে লাইন কেটে দিচ্ছে।"

হেসে ফেলল কবিতা। ওর সেই মার্কামারা হাসি। যে-হাসি রাজরানিরা হাসে। হেসে

কুটিপাটি হয়ে বললে, "তোমার মাথায় গোবর আছে। বাস করছ ইলেকট্রনিক যুগে। ইলেকট্রনিক ঠাট্টা-মজার খবর রাখ না?"

"ইলেকট্রনিক মজা!"

"ইন্দ্রঠাকুরপো একলা থাকে তো। যখন থাকে না, তখন টেলিফোন ধরবে কে? তাই ইলেকট্রনিক যন্তর বসিয়েছে। সেই যন্তরেই নিজের গলা রেকর্ড করে গেছে। জানে তো আজ শনিবার, তুমি ফোন করবে, তাই মজা করছে।"

রেগেমেগে বললাম, "কলেজ লাইফ থেকে ওর এই সৃষ্টিছাড়া মজার ঠেলায় হাড়পিত্তি জ্বলে গেল। এই জন্যই ওর কিচ্ছু হল না।"

"সত্যিই কি হয়নি?" বলে আর-একদফা হাসি হাসল কবিতা। এ-হাসিটা বিদ্রূপের হাসি কি না ঠিক ধরতে পারলাম না।

ইলেকট্রনিক তান্ত্রিক

আমরা এখন বেলেঘাটায়। গাড়ি থেকে নামবার আগেই দেখে নিয়েছি ইন্দ্রনাথের একতলার ঘরে আলো জ্বলছে। তার মানে বন্ধুবর নস্যি নিয়ে ফিরেছে।

গেট খুলতেই ঘরের ভেতর থেকে ভেসে এল ইন্দ্রনাথের উচ্চ কণ্ঠধ্বনি, 'এসেছে, এসেছে, ডিটেকটিভ গল্পের খদ্দেররা এসে গেছে।"

এবার কিন্তু রেগে গেল কবিতা নিজেই। তেড়েমেড়ে দাওয়ায় উঠে দরজায় ঠেলা দিয়েই অবশ্য থমকে গেল চক্ষের নিমেষে।

ঘরের সোফায় বসে পাশাপাশি দুটি মূর্তি। একটা মূর্তিকে আমরা হাড়ে-হাড়ে চিনি। ইন্দ্রনাথ রুদ্র। এখন তার গায়ে রক্ত রঙের চাদর, পরনে লাল টকটকে ধুতি, কপালে রক্তচন্দনের প্রলেপ। কাপালিক-কাপালিক চেহারা। মৌজ করে নস্যি নিচ্ছে, আর সকৌতুকে আমাদের দিকে চেয়ে আছে।

কিন্তু তার পাশের মূর্তিটা যে সত্যি-সত্যি কাপালিক! গালে কালো কুচকুচে দাড়িগোঁফের আফ্রিকান জঙ্গল, লম্বা বাবরি চুলে চিরুনির পাট নেই, গলায় রক্তজবা আর রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে-বুকে-কণ্ঠায় রক্তচন্দনের মাখামাখি, চোখ দুটো আগুনের গুলির মত ধকধকে।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছিল কবিতা। ভড়কে গেছিলাম আমিও। তাই দেখে অট্টহেসে ইন্দ্রনাথ বললে, "বসতে আজ্ঞা হোক, বসতে আজ্ঞা হোক। এঁকে দেখে ভিরমি খাওয়ার দরকার নেই। এঁর চেহারাটা বিকট হতে পারে, মানুষটা অপরূপ, বিশেষ করে এঁর সাধনা।" এই পর্যন্ত বলেই বিকট কাপালিকের গায়ে ঠেলা দিয়ে বললে ইন্দ্রনাথ, "বলুন না মশাই, আপনার নামটা বলুন।"

কাপালিক ভদ্রলোকের হাইট ইন্দ্রনাথের চেয়ে ইঞ্চিকয়েক বেশি। মানুষ-দৈত্য বললেই চলে। ইন্দ্রনাথের গুঁতো খেয়ে তিনি কিন্তু একটু হেলে পড়লেন। বন্ধুবরের নস্যির ডিবেটা দেখলাম তাঁর বাঁ হাতে। ডান হাতের দু' আঙুলে করে বেশ খানিকটা তামাকু-চূর্ণ নাসিকা-গহ্বরে

ঠেসে দিয়ে নাকের ডগা মুছতে-মুছতে বললেন, "আমার নাম নাদাচার্য।"

চমকে উঠলাম গলার আওয়াজ শুনে। দৈত্য-বপুর গলা থেকে স্টিরিও-আওয়াজ বেরোবে ভেবেছিলাম, কিন্তু এ যে একেবারে উলটো।

বাচ্চা ছেলের মতো কচি গলায় কথা বলছেন নাদাচার্য। এবং বিলক্ষণ আধো-আধো গলায়।

আমার আর কবিতার কিংকর্তব্যবিমূঢ় মুখচ্ছবি দেখে নিশ্চয় করুণা হল নাদাচার্য কাপালিকের। তিনি বললেন ইন্দ্রনাথকে, "দেখলেন তো, আমার গলা শুনেই কীরকম হয়ে গেলেন। স্রেফ এই জন্যই আমি কথা বলতে চাই না। কেন যে মা-তারা আমার গলাটাকে পাকিয়ে তুললেন না।"

কবিতা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে ঘরে ঢুকল। পাশাপাশি বসলাম আর-একটা সোফায়। বললে কাষ্ঠহেসে, "সবার গলা কি মোটা হয়?"

আগুনচোখ মেলে নাদাচার্য আধো-আধো সরু গলায় বললেন, "না হোক, পুরুষালি গলা হতে ক্ষতি কী ছিল। তারা, তারা ব্রহ্মময়ী! হাজার হলেও আমি তো তান্ত্রিক।"

"বস্তাপচা শস্তা তান্ত্রিক অবশ্য নন"—পাশ থেকে বলে উঠল ইন্দ্রনাথ, "রীতিমত ইলেকট্রনিক তান্ত্রিক।"

সব গোলমাল হয়ে গেল আমার। বিশেষ করে নাদাচার্য মশাইয়ের হাসিটা শুনে। এত মিষ্টি, এত সুরেলা হাসি কচিকাঁচারাই শুধু হাসতে পারে।

কিন্তু ইলেকট্রনিক তান্ত্রিক! সেটা কী বস্তু?

আমাদের মানে আমার আর কবিতার মনের সঙ্গে ইন্দ্রনাথের মনের একটা আশ্চর্য যোগাযোগ আছে। মুখ খোলার আগেই ও বুঝে নেয়। এখনও বুঝল, বেজায় ধোঁকায় পড়েছি কর্তা-গিন্নি দু'জনেই।

ইন্দ্র তাই বললে, "হে বউদি, হে মৃগাঙ্ক, ডিটেকটিভ গল্পের অনেক ছাইভস্ম তোমরা পড়ছ আর লিখছ। কখনও কি শুনেছ তন্ত্রসাধনায় নিউ-ফিজিক্সকে প্রয়োগ করা হচ্ছে?"

"তন্ত্রসাধনায় নিউ-ফিজিক্স!" আমার কণ্ঠস্বর অনেকটা খাবি খেতে-খেতে কথা বলার মতো শোনাল।

"মডার্ন-ফিজিক্স যে-অন্ধকারে হাতড়ে মরছে, নতুন-ফিজিক্স সেখানে আলোকপাত করতে চলেছে। এজন্য দরকার মাইক্রোচিপ।"

"মা, মা।"

"মাইক্রোচিপ। ইলেকট্রন যার প্রাণ। যে ইলেকট্রনকে কেউ কোনওদিন দেখতে পাবে না, সেই ইলেকট্রনের খেলবার জায়গা মাইক্রোচিপ। যে জিনিস কম্পিউটারে লাগে, মাইক্রোপ্রসেসরে লাগে। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে?"

"না, না তো!"

"নাদাচার্যমশাই নিজেই ইলেকট্রনিক তান্ত্রিক। পাঁচ লক্ষ সিলিকন চিপ আনিয়েছিলেন

এই কারণেই।"

"পাঁচ লক্ষ সিলিকন চিপ!"

"হ্যাঁ বন্ধু, হ্যাঁ। তার এখনকার বাজার দাম পাঁচ কোটি টাকা! সব চুরি হয়ে গেছে।"

ফস করে বললে কবিতা, "এইজন্যই বুঝি কাপালিক সেজেছ?"

"নইলে চোর ধরব কী করে?" বলে নস্যির ডিবের দিকে হাত বাড়াল ইন্দ্রনাথ।

টরে টক্কা পোস্টকার্ড

ইন্দ্রনাথ নস্যির ডিবের দিকে হাত বাড়াতেই নাক সিঁটিয়ে কৌচ ছেড়ে উঠে পড়ল কবিতা। রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বললে, "খবরদার, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত কেউ মুখ খুলবে না।"

অমনিই তারস্বরে বললে ইন্দ্রনাথ, "বউদি, ফ্রিজে এক কিলো ভেড়ার মাংস আছে।"

"ছোট এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, ধনে, নুন, পাতিলেবু, মাখন?" ভুরু কুঁচকে বললে কবিতা।

"স-ব আছে। বানাবে কী"

"মাটন মোরব্বা।"

জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বললেন ইলেকট্রনিক তান্ত্রিক, "তোফা! তোফা! তারা! তারা! ব্রহ্মময়ী।"

মাটন মোরব্বা উদরে প্রস্থান করেছে। চোখ পাকিয়ে ইন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে রয়েছে কবিতা।

ইন্দ্রনাথ একটা ঢেকুর তুলে বললে "ব্যাপারটার শুরু একটা টরে-টক্কা পোস্টকার্ড থেকে।

"টরে-টক্কা পোস্টকার্ড!" কবিতার চোখ একটু ছোট হল।

"কাল রাতে বাড়ি ফিরে লেটার-বক্স খুলে পেলাম একটা পোস্টকার্ড। এই সেই পোস্টকার্ড।"

বলে, টেবিলের রাশি-রাশি কাগজ, পত্রিকা আর চিঠির মধ্যে থেকে একটা পোস্টকার্ড তুলে এগিয়ে ধরল ইন্দ্রনাথ। হাত বাড়িয়ে নিল কবিতা। নিমেষে চোখ বোলানো হয়ে গেল। ভুরু দুটোয় একটু ঢেউ খেলিয়ে বললে, "কচি খোকার লেখা মনে হচ্ছে।"

"হেঁ, হেঁ, ওটা আমার লেখা", যেন মরমে মরে গেলেন তান্ত্রিকমশাই।

কার্ডটা এবার হাতে নিলাম আমি। চিঠিটা লেখা হয়েছে এইভাবে ঃ

ওহে ইন্দ্রনাথ,

তোমার মতো অপদার্থ গোয়েন্দাদের গোল্লায় যাওয়া উচিত। তোমার কবচ হয়ে গেছে। হাতে পরলেই গুলিগোলা বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে গেলেও তোমার মরণ হবে না (যদিও হলে বাঁচতাম)। আসবে কবে বাছাধন? ডেরায় গিয়ে নিয়ে নিও দশ হাজারের বাণ্ডিল ছেড়ে যেও। ইতি

তোমার যম

নাদাচার্য

চিঠি পড়ে বললাম কবিতাকে, "হাতের লেখা তো পাকা। কাঁচ খোকার লেখা বললে কেন ?"

"এই বুদ্ধি নিয়ে গোয়েন্দা গল্প লেখো কেন ? পোস্টকার্ডের বর্ডারগুলো চোখ এড়িয়ে গেল ?"

"বর্ডার ? ও হ্যাঁ, চারদিক ঘিরে শুধু লেখা রয়েছে ইংরেজি জিরো আর ওয়ান। এক-একজনের ওরকম খেয়াল থাকে। নাদাচার্যমশাই দেখছি জিরো আর ওয়ানের খুব ভক্ত।"

"হেঁ হেঁ হেঁ !" কাষ্ঠহাসি হাসলেন নাদাচার্য, "এখনও ধরতে পারলেন না।"

তাকালাম জুলজুল করে, "কী ধরতে পারলাম না ?"

"মেসেজটা।"

অসহায় চোখে তাকালাম ইন্দ্রনাথের দিকে, "কিসের মেসেজ রে ?"

ইন্দ্রনাথের তখন সবে একটিপ নস্যি নেওয়া হয়েছে। নাকের ডগা মুছছে। চোখে একটু জলও এসে গেছে। সেই অবস্থাতেই বললে, "জিরো আর ওয়ান ঠিক একটা ফরমুলার মতো সাজানো রয়েছে না ?"

"কীরকম ভাবে ?"

আবার তাকালাম পোস্টকার্ডের দিকে। যা দেখলাম, তা ওপরে এঁকে দেখাচ্ছি।

ইন্দ্রনাথ মুখের অবস্হা দেখেই বুঝেছিল হালে পানি পাচ্ছি না। তাই বললে, "মুর্খ মৃগাঙ্ক, ইংরেজিতে টরে-টক্কা মেসেজ যখন লেখা হয় 'ডট ডট ডট ড্যাশ ড্যাশ ড্যাশ ডট ডট ডট"— তখন কী বোঝায় ? বুঝলে না ? মর্স কোড-টা এই," বলতে বলতে পোস্টকার্ডের উলটো দিকে লিখল ইন্দ্রনাথ ঃ

ফস করে বলে উঠল কবিতা, "পতাকা সঙ্কেত অথবা আলোর সঙ্কেত তো একই মেথডে পাঠানো হয়। কলেজ লাইফে শিখেছিলাম। বললাম আমি"

মুচকি হেসে ইন্দ্রনাথ বললে, "জানতাম তুমিই বলবে। ডট ডট ডট ড্যাশ ড্যাশ ড্যাশ ডট ডট ডট কী মানে, বউদি ?"

"সেভ আওয়ার সোলস ; সংক্ষেপে এস. ও. এস ; বাংলায় বাঁচাও, বাঁচাও। জাহাজডুবির সময়ে অথবা সেইরকম বিপদে পড়লে এই সঙ্কেত পাঠানো হয়। কিন্তু ঠাকুরপো, জিরো। আর ওয়ানের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক ?"

"বউদি, এটা ইলেকট্রনিক সিগন্যাল।"

"খুব বলো। 000 111 000 সঙ্কেতে এস, ও. এস. মেসেজ পাঠানো হয়েছে ! প্রতিবার এস. ও. এস. লিখে মাঝে 'ওঁ তুল্প' লেখা হয়েছে নিছক ভড়কি দেওয়ার জন্য অবশ্য নয়।" এবার সটান বড়-বড় চোখ মেলে নাদাচার্যর দিকে তাকাল কবিতা, "পোস্টকার্ডে অত গোপনে 'বাচাও বাঁচাও' করলেন কেন।"

কবিতার ধমক তো। বেলুনের মতো চুপসে গেলেন নাদাচার্য। রক্তচক্ষু ছোট্ট করে ফেলে

তাকালেন ইন্দ্রনাথের দিকে।

ইন্দ্রনাথ বললে, "নাদাচার্য তান্ত্রিককে আমি চিনি না। কিন্তু তিনি আমাকে চেনেন। ইলেকট্রনিক মেসেজ পাঠিয়ে আমার সাহায্য চেয়েছেন। যাদের ভয়ে গোপন সংকেত পাঠাচ্ছেন, তারা নিশ্চয় তাঁর ডেরা-র সন্ধানও জানে। সুতরাং গবেষণা করতে লাগলাম, কোন চুলো থেকে এসেছে পোস্টকার্ডটা। পেয়েও গেলাম।"

"কোত্থেকে?"

ঝুঁকে বসল ইন্দ্রনাথ, "অলৌকিক আখড়া যে অঞ্চলে—সেখান থেকে।"

অলৌকিক আখড়া

একটা ছোট এলাচ তুলে নিয়ে দাঁত দিয়ে খোসা ছাড়াতে-ছাড়াতে কবিতা বললে, "আখড়া কখনও অলৌকিক হয়?"

"কেরলে আছে এন্তার, কতকাতায় হয়েছে একটা।"

"অলৌকিক আখড়া?"

"হ্যাঁ বউদি, হ্যাঁ। কেরলের থ্রিসুর জেলায় থুকথুক করছে প্রেতলোকের এজেন্টরা—তিন হাজার বছর ধরে। তারা অশরীরীদের ধরে এনে মানুষের উপকার করায়—অপকারও করায়।"

"বলছ কী ঠাকুরপো!"

"হুঁ হুঁ, বউদি, আমার আমার নাম ইন্দ্রনাথ রুদ্র। সব খবরই রাখতে হয় আমাকে।"

"তোমার এই অহঙ্কারেই একদিন পতন ঘটবে।"

"আমার তো? তাতে মৃগাঙ্করই ক্ষতি, গল্পের মসলা পাবে কোথায়? হ্যাঁ, কী বলছিলাম? অলৌকিক আখড়া, ভূতপ্রেতের মঠ, কেরলের এই জেলাটা তাদের বড় আড্ডা। সবচেয়ে বড় ঘাঁটি কেরালার সাংস্কৃতিক শহর থ্রিসুরে—ভূত-গুরুদের শহরও বলতে পারো—এরকম ভূতপুজো তুমি পৃথিবীর আর কোথাও দেখতে পাবে না।"

"ভূতপুজো! ভূত-গুরু! তোমার মাথা ঠিক আছে তো ঠাকুরপো?"

"বিলক্ষণ ঠিক আছে। আর-একটু নস্যি নিলে আরও ঠিক হবে। নেব? আচ্ছা, আচ্ছা নেব না। কুট্টি চাথান-দের নাম শোনোনি নিশ্চয়। কেরলে ভূত-গুরুদেব বলা হয় কুট্টি চাথান। প্রায় কুড়িটা মঠ আছে শুধু এই একটা জেলাতেই, 'চাথান সেবা মঠ' নামেই এরা বিখ্যাত। রোজ এক হাজার মানুষ যায় এইসব মঠে ভূতেদের দয়া ভিক্ষা করতে।"

"ভূতেদের মঠ বলে কিছু থাকতে পারে?"

"আছে বউদি আছে। তিন হাজার বছর ধরে ভূত-গুরুরা দাপিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছে যে মঠটায়, তার নামটা শুধু শুনে রাখো···আভানগাট্টু বিষ্ণুমায়া।"

"আভানগাট্টু বিষ্ণুমায়া।"

—বাঃ, বাঃ, বেশ তো উচ্চারণ করে গেলে। 'কানাড়ি মঠ'টা তা তাহলে সহজেই মনে থাকবে —এর বয়স দেড় হাজার বছর। তিন নম্বর বিখ্যাত মঠটার নাম এক্কেবারে মনে গেঁথে যাবে, শ্রীকালী চাথান সেবা মঠ।"

"মা-কালীকে নিয়ে কারবার।"

"কে না করছে? যাক সে-কথা। সমাজমনোবিজ্ঞানী আর যুক্তিবাদীরা যতই চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাক না কেন, এঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, প্রোফেসর, অ্যাডভোকেট, জার্নালিস্ট, পলিটিশিয়ানরাও দলে-দলে এইসব মঠে ভিড় করছে। কেউ-কেউ আসছে সুদূর রাজস্থান থেকেও। দক্ষিণা দিচ্ছে পঞ্চাশ থেকে সাড়ে চারশো···"

"টাকা?"

"তবে কি পয়সা? কড়কড়ে খরচ গুনে দিতে হয় পুজো বা অর্চনার জন্য। মঠের বেদির সামনে একজন মিডিয়ামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তোমাকে বলতে হবে, কী তোমার যাচ্ঞা। নিজের মঙ্গল চাও, না অন্যের ক্ষতি করতে চাও।"

"অন্যের ক্ষতির জন্য ভূতপুজো?"

"কথা না বলে শুনে যাও বউদি। ভূত-গুরু যে শক্তির আরাধনা করে, সে শক্তি যে পয়লা নম্বর কুচুটে আর করাল, তা কে না জানে। সুতরাং তুমি যদি চাও অমুক লোকের পেটের নাড়িভুঁড়িগুলোকে পেটের ভেতরেই ক্যাঁচ করে কেটে দেবে, তা হলে ভূত-গুরু সেই ব্যবস্থাই করবে। কীভাবে জানো? মিড়িয়াম তোমার আরজি শুনবে। তারপর অপদেবতা তার ওপর ভর করবে। সে বোঁ-বোঁ করে পাক খাবে, চোখ ঘুরিয়ে হাঁই-হাঁই করে অনেক কথা বলে যাবে, ভূতের ভাষা বলে একবর্ণও বুঝবে না তুমি। তারপর ভূত-গুরু সহসা কারও কাছ থেকে একগোছা পান নেবে। বেদির সামনে পুজোটুজো করে কচ করে বোঁটাগুলো কেটে দেবে, যার ক্ষতি করতে চাও, তার নাড়ি-ভুঁড়িগুলোও সঙ্গে-সঙ্গে ঠিক যেন খুর দিয়ে কাটা হয়ে যাবে।"

"ইস্! সত্যি কি তাই হয়?"

"শোনা কথা। মা-কালী জ্বলন্ত সরা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, এ দৃশ্যও নাকি অনেকে দেখেছে। সেই সরার মধ্যে দেখা গেছে গনগনে কাঠকয়লা, মেটে সিঁদুর, জবাফুল, গলাকাটা একটা পায়রা···"

"ও মাগো!"

"তা হলে আর বলব না। যদি কারও যেতে ইচ্ছে হয়, বলবে মঙ্গল আর শুক্রবারে যেতে।"

"শনি-মঙ্গলে নয়?"

"না। এখানে যত রহস্য ওই মঙ্গল-শুক্কুরে। যেমন ঘটছে কলকাতার কুশগ ওয়ানচেং মঠে।"

"এটা তো কেরল-নাম বলে মনে হচ্ছে না, ঠাকুরপো।"

"ধরেছ ঠিক। তিব্বতে একজন বিখ্যাত লামার নাম কুশগ ওয়ানচেং। তাঁর নামেই মঠ।

এখানেও হচ্ছে ভূতপুজো। বাঞ্ছাপূরণ। লোকের অমঙ্গল। অনাচার অবিচার আর প্রতারণা।"

"প্রতারণা! তোমার টনক নড়েছে এই কারণেই?" আর-একটা ছোট এলাচ তুলে নিল কবিতা।

"তক্কে-তক্কে ছিলাম অনেকদিন ধরেই। ঠিকানাটাও খুঁজে বের করেছিলাম, কিন্তু চান্স পাচ্ছিলাম না ঢুঁ মারার। এখন সুযোগ এসে গেল।"

"এল এই টরে-টক্কা পোস্টকার্ড?"

"জি হ্যাঁ, বউদি। পোস্টকার্ড পড়েই বুঝলাম, নাদাচার্য নামে এক তান্ত্রিক বড় বিপদে পড়েছেন। তাঁর নাম আমি কস্মিনকালেও শুনিনি, কিন্তু তিনি আমার নাড়িনক্ষত্র জেনে বসে আছেন। ভদ্রলোক ইলেকট্রনিক টেকনোলজিতে এক্সপার্ট, অথচ তিব্বতি মিস্টিসিজম বিলক্ষণ জানেন! মোদ্দা কথা, তিনি একজন অত্যাধুনিক তন্ত্রসাধক। লুকিয়ে চুরিয়ে আমাকে খবর পাঠিয়েছেন। তাঁকে আমি কবচ বানানোর কথা মোটেই বলিনি। কিন্তু তিনি সেই ভড়ং মেরেছেন চিঠির লাইনে-লাইনে। কিন্তু ইলেকট্রনিক মর্স কোড লিখলেন কেন? নিশ্চয় যাদের হাত দিয়ে পোস্টকার্ড ফেলতে দিয়েছেন—তারা যেন বুঝতে না পারে এস. ও এস. মেসেজ—শুধু বুঝবে যে, ইন্দ্রনাথ রুদ্র নামে একটা অখাদ্য গোয়েন্দা হাজার দশেক টাকার তাড়া নিয়ে হাজির হবে নাদাচার্যর ডেরায়। এবং এই টাকাটাই তাদের দরকার—নিশ্চয় মুক্তিপণ হিসেবে। পরিষ্কার?"

কবিতা বললে, "এক্কেবারে। কিন্তু তুমি বুঝলে কীভাবে ব্যাপারটা কুশগ ওয়ানচেং মঠেই ঘটছে?"

চোখ নাচিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, "ওই একটা রহস্যই শুধু তোমাকে ফাঁস করতে হবে। তবেই বুঝব তুমি গোয়েন্দা-লেখকের উপযুক্ত বউ।"

রেগে গিয়ে কবিতা বললে, "আচ্ছা সে দেখা যাবে। এখন বলো, গিয়ে কী দেখলে কুশগ ওয়ানচেং মঠে?"

"দেখলাম শরীরী প্রেত," বলে একটিপ নস্যি নিল ইন্দ্রনাথ, বেশ আওয়াজ করে।

শরীরী প্রেতের নাচ

ইন্দ্রনাথ ছবির মতো বলে ঘটনাটা ঃ

"জায়গাটা বড় রাস্তার ধারে হলেও নির্জন। ট্রাম লাইন নেই। সরকারি বাস রুট আছে একটাই। বিবাদি বাগের বাস। সন্ধ্যের পর তাই বাস চলে না। ঝিমিয়ে পড়ে গোটা অঞ্চলটা।

রাস্তার দু'পাশে কারখানার টিনের শেড। গুদাম আর খাটাল। গাছগাছালি এন্তার। মাঝে-মাঝে পুরনো বাগানবাড়ি, ফটক আর থাম এখন শ্রীহীন। দূরের বারান্দা আর তার পেছনকার একতলা বাড়ি আরও শ্রীহীন। এখন সেসব জায়গায় নানা কারবার।

একসময়ে কলকাতা এই পর্যন্ত ছিল না, এখন ছাড়িয়ে চলে গেছে সল্টলেকে। এখানে,

এই বড় রাস্তার ধারে, একটা বটগাছের ঝুপসিতে গা ঢেকে দাঁড়িয়ে ছিল ইন্দ্রনাথ।

ওই যে একতলা বাড়িটা, ওই বাড়ির রন্ধ্রে-রন্ধ্রে অনেক দুর্নীতির বাসা। কিন্তু সেই কুকর্ম যে কী, তা সঠিক জানা যায়নি। তবে কালীপুজো হয় এখানে ধুমধাম করে। ভোরবেলা থেকে ভক্তরা আসে। ইচ্ছাপূরণ হয়। চলে যায় টাকার থলি রেখে দিয়ে।

এই সেই কুশগ ওয়ানচেং মঠ। যদিও মঠ বলে মনে হওয়ার কোনও কারণ নেই। পরিত্যক্ত ভুতুড়ে বাড়ি বললেই চলে। সর্বাঙ্গে ব্রিটিশ ঘরানার ছাপ সুস্পষ্ট। নিশ্চয় এককালে কোনও সাহেব থাকতেন। বড়-বড় থাম, উঁচু-উঁচু জানলা, পেল্লায়-পেল্লায় দরজা আর ফুটবল খেলার মতো বিশাল ছাদটা সেইসব স্মৃতি বহন করছে। আধো অন্ধকারে ছাদের ওপর পায়রা ওড়ানোর কেরামতিও চোখে পড়ছে। লম্বা একটা লগা, তার মাথায় চৌকোনো জাল পাতা।

ইন্দ্রনাথ তান্ত্রিক বেশে এসেছে। বগলের ফাঁকে অবশ্য ওর প্রিয় সঙ্গী রিভলভারটা আছে। বলা তো যায় না, অলৌকিকের আখড়াগুলোতেই লৌকিক কদর্যতা প্রকাশ পায় সবচাইতে বেশি।

জায়গাটা এখন একটু ফাঁকা। সন্ধ্যের পর ঝট করে এদিকে কেউ আসতে চায় না। দুটো কারণে—এক, ওই বাড়ির পেছনেই আছে একটা গোরস্থান। দুই, জায়গাটায় সমাজবিরোধীদের আনাগোনা একটু বেশি।

ইন্দ্রনাথ তবুও এসেছে। নাদাচার্য লোকটার পোস্টকার্ড পেয়েই ও বুঝেছে, তান্ত্রিক ভদ্রলোক তাকে ঠিক এইখানেই আসতে বলেছে। কেন আসতে বলেছে সেটা একটু অ্যাডভেঞ্চার না করলে জানা যাবে না।

জোনাকির আলো জ্বলছে গাছপাতার অন্ধকারে। ঝিঁঝি ডাক শুরু হয়েছে। এমন সময়ে একটা খড়মড় আওয়াজ শোনা গেল।

আওয়াজটা এল ইয়ামোটা বটের গুঁড়ির দিক থেকে।

বডি না ঘুরিয়ে আড়চোখে সেদিকে তাকাল ইন্দ্রনাথ।

একটা ভাঙা গাড়ি পড়ে আছে গুঁড়ি ঘেঁষে। যে গাড়ির চাকা লুঠ হয়ে গেছে। মারাত্মক অ্যাকসিডেণ্টে চেহারাটাও পালটে গেছে। জানলা-দরজার বালাই নেই।

আওয়াজটা আবার শোনা গেল তার মধ্যে।

আর ঠিক তার পরেই একটা পেন্সিল টর্চের মতো সরু আলো ফ্ল্যাশ দিয়ে উঠল মর্স কোডের সঙ্কেতে।

নাদাচার্য নাকি?

পায়ে-পায়ে সেদিকেই একটু সরে গেল ইন্দ্রনাথ। কাছাকাছি যেতেই শুনতে পেল কচি মিহি গলায় উদার আহ্বান, "আসা হোক! আসা হোক! ইন্দ্রনাথ রুদ্র নিশ্চয়?"

আর-একটু এগিয়ে গিয়ে ততোধিক মিহি গলায় বললে ইন্দ্রনাথ, "মহাশয় কি নাদাচার্য?"

"ধরেছেন ঠিক। এই না হলে গোয়েন্দা! আমার সঙ্কেতের মানে আপনি অন্তত বুঝবেন, এটা জানতাম।"

"পোস্টকার্ডের সঙ্কেত ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ…ঢুকে আসুন…ভয় নেই…ভয় নেই…আমি যখন আছি। আপনিও থাকবেন।"

বগলের রিভলভারে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে ঘাড় গুঁজে ধূলিধূসরিত ভাঙা গাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল ইন্দ্রনাথ।

অমনই ফুস করে পেন্সিল টর্চ জ্বলল ওর মুখের ওপর। সেই আলোয় নাদাচার্যর মুখাবয়বও অবলোকন করে নিল ইন্দ্রনাথ।

বললে, "এই বিরাট চেহারা নিয়ে এরকম কচি গলায় কথা বলেন কেন ?"

"তারা! তারা! ব্রহ্মময়ী!" বললে কচি গলা, "আপনাকে ডেকেছিলাম উদ্ধার পাওয়ার জন্য। কিন্তু তার আর দরকার হল না। আমিই পালিয়ে এসেছি চান্স পেতেই। এক্কেবারে চম্পট দিইনি শুধু আপনার জন্য। আপনাকে না আবার ফাঁদে ফেলে।"

"খুলে বলুন মশাই।"

"যা ধুলো, ঘাড় গুঁজে কথা বলা যায় ? আপনার বাড়ি গিয়ে বলব। তার আগে ভূত দেখে যান।"

"ভূত !"

"গোরস্থান থেকে তো ভূত ধরে আনে এরা। ভূতসিদ্ধ তান্ত্রিকদের আড্ডা মশাই। আমাকে ধরে এনেছিল আমার ঘিলুর বড়া খাবে বলে, তাতে নাকি ওদের শক্তি আরও বাড়বে।"

"ঘিলুর বড়া !"

"পরে শুনবেন। দেরি করলে আপনার ঘিলুর বড়াও বানাতে পারে।"

"ভূত আসে গোরস্থান থেকে ? আপনি দেখেছেন ?"

"না দেখলে পেত্যয় হল কী করে ? আসেন, আসেন, আপনাকেও দেখাচ্ছি।"

এই 'আসেন, আসেন,' শুনেই ইন্দ্রনাথ বুঝেছিল, নাদাচার্যমশাই বাঙাল। কিন্তু আর কথা বাড়ায়নি। নিঝুম রাতে গাছপালার অন্ধকার ঠেলে ওকে নিয়ে নাদাচার্য পৌঁছেছিল গোরস্থানের ভেতরে। একতলা বাড়িটার একটা জানলার কাচ ভাঙা। পা টিপে-টিপে তার পাশে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে দেখিয়েছিলেন ভেতর দিকে।

টানা লম্বা ঘরটার নীলাভ দ্যুতি ছড়িয়ে পড়েছে। নীল ধোঁয়া পাকসাট খাচ্ছে। মেঝেতে বসে দশ-বারোজন নারী এবং পুরুষ। বিভিন্ন বয়সের। বিভিন্ন জাতের। প্রায়-অন্ধকার নীলচে আভায় এর বেশি দেখা যায়নি।

দেখা যা গেছিল, তা অতি ভয়ঙ্কর।

ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় শূন্যে ভাসছে একটা নর-করোটি।

শুধু একটা কঙ্কালের মুণ্ডু। সাদা হাড় ঘিরে ঘুরে-ঘুরে উড়ে যাচ্ছে নীলচে ধোঁয়া। মুণ্ডুটা একদৃষ্টে কোটর-চক্ষু মেলে চেয়ে রয়েছে মেঝেতে আসীন মানুষ ক'জনের দিকে।

ভাসমান মুণ্ডুর সামনে একটি মেয়ে তাথৈ-তাথৈ নেচে চলেছে। তার সারা গায়ে রক্ত

রঙের শাড়ি জড়ানো। তার কপাল জুড়ে লাল সিঁদুর লেপা। তার চোখ আধ-বোজা। কালো চুলের রাশি ঝোড়ো মেঘের মতো পুঞ্জে-পুঞ্জে আছড়ে পড়ে সাপটে ধরছে তাকে দমকে দমকে।

অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনিতে কী যেন মেয়েটা বলে যাচ্ছে উদ্দাম নৃত্যের তালে-তালে। সারা ঘর থমথম করছে দুর্বোধ সেই গুঞ্জনধ্বনি নর-করোটির নিষ্পলক চাহনি আর নীলাভ ধোঁয়ার আবর্তে।

এই পর্যন্ত দেখিয়েই ইন্দ্রনাথকে হাত ধরে টেনে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন নাদাচার্য।

কঙ্কালী গুরুর কুকর্ম

কবিতা গালে হাত দিয়ে সব শুনল। আমার হাত নিশপিশ করতে লাগল পয়েণ্টগুলো টুকে ফেলার জন্য। কিন্তু সে সময় আর পেলাম না।

নাদাচার্যমশাই ফোঁত-ফোঁত করে দু'বার নস্যি নিয়ে বললেন, "ব্যাপারটা ইন্দ্রনাথ মশাইকে খুলে বলেছি। আপনারাও শুনুন। ওই গোরস্থানের বাড়িতে কঙ্কালী গুরু যে ভূত নামানোর খেলা দেখিয়ে চলেছে, তার আসল উদ্দেশ্য পয়সা কামানো।"

"সে তো বটেই," বললে কবিতা, "কিন্তু কীভাবে ?"

"মা-জননী ভারী বুদ্ধিমতী," কচি গলায় স্বর্গীয় হাসি হেসে বললেন নাদাচার্য, "কিন্তু আসল ব্যাপারটা পুলিশও এখনও আঁচ করতে পারেনি। খবরও পায়নি। তাই ডেকেছিলাম রুদ্র সাহেবকে।"

"আসল ব্যাপারটা কী ?" অসহিষ্ণু গলা কবিতার।

"মা-জননীর কি জানা আছে, হায়দরাবাদ কিডনি পালটানোর চমৎকার জায়গা ?"

"কিডনি পালটানোর জন্য হায়দরাবাদ !" থতমত খেয়ে গেল কবিতা।

"ভারতের নানা জায়গা থেকে বড়লোকরা যায় হায়দরাবাদে কিডনি পালটাতে—কাকপক্ষীও অবশ্য জানে না। সেসব কিডনি আসে কোত্থেকে ? স্কুলের ছেলেদের শরীর থেকে।"

"অ্যাঁ !" মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল কবিতার।

"এই তো সেদিন পঁচিশজন স্কুলের ছেলেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ভ্যানে চাপিয়ে। জঙ্গলের মধ্যে গাড়ি থামিয়ে ঘুমিয়েছিল পিশাচগুলো। দুটি ছেলে সকালে উঠেই কোনও একটা অছিলা দেখিয়ে ভোঁ দৌড় দেয় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। তাদের মুখেই সবাই এখন জেনেছে সমস্ত ব্যাপারটা। যাক সে-কথা, কলকাতাতেও এখন শুরু হয়েছে এই ব্যবসা—চালাচ্ছে কঙ্কালী গুরু। কীভাবে ? আরে মা-জননী, কুশগ ওয়ানচেং মঠটার প্ল্যান এসেছে কেরলের মঠগুলোর থেকে। ওই যে মেয়েটা ধেই-ধেই করে নাচছে, ও খুব ভাল মিডিয়াম—ভূতপেত্নিরা চট করে ওর শরীরটাকে আশ্রয় করে নিজেদের কথা বলে যায়। যারা বসে আছে মেঝেতে, তাদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, পার্সি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ—সব লোক আছে, যেমন থাকে কেরলের মঠগুলোয়। এরা প্রত্যেকে হাজার টাকা

ফি দেয় কঙ্কালী গুরুকে, আর বলে, গুরু, অমুক লোকটা আমায় বড় কাঠি দিচ্ছে—ওকে সরিয়ে দাও। কী বুঝলে?"

কবিতা শুধু ঢোক গিলল। ওর ঠোঁট কাঁপছে থরথর করে।

নাদাচার্য বললেন, "মিডিয়াম তাই শুনে করোটির সঙ্গে কথা বলে নেয়। করোটি ভৌতিক ভাষায় মিডিয়ামকে বলে কী করতে হবে। সে ভাষা শুনতে পায় কেবল কঙ্কালী গুরু। তারপর যে লোকটাকে সরাতে হবে, সে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যায়। মা-জননী দেখছি খুব ঘাবড়ে গেছ? অদৃশ্য হয়ে যায় মানে বুঝলে না? তাকে খতম করে দেয় কঙ্কালী গুরুর চ্যালাচামুণ্ডারা। মারার আগে নিয়ে নেয় কিডনি দুটো। সেই কিডনি বসে যায় কোনও এক বড়লোকের পচা কিডনির জায়গায়। দু'দিকে লাভ কঙ্কালী গুরুর।"

এইবার আমি কথা বললাম।

"ইন্দ্রনাথ, তুই কি শুধু রঙ্গ দেখবার জন্য অভিযানে বেরিয়েছিলি?"

দুই চোখের মণি নাচিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, "তাই কি হয়! জয়ন্ত এতক্ষণে মঠ তোলপাড় করে ফেলেছে।"

পায়রাগুলো উড়ে গেছে

ইন্দ্রনাথ নাটক জানে বটে। ঠিক সময় বুঝে জয়ন্তর নামটা বলেছিল। মুখের কথা ফুরোতে-না-ফুরোতে বিতিকিচ্ছিরি আওয়াজ করে একটা জিপ গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে।

তার পরেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল জয়ন্তর আখাম্বা মূর্তি, অতিশয় কর্কশ গলায় বললে ইন্দ্রনাথকে, "মজার জায়গা পাসনি? কোথায় তোর কঙ্কালী গুরু? সব ভোঁ-ভোঁ। ছাদের পায়রাগুলো সুদ্ধু উধাও।"

ইন্দ্রনাথ বসে রইল সোফায়। কিন্তু সটান উঠে দাঁড়ালেন নাদাচার্য, "সে কী!"

"তিষ্ঠ! তিষ্ঠ!" কটমট করে তাকিয়ে বলল জয়ন্ত, "খবরের গন্ধ অনেক দিন ধরেই নাকে আসছিল। ইন্দ্রনাথ ঠিক জায়গায় হানা দিল বটে, কিন্তু পাখি গেল উড়ে।"

ইন্দ্রনাথ বললে, "পায়রা গেল উড়ে!"

"হ্যাঁ, পায়রা গেল উড়ে।" বলেই দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বললেন নাদাচার্য, "পুলিশমশাই, আপনার তিষ্ঠ-তিষ্ঠ রব শুনেও তিষ্ঠোতে পারছি না। আমার আশ্রমে এক্ষুনি আমাকে যেতেই হবে।"

আস্তে-আস্তে ইন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়িয়ে বগলের তলা থেকে রিভলভারটা টেনে বের করে তুলে ধরল নাদাচার্যর দিকে।

বললে ভারী মিষ্টি গলায়, "লাভ নেই। গোয়েন্দার দল সেখানেও হাজির। পায়রাগুলোর ঠ্যাং নিয়ে তারা এখন বড় ব্যস্ত।"

নাদাচার্যকে নিয়ে প্রস্থান করেছে জয়ন্ত।

ভীষণ রেগে মুখ লাল করে কবিতা বলছে, "এটা কী ধরনের মজা হল ?"

ইন্দ্রনাথ নিরীহ গলায় বললে, "প্যাঁচের মধ্যে প্যাঁচ—এর নাম আড়াই প্যাঁচের বাবা।"

কবিতা আরও রেগে গেল।

ইন্দ্রনাথ তখন বললে, "এক ঢিলে দুটো পাখি মারলাম বউদি। নাদাচার্য পাঁচ লাখ টাকার মাইক্রোচিপ স্মাগল করে এনেছিল জুনপুটের একটা দ্বীপ থেকে। মাছ ধরার নাম করে ট্রলার যায় সেখানে। স্মাগলারদের বোট সেখানে নামিয়ে দিয়ে যায় ব্রিফকেস ভর্তি মাইক্রোচিপ। শঙ্করপুরের বন্দর ওদের বড় আড্ডা। নাদাচার্য ইলেকট্রনিক তান্ত্রিক, না কচু তান্ত্রিক। সে তার আশ্রমের ছাদে পায়রা পোষে। পায়রাদের ঠ্যাঙে মাইক্রোচিপ সুতো দিয়ে বেঁধে দেয়। দরদাম ঠিক হয়ে গেলে একটা কি খানকয়েক পায়রা উড়িয়ে দেয়। সেই পায়রা এসে বসে কুশগ ওয়ানচেং মঠের ছাদে। কঙ্কালী গুরু ঠ্যাং থেকে মাইক্রোচিপ খুলে ফের উড়িয়ে দেয় পায়রা, ফিরে যায় নাদাচার্যর মঠে। এইভাবেই চলছিল কারবার চমৎকার। কঙ্কালী গুরু কোথায় যে পালাল ভগবান জানেন, পাঁচ লাখ টাকার লোভে সবক'টা পায়রাকে লুঠ করে এনে রাখল নিজের মঠের ছাদে। তার দল ভারী। তাই নাদাচার্য কায়দা করে ইলেকট্রনিক মর্স কোডের পোস্টকার্ড নিজেই ডাকবাক্সে ফেলে আমাকে নিয়ে গিয়ে দেখাল কঙ্কালী গুরুর কুকর্ম। আমাকে দিয়েই পুলিশের খবর পাঠিয়ে হানা দেওয়াল মঠে। মতলবটা ছিল পরিষ্কার—পায়রাদের খুপরিতে পুলিশ কখনওই হাত দেবে না। কঙ্কালী গুরু ধরা পড়লেই আমাকে নিয়ে মঠে যাবেন তিনি সকালের দিকে। কোনও এক ফাঁকে ছাদে উঠে উড়িয়ে দেবেন পায়রার দল। পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে আকাশপথে পাঁচ লাখ টাকার মাইক্রোচিপ ফিরে যাবে তাঁর আশ্রমে! তিনি তাদের সদ্ব্যবহার করবেন।"

কবিতা ফিক করে হাসল, "কী কুচুটে বুদ্ধি তোমার! তার আগেই ওঁর আশ্রমে পুলিশ পাঠিয়েছিল ? ঠিকানা জানলে কী করে ?"

"কলকাতার পুলিশ জানে না এমন কিছু নেই," নস্যি নিল ইন্দ্রনাথ, "তবে হ্যাঁ, রাতের অন্ধকারে পায়রাগুলোকে নিশ্চয় ছেড়ে দিয়ে যায়নি কঙ্কালী গুরু—সঙ্গেই নিয়ে গেছে।"

আমি বললাম, "তুই কি সত্যি ভূত দেখেছিস ?"

"করোটির ভাসমান মাথাটা তো ? সত্যিই দেখেছি—তুই যা ভাবছিস তা নয়—স্লাইড প্রোজেকশন নয়। তা হলে তার দুটো ডাইমেনশন দেখা যেত—থার্ড ডাইমেনশন দেখা যেত না।"

"থার্ড ডাইমেনশন!" বিমূঢ় স্বর কবিতার।

"হ্যাঁ বইকী! কোনও জিনিসের গভীরতা অর্থাৎ পেছন দিকে কতটা রয়েছে, এটা তো ফোটোগ্রাফিতে বোঝা যায় না। সেখানে শুধু দুটো মাত্রা দেখা যায়, কতটা লম্বা, কতটা চওড়া। কিন্তু তোমার এই মাথাটা যে খোঁপা-টোঁপা নিয়ে পেছন দিকে তিন ফুট ঠেলে রয়েছে···"

"তিন ফুট!"

"ওই হল গিয়ে, ধরো এক ফুট। সেটাকে তো ফোটোগ্রাফির মাধ্যমে স্পষ্ট দেখা যায় না। দরকার আধুনিকতম একটা আবিষ্কারের। তার নাম হলোগ্রাফি।"

"হলোগ্রাফ।"

"হলোগ্রাফ নয়, হলোগ্রাফি। হলোগ্রাফ মানে একজনের হাতে সমস্ত লেখা একখানা দলিল। হলোগ্রাফি মানে ত্রি-মাত্রিক ছবি। লেজার রশ্মি আবিষ্কারের পর ফোটোগ্রাফিক প্লেটের মতো হলোগ্রাম প্লেট তৈরি হচ্ছে। তাতে ছবি থাকে না, থাকে শুধু সাদা-কালো লাইন আর একই কেন্দ্র ঘিরে অনেক বৃত্ত। এই হলোগ্রাম থেকে কাচের-মতো স্ক্রিনে যে ছবি ভাসবে তাকে জীবন্ত মানুষ বলে মনে হবে। ঘরে কম আলো আর ধোঁয়া থাকলে স্ক্রিন প্রায়-অদৃশ্য থাকবে—যেমন দেখা যায়নি কুশগ ওয়ানচেং মঠে। শুধু একটা কঙ্কালের মুণ্ডু, জানলার ফুটো দিয়ে দেখতে-দেখতে আমি ডাইনে-বাঁয়ে চোখ সরিয়ে দেখেছি, নর-করোটির এপাশ-ওপাশ আবছামতো মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। দ্যাট ইজ হলোগ্রাফি। জয়ন্তর কাছে রিপোর্ট পরে পাবে। সবই বুজরুকি।"

আমি কেশে গলা সাফ করে নিয়ে বললাম, "বুঝলাম, বুঝলাম, বুঝলাম। শুধু বুঝলাম না, পোস্টকার্ড হাতে পেয়েই তুই বুঝলি কী করে যে, তোকে যেতে হবে কুশগ ওয়ানচেং মঠে ?"

"বউদি, তুমি বুঝেছ ?" ইন্দ্রনাথের সাফ প্রশ্ন।

কাষ্ঠ হেসে কবিতা বললে, "একদম না।"

"এই তো সেই পোস্টকার্ড," বললে ইন্দ্রনাথ, "জিরো জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো জিরো-র পরেই প্রতিবার লেখা হয়েছে, 'ওঁ তুল্প'। দেখতে পাচ্ছ ? শুধু মানেটা জানালেই, এই তো ?"

"বলছি তো জানি না!" রেগে যায় কবিতা।

"আমার ওই বইয়ের তাক থেকে 'ম্যাজিক অ্যান্ড মিস্ট্রি ইন টিবেট' বইটা নিয়ে গিয়ে পড়বে। আলেকজান্ড্রা ডেভিড নীল লোমহর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন তুল্পু-র। তুল্পু মানে চিন্তার চেহারা। তিব্বতি যোগীরা বিশ্বাস করেন, মন থেকে জগৎসৃষ্টি সম্ভব। মনের শক্তি দিয়ে যে-কোনও বস্তু গড়ে তোলা সম্ভব। ভয়ানক দানব সৃষ্টিও সম্ভব। তিব্বতি ভাষায় একে বলে তুল্পু। আর কিছু বলার দরকার আছে ?"

"তিব্বতি তুল্পুর আরাধনা চলতে পারে শুধু তিব্বতি মঠ কুশগ ওয়ানচেং-এ ? তাই তো ?" বললাম আমি।

ধড়মড় করে উঠে পড়ে কবিতা বললে, "ইস্, মাটন মোরব্বা বেশ খানিকটা রেখে দিয়েছি—ভুলেই গেছিলাম।'

"যাও, যাও, গরম করে আনো," বলে জিভ দিয়ে ঠোঁট চেপে নিল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

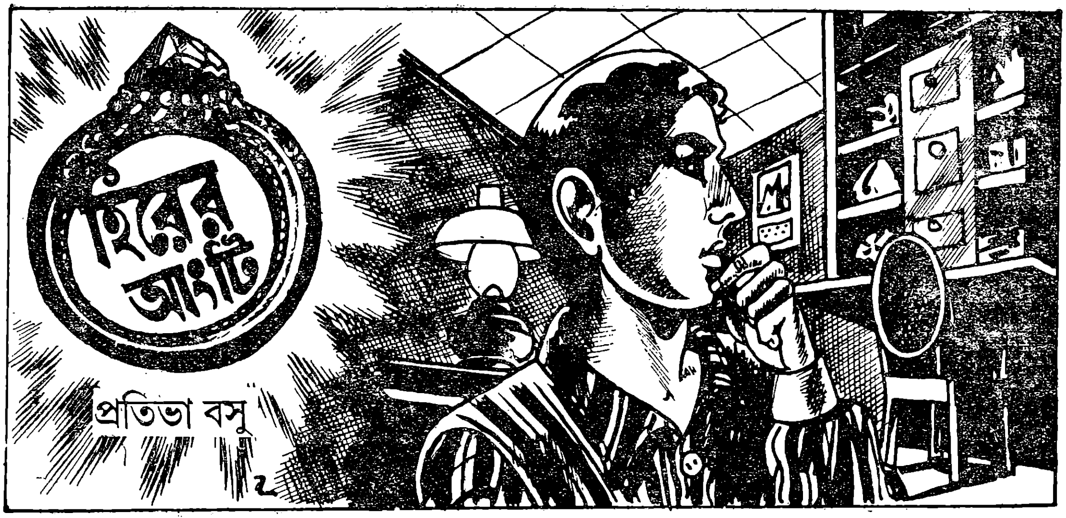

দরজা খুলে সন্দীপ খুশির গলায় বলে উঠল, "এই তো বিকাশমামা এসে গেছেন! কী হয়েছিল? এতদিন আসেননি কেন? মা তো ভেবে অস্থির। ভাল আছেন তো?"

"তোরা সব ভাল তো?" বিকাশমামা ঘরে ঢুকে এলেন।

বসার ঘরে নিয়ে বসাতে-বসাতে সন্দীপ বলল, "আমরা সবাই ভাল। আপনার ভক্ত-হনুমানটি তো একজোড়া নতুন তাস কিনে বসে আছে, কবে তার মামাদাদু এসে তাসের ম্যাজিক শেখাবে।"

"কোথায় সে?"

"এবার তার ক্লাস-টেন হল। নতুন ক্লাসে উঠেছে। নতুন বই কেনা হয়েছে, মহা উত্তেজিত। দাঁড়ান ডাকছি।"

ডাকার আগেই ভক্ত-হনুমান হাজির, "তুমি এসেছ মামাদাদু? তুমি আমাকে সেদিন যে দুটো খেলা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলে সে দুটো দেখিয়ে আমি তো সারা স্কুলে নাম করে ফেলেছি। আজ আরও দুটো শিখিয়ে দিয়ে যেতে হবে, নইলে আর আমার মান থাকছে না।"

"নিশ্চয়ই শিখিয়ে দেব! তোমার দিদা কোথায়? তাকে ডাকো আগে।"

বিকাশমামা সন্দীপের আত্মীয়-মামা কিন্তু নিজের মামার মতোই। হৈমন্তী দেবী নিজের ভাইয়ের সঙ্গেই এই ভাইয়ের কোনও তফাত করেন না। বরং এই ভাইয়ের সঙ্গে বেশি দেখাশুনো হয় বলে সম্পর্কও নিকটতর। ইনি থাকেন কলকাতা থেকে দু'ঘণ্টা দূরের পথ লক্ষ্মীগঙ্গাপুর। টানা বাসে চলে আসেন। সপ্তাহে দু'দিন তো আসেনই, আবার বিপদে-আপদেও বুদ্ধি-পরামর্শ নিতে ছুটে আসেন। এবার এলেন প্রায় সতেরো-আঠারো দিন বাদে।

হৈমন্তী দেবী এসে বলেন, "কী রে কী হয়েছিল তোর? এতদিন আসিসনি কেন? আমি তো ভাবছিলাম আমিই চলে যাই অন্তুকে নিয়ে।"

বিকাশমামা বললেন, "গেলে না কেন? খুব ভাল হত। বড় অশান্তি চলছে বাড়িতে।"

"কেন? কী হয়েছে।"

"আমাদের নীলকান্তমণির আংটিটা হারিয়ে গেছে।"

"কে কী!" হৈমন্তী দেবী চমকে গেলেন, "তোদের দুশো বছরের পুরনো আংটি, চোদ্দপুরুষ ধরে তোরা এই নীলা ব্যবহার করে আসছিস, কী দামি পাথর। এই হিরে এখন তুই পাবি কোথায়? কেমন করে হারাল?"

"সেটাই তো রহস্য। তোমার বাড়িতে যেদিন শেষ এলাম…"

"সেদিন তো তোর আঙুলে ছিল ওটা। কেউ তো কমল-হিরে দেখেনি। সবাই দেখল—কত বড় একটা মারবেলের মতো হিরে—কী ঝিলিক দিচ্ছিল।"

দুঃখিত স্বরে বিকাশমামা বললেন, "মিউজিয়াম থেকে লোক এসেছিল ওটা নেবার জন্য, একটা সাংঘাতিক দামের অফার দিয়েছিল ওটা নেবার জন্য, কিন্তু ওটার দাম তো টাকায় হয় না? ওটা ধারণ করলে আমরা তার চেয়ে অনেক বড় সৌভাগ্যকে ধরে রাখতে পারি। সব-সময় ব্যবহার করি না। নানা কারণে কিছুদিন যাবৎ ওটা ধারণ করছিলাম—গেল! আর যেতে-যেতেই দুটি দুর্ঘটনা—"

'কী"

"বম্বেতে ছেলের একটা অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছিল। ঈশ্বরের দয়ায় প্রাণে বেঁচেছে, হয়ওনি কিছু, তবে সাত দিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছে। আবার এদিকে সেই রাত্রেই শুভ্র একেবারে বিধস্ত হয়ে বাড়ি ফিরল। জামা ছেঁড়া, হাতে রক্ত, খেলার মাঠ থেকে কারা ডেকে নিয়ে গিয়ে নির্জন রাস্তায় খুব মেরেছে। তোমার ভ্রাতৃবধূ তো প্রায় শয্যা নিয়েছেন। তুমি একবার যাবে আমার ওখানে? তুমি দু-একদিন থেকে এলে বাড়ির হাওয়াটা অন্তত একটু হালকা হবে।"

হৈমন্তী বললেন, "নিশ্চয়ই যাব। তুই পুলিশে খবর দিয়েছিস তো?"

"যা করার সব করেছি, কর্তাদের দরজায় ঘুরে-ঘুরে পায়ের দড়িও ছিঁড়ে ফেলেছি, কিছু হবে বলে মনে হচ্ছে না।"

"তুই সীতেশকে চিনিস? তোর জামাইবাবুর বন্ধুর ছেলে, সীতেশ বর্মণ!"

"ঠিক মনে পড়ছে না।"

"ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টে বেশ হোমরা-চোমরা লোক। হঠাৎ-হঠাৎ আসে আমার সঙ্গে। আচ্ছা, দাঁড়া, আমি তাকে একটা ফোন করি।"

করলেন। পেলেনও। কিন্তু তখনই কলকাতায় বাইরে কোথায় কোন্ ষড়যন্ত্র-মামলার আসামিকে ধরতে যাচ্ছে বলে দু'দিন বাদে আসবে বলল।

লক্ষ্মীগঙ্গাপুর জায়গাটা খুব সুন্দর। একেবারে গঙ্গার ধারে। বিকাশমামার বাড়িটাও খুব সুন্দর। একতলা, ছোট বাড়ি, এটা তিনি পরিবার থেকে আলাদা হয়ে নিজে করে নিয়েছেন। পূর্বপুরুষেরা কিঞ্চিৎ তালুকমুলুকের অধিকারী ছিল বলেই এদের খেতাব তালুকদার। এখন আর

বিশেষ কিছু নেই। যে যার করে-কম্মেই খায়। বাড়িঘর, জমিজমাও সব ভাগবাঁটোয়ারা হয়ে গেছে। বিকাশ তালুকদার ব্যবসা করেন। ব্যক্তিগতভাবে বেশ সচ্ছল। একটিমাত্র ছেলে, সেও বেশ উপযুক্ত, বম্বেতে থাকে। বাড়িতে এখন তিনি, তাঁর স্ত্রী আর তাঁর ভাগ্নে শুভ্র ছাড়া কেউ নেই। শুভ্র জন্ম থেকেই মামা-মামির কাছে মানুষ হয়েছে। শুভ্র পেটে থাকতেই তার বাবা মারা যায়, মা মারা যায় তার যখন তিন বছর বয়েস। মামা-মামিই তার মা-বাবা। মামা-মামিরও সে নয়নমণি। তাঁদের নিঃসঙ্গ জীবনের অবলম্বন।

হৈমন্তী দেবী পরের দিন সকালে উঠেই চলে এসেছেন এখানে। অন্তুও সঙ্গে এসেছে। অন্তু এখন ছোট নেই। রীতিমত ক্লাস টেনের ছাত্র, প্রায় ছ'ফুট লম্বা, বুদ্ধি তীক্ষ্ন, দেখতে সুন্দর। ঠিক ছিল, বন্ধুদের সঙ্গে দিঘা যাবে দু'দিনের জন্য। কিন্তু তা না গিয়ে দিদা বলামাত্রই চলে এল এখানে। দিদা বলামাত্রই এল বলে যে সে এখন আগের মতোই দিদা ছাড়া চোখে অন্ধকার দেখে তা নয়। এখন তার অন্য জীবন, অন্য মন, অন্য আড্ডা। এখন আর গোয়েন্দা-গল্পের পোকা নেই, অনেক জরুরি বই পড়ে ফেলেছে, একটি হাতে-লেখা পত্রিকা বার করেছে, যার নাম 'নতুন তোরণ'। একটা গল্পও লিখেছে। তবু যে এল তার কারণ কয়েকটা ম্যাজিক শেখা তার বিশেষ দরকার। নীলা চুরি যাবার ব্যাপারটাও কৌতূহলোদ্দীপক।

ঠাট্টা করে মামাদাদু বললেন, "এই যে আমাদের খুদে ডিটেকটিভটি এসে গেছে, আর ভয় নেই। শুভ্র, বাড়িটাড়ি ভাল করে ঘুরিয়ে দেখাও, ঠিক বার করে দেবে।"

এ-কথায় অন্তু লজ্জিত হল। ছেলেবেলায় কবে কী করেছে, তাই নিয়ে এখনও সবাই কেবল ঠাট্টা করে।

শুভ্রদার সঙ্গে সব সে ঘুরে দেখতে বেরোল ঠিকই, কিন্তু বাড়িটা ঘুরে দেখতে নয়, পাড়টা। গঙ্গার ধারে গিয়ে বটগাছ তলায় বসতে ভীষণ ভাল লাগল।

শুভ্র ফুটবল খেলায় বেশ পটু, অন্তু যা একদম পারে না। সেজন্য সে বরাবরই শুভ্রদার ভক্ত। শুভ্র তার চেয়ে পাঁচ-ছ'বছরের বড়, সদ্য-সদ্য বারো ক্লাস পাশ করেছে। স্থানীয় কলেজেই এখন বি. এ. ক্লাসের ছাত্র।

উদাস গলায় শুভ্র বলল, "গঙ্গার জলের দিকে তাকালেই আমার কী ইচ্ছে করে জানিস ?"

"কী ?"

"মনে হয় একডুবে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে একেবারে সেখানে চলে যাই।"

অন্তু ভাবল শুভ্রদা বুঝি মৃত্যুর কথা বলছে। হেসে বলল, "এত দুঃখ তোমার কী যে একেবারে সেইখানে চলে যাবে ?"

শুভ্র বলল, "দুঃখ না হোক, সুখই-বা কী! বাড়ির যা হাল হয়েছে আংটি হারিয়ে!"

"সে তো হবেই। ওরকম একটা দুষ্প্রাপ্য নীলা! তার উপরে কতকালের পুরনো স্মৃতি। আমারও খুব কষ্ট হচ্ছে।"

"আমারও তো হয়েছে, তা নয়। আমি সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে আমেরিকা

যেতে চাই। এখানকার কোনও কিছুই আমার ভাল্লাগে না।"

"ও, তুমি আমেরিকা যেতে চাও? আমি অন্যরকম ভেবেছিলাম। বেশ তো। এখন তো ওখানে যাওয়া খুব সহজ।"

"সহজ, না? টাকাটা কে দেবে চাঁদু?"

"স্যাট দিলে না কেন? ভাল করে পাশ করলে হয়তো একটা স্কলারশিপ পেয়ে যেতে। বাদবাকি খরচ মামাদাদু দিতেন।"

"আমি পাব স্কলারশিপ?" হাহা-হিহি, হাসতে-হাসতে মরে গেল শুভ্র, "আমি ক'বার ফেল করেছি জানিস? তবু মামণি আর মামাবাবু আমাকে পড়াবেই পড়াবে। বলে বি. এ-টা অন্তত পাশ কর, নইলে তো কোনও চাকরিই পাবি না। আমি যেন চাকরির জন্য অস্থির। চাকরি করে কেউ কখনও বড়লোক হয় না।"

অন্তু প্রসঙ্গ বদলে বলল, "পুলিশ কী বলে? পাথরটা ওরা বার করতে পারবে? তোমার কী মনে হয়?"

"দূর, দূর, ওরা কি সব-কিছু পারে নাকি? কোনওদিন শুনেছিস? অত সহজ নয়। সেদিন পুলিশের লোকজন এসে কত রঙ্গ দেখাল। এদিকে কাজ হল না কিছুই।"

"কাল তো সীতেশ বর্মন আসবেন।"

"আরে, আসুক, আসুক। সব বর্মনকেই আমার দেখা আছে। পাথরটা হেভি দামি। মিউজিয়াম পিস। মিউজিয়ামের লোক এক লক্ষ টাকায় কিনতে চায়। মামবুটা এমন বোকা, বলে যে টাকা দিয়ে আমার কী হবে? আরে বাবা, টাকা দিয়ে কী না হবে শুনি? টাকা দিয়েই তো সব হয়? বাড়ি হয়, গাড়ি হয়, সুন্দরী বউ হয়, ইচ্ছে করলেই আমেরিকা যাওয়া যায়..."

অন্তু হেসে ফেলল, "তোমার খুব আমেরিকা যাবার শখ না?"

"দারুণ। জানিস ওখানে গেলে কতো ফুর্তি, কত মজা, কত টাকা, কত নাইট ক্লাব। আঃ, একবার যদি যেতে পারি না—ওই আংটি আঙুলে আটকে বসে কী হবে? মামবুর পরে মামবুর ছেলে পাবে এই তো?"

অন্তু বলল, "তা কেন, তোমাকেও দিতে পারেন, তুমিও তো ছেলে। মামিদিদা বোধ হয় বাবলুদার চেয়ে তোমাকেই বেশি ভালবাসেন।"

"পাগল! আরে বাবা, ছেলে আর ভাগনে কখনও সমান হয় তার উপরে বংশ? বংশানুক্রমে তো আসতে হবে ওটাকে।

"মামিদিদা ভাবছেন ওই নীলাটা হারিয়েছে বলেই তুমি সেদিন মার খেয়েছ।"

"ধুত, যত সব বাজে সংস্কার।"

"তবে এতদিন কখনও মার খেলে না, সেদিন খেলে কেন?"

"চেষ্টা চলেছে অনেকদিন থেকে, বুঝলি? সুযোগ পায়নি। সেদিন সদ্য-সদ্য জিতেছি—গুণ্ডাগুলো ধরে ফেলল। মাঝখান থেকে অত সুন্দর জামাটা আমার ছিঁড়ে গেল। কী সুন্দর

বেলকুঁড়ি বোতাম ছিল, একেবারে জবাফুল রঙের র' সিলকের জামা, কত দাম,। এই সেদিন জন্মদিনে মামণি কিরিয়ে দিলেন।"

"মাত্র তো একটা বোতামই ছিঁড়ে পড়ে গেছে, পকেটটাই মাত্র ছিঁড়েছে। বুক-পকেটে দরকার কী তোমার ? ওটা ঠিক সারিয়ে নিতে পারবে। চলো, এবার বাড়ি যাই, সন্ধ্যে হল।"

"চলো।"

দু'জনেই উঠে হাঁটতে লাগল বাড়ির দিকে।

পরের দিন রোববার। বেলা দশটা নাগাদ এসে পেঁৗছে গেল সতীশ। ছুটির দিনে এই আউটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে খুব খুশি হয়েছে। হৈমন্তী একটা চিঠি লিখে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেছিলেন, "কলকাতা থেকে মাত্র দু'ঘণ্টার রাস্তা, গঙ্গা একেবারে বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে যায়, এখানে এসে একটা দিন কাটিয়ে যাও, খুব ভাল লাগবে। এটা আমার ভাইয়ের বাড়ি। এখানে এসেই যে খাবে সে-কথা না লিখলেও চলে। তোমার জন্য ইলিশ মাছের পাতুরি আর চিংড়ি মাছের মালাইকারি রান্না করব আমি, যা তুমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসো। আর যে জরুরি কথাটা তোমাকে বলব, সেটা এখানে এলে জানতে পারবে।" লক্ষীগঙ্গাপুরে পেঁৗছে সতীশ চিঠিটায় আর একবার চোখ বুলোল, ডিরেকশন দেখে নিল। তারপর তার ফিয়েট গাড়ি এসে থামল বিশাল তালুকদারের বাড়ির দরজায়।

বলাই বাহুল্য, কাকিমার হাতের পছন্দসই রান্না খেয়ে খুবই খুশি হল। বাড়ির লোকজনদেরও খুব ভাল লাগল। তারপর আসল কথাটা শুনল। বিকাশবাবু বললেন, "পুলিশের লোক দু'দিন এসে ঘুরে-ফিরে দেখে গেছে সব।"

হৈমন্তী বললেন, "তুমি যদি তোমার অফিসারদের একটু মনোযোগ দিতে বলো, আমার মনে হয় তাতে অনেক বেশি কাজ হবে।"

চিন্তা করে সমীর বলল, "আচ্ছা, মিউজিয়ামের ভদ্রলোক যখন পাথরটার বিষয়ে দাম বলছিলেন তখন কি ঘরে কোনও তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিল ?"

বিকাশ বললেন, "না বোধ হয়। শুভ্র কলেজে চলে গেছে, আর পঞ্চানন তো সে-সময়ে রান্নাঘরে ছিল।"

"পঞ্চানন কে ?"

"আমার মা-বাবার আমলের পুরনো রান্নার লোক।"

"সে ছাড়া আপনাদের আর কোনও কাজের লোক আছে ?"

"আছে। ঠিকে। আকাশীর মা। সুরিপাড়া বস্তিতে থাকে।"

"কত দূর ?"

"খুব দূর নয়। জায়গাটাই বা কতটুকু।"

"ওর কে আছে ?"

"স্বামী নেই। মেয়ে-জামাই আছে, তারাও ওই বস্তিতেই থাকে।"

"যখন দেখলেন আংটিটা নেই, আপনার স্ত্রী তখন বাড়ি ছিলেন না?"

"না।"

"ভাগ্নেও নয়?"

"না।"

ওরা ফিরলেন কখন?

"স্ত্রী আটটার সময় ফিরলেন। শুভ্র সাড়ে ন'টায়।"

"কখন বেরিয়েছিলেন ওঁরা?"

"শুভ্র বেরিয়েছিল সাড়ে তিনটেতে। ওদের ক্লাবে সেদিন একটা টি-পার্টি ছিল। স্ত্রী বেরিয়েছিলেন তার খানিক বাদে, ওঁর এক বন্ধুর বাড়ি।"

"তারপর?"

"ওরা বেরিয়ে গেলে দরজা বন্ধ করে আমি শুয়ে পড়েছিলাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। উঠে দেখি প্রায় অন্ধকার সাতটা, সাড়ে সাতটা নাগাদ আমার এক জায়গায় যাবার ছিল। দৌড়ে চান করতে গেলাম। যাবার আগে খাবার টেবিলের উপর ঘড়িটা আর আংটিটা খুলে রেখে গেলাম। আপনি তো খাবার ঘরটা দেখলেন সঙ্গেই বাথরুম। আর একটা দরজা আছে পাশে পিছনের উঠোনে যাবার জন্য। সেখানে টিউবওয়েল আছে, ওরা বাসনটাসন মাজে। উঁচু দেওয়ালে ঘেরা। দরজা বন্ধ ছিল। জানালাটা খোলা ছিল।"

এই সময় বিকাশ তালুকদারের স্ত্রী ঊষা বললেন, "আমাদের কাজের লোকেরা কিন্তু খুব ভাল। ওদের আমরা সন্দেহ করি না। তা ছাড়া পঞ্চানন আংটি হারাবার চারদিন আগে দেশে গেছে। আকাশীর মা ওসব খেয়াল-টেয়াল করে না।"

শুভ্র বলল, "না মামণি, আকাশীর মা কিন্তু বেশ চালাক। যেদিন থেকে মিউজিয়ামের লোক এসে আংটিটার দাম বলে গেছে, আর তোমরা তাই নিয়ে কথা বলেছ, আকাশীর মা কিন্তু বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনেছে।"

সমীর বলল, "যাই হোক, ভাববেন না, আমি যথাসাধ্য করব। কোনওরকম ক্লু পাওয়া গেলে ফোরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ঠিক লোকটিকে ধরে ফেলতে পারে। তা যখন পায়নি পুলিশকে তখন যতটুকু পেলাম ততটুকু ধরেই এগোতে হবে।"

তাই হল। গ্রাম থেকে ধরে নিয়ে আসা হল পঞ্চাননকে। আকাশীর মাকেও ধরা হল। শেষে বস্তি তোলপাড় করে সেখানেই ধরা পড়ল চোর। বাতাসীর নিতাইচরণ। নিতান্ত গো-বেচারা ভালমানুষ ছাড়া আর কিছুই যাকে মনে হয় না। তার ঘর সার্চ করে চোরাই কারবারের অনেক প্রমাণ মিলল। বিকাশ তালুকদারের বাড়ির একটি বড় রুপোর থালাও পাওয়া গেল। তাদের শিগগিরই এই বস্তি থেকে অন্য বস্তিতে চলে যাবার কথা ছিল। চলে গেলে আর ধরা যেত না। প্রথমে কিছুতেই স্বীকার করতে চায়নি, বলেছে এসব জিনিস যে কী করে কখন ঘরে এল সে জানে না। এসবের সঙ্গে তার কোনও যোগ নেই। শেষে মারতে-মারতে যখন মুখ দিয়ে রক্ত বার করে

ফেলল তখন চিৎকার করে বলল "হ্যাঁ, আমি চোর। আমি চোর। আমাকে মেরে ফেলো!" শুধু আংটিটা কী করেছে সেটা কিছুতেই বলছে না। পাগলের ভান করছে।

ঊষা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। শেষে নিতাই? যাকে তিনি চূড়ান্ত ভালমানুষ বলে জানেন। যার কাছ থেকে তিনি প্রত্যহ সবচেয়ে টাটকা, সবচেয়ে শস্তা সবজি রাখেন!

অন্তু হটাৎ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে ছুটে এল, "দিদা, তুমি এক্ষুনি সমীর-কাকাকে ফোন করো, বলো, কোন প্রমাণ না পেয়ে এভাবে কাউকে মারা কখনওই উচিত নয়। এরকম আইন নেই।" সে কাঁপছিল।

তার অবস্থা দেখে হৈমন্তী দেবী ভয় পেয়ে গিয়ে বললেন, "ঠিক আছে চল, আমরা এক্ষুনি কলকাতা চলে যাই, ওখানে গিয়ে ফোন করি।"

শুভ্র অন্তুকে জড়িয়ে ধরল, "তুই এরকম করছিস কেন? কী হয়েছে তোর?"

"না, না, এ হতে পারে না, হতে পারে না।" প্রবলবেগে মাথা নাড়ল সে।

হৈমন্তীর ইঙ্গিতে শুভ্র তাকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে এল। শান্ত করতে চেষ্টা করে বলল, "অন্যায় করলে তো তাকে সাজা পেতেই হবে অন্তু, নিজের মুখে স্বীকার করেছে সে চোর, তার ঘর থেকে তার প্রমাণ বেরিয়েছে"

"মিথ্যে কথা। সাজানো কথা। যে চোর সে ওকে এভাবে চোর সাজিয়েছে।"

"তবে কে চোর?"

"শুভদা, আমি তোমাকে ভালবাসি।" অন্তুর গলা ভেঙে গেল।

শুভ্র বলল, "সেটা কি নতুন কথা? আমিও তো তোকে ভালবাসি।"

"সেজন্যই বলছি, হয়েছে হয়েছে, বিনা অপরাধে মানুষগুলোকে আর তুমি শাস্তি দিও না। মার খেতে খেতে লোকটা পাগল হয়ে গেল। এখনও তুমি চুপ করে থাকবে?"

"মানে! শুভ্র ছিটকে উঠে দাঁড়াল।

অন্তু বলল, "শোনো শুভ্রদা, আমি বলব আমি খুঁজে পেয়েছি, কেউ কিছু জানবে না।"

"কী বলতে চাইছিস তুই?"

"তুমি তা বুঝেছ।"

"তার মানে তুই আমাকে চোর বলছিস?" শুভ্র দাঁতে দাঁত পিষল, বড়-বড় নিশ্বাস নিল, তার ফরসা রং লাল টকটকে হয়ে গেল।

শুভ্র তেমনই স্বরে বলল, "তুমি ওটা আমাকে দিয়ে দাও, আমি যেভাবে পারি তোমাকে রক্ষা করব। আমার দিদা সব ঠিক করে দেবেন।"

"কী প্রমাণ তুই পেয়েছি যে, এরকম একটা ভয়ঙ্কর গর্হিত অপবাদ দিয়ে আমাকে অপমান করছিস?"

'এখনও যদি তুমি না স্বীকার করো, নিরপরাধ লোকটাকে না বাঁচাও, আমি নীরকাকাকে

সব বলে দেব।"

"কী বলবি তুই? পাজি ছেলে, তোর এত বড় স্পর্ধা!"

"আমি প্রমাণ পেয়েছি।"

"কি প্রমাণ পেয়েছিস তুই?"

"আমি তোমাদের বাড়িটা খুব ভাল করে একদিন খুঁজেছি! তিনটে জিনিস চোখে পড়েছে আমার। এক, তোমাদের খাবার ঘরের জানালার তলার নর্দমার মধ্যে একটা বাঁকানো লোহা, যেরকম বাঁকানো লোহা দিয়ে কয়লার উনুন খোঁচায়। দুই, উঠোনের ঘেরাও করা উঁচু দেওয়ালের মাথায় কোণের দিকে একটা পেরেকের মাথার সঙ্গে প্রায় মিশে, বৃষ্টিতে ভিজে নেতিয়ে আটকে-থাকা এইটুকু একটা লাল র' সিলকের টুকরো। তিন, ঠিক তার নীচেই মাটিতে কাদায় মাখামাখি হয়ে থাকা একটা ছোট বেলকুঁড়ি বোতাম।"

"এই তোর প্রমাণ?"

"হ্যাঁ, এই আমার প্রমাণ। আর আমার আন্দাজ এবং দিন কতক' ধরে তোমাকে স্টাডি করা।"

"কী স্টাডি করেছিস তুই আমাকে? জানিস, তোর এই মিথ্যে কথা বলার জন্য আমি লোক লাগিয়ে মেরে তোর হাড় গুঁড়ো করে দিতে পারি?"

"না, পারো না। আমি বলছি। মামাদাদু যখন তাঁর ঘড়ি, আংটি খুলে খাবার টেবিলের উপর রেখে বাথরুমে গেলেন, তুমি তক্ষুনি ফিরে এসে পিছনের দেওয়াল টপকে বাড়ি ঢুকলে। তুমি লেখাপড়া করো না এবং নানারকম বাজে সংসর্গে মেশো বলে মামাদাদুর কড়া অর্ডার ছিল ছ'টার মধ্যে খেলাধুলো সেরে বাড়ি এসে তোমাকে পড়তে বসতে হবে। তুমি প্রায়ই এরকম দেরি করে এসে দেওয়াল টপকে ভিতরে ঢোকো। পিছনের দরজাটা সাধারণত খোলাই থাকে, নিঃশব্দে ঢুকে নিজের ঘরে গিয়ে ভাল ছেলের মতো বই মুখে বসে থাকো। মামিদিদাও তোমাকে এ-বিষয়ে আশকারা দেন মামার বকুনি থেকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু সেদিনও তাই করেছিলে। তুমি ভাবোনি দরজাটা বন্ধ থাকবে, মামিদিদার বদলে মামাদাদু বাড়িতে থাকবেন। তাই দরজায় টোকা না দিয়ে জানালায় উঁকি মারলে। উঁকি মেরেই আংটিটা চোখে পড়ল তোমার।

"তার আগে পর্যন্ত কিছুই ভাবোনি, কিন্তু আংটি দেখেই তোমার মনে হল এই তো আমার আমেরিকা যাবার পাথেয়। এখন যদি নিয়ে পালাতে পারি কে ধরবে আমাকে? সঙ্গে-সঙ্গে হাত বাড়ালে, হাতে পেলে না, ওই কয়লার উনুন খোঁচাটা দিয়ে টেনে নিলে। তারপর ওটা নর্দমার মধ্যে ফেলে দিয়ে যখন আবার তাড়াহুড়ো করে দেওয়াল টপকাতে যাচ্ছ, তখনই পেরেকটায় লেগে তোমার জন্মদিনের র' সিলকের নতুন জামাটা বুকের কাছে ছিঁড়ে গিয়ে একটি টুকরো লেগে রইল সেখানে, আর বোতামটা পড়ে গেল নীচে।"

"শুভ্র স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেমে বলল, "আর ওই যে নিতায়ের বাড়িতে সব চোরাই মাল পাওয়া গেল, রুপোর থালা পাওয়া গেল, তার কী হবে?"

"আমি সেটা নিয়ে ভাবিনি। কিন্তু বুঝতে পেরেছি ওটা নিজেকে রক্ষা করবার জন্য তোমারই কৌশল। তুমি তো সত্যি ক্রিমিনাল নও। চুরি তো তোমার পেশা নয়। হঠাৎ একটা হয়ে গেছে, তারপর আর সামলাতে পারছ না।"

সহসা দু' হাতে মুখ ঢাকল শুভ্র সরু-মোটা গলায় কেঁদে ফেলে বলল, তুই আমাকে বাঁচা অন্তু, সত্যি আমি আর পারছি না। ওই নীলা আমাকে প্রতি মুহূর্তে মেরে ফেলছে। আমি ওটা চাই না চাই না।"

প্যাণ্টের কোমরে হাত ঢুকিয়ে কোথায় কোন লুকানো জায়গা থেকে সে বার করে আনল নীলার আংটিটা।

গোগোলের শরীর খারাপ। ঘরের মধ্যে খাটের বিছানায় শুয়ে আছে। পাশ ফিরে চোখ বুজে রয়েছে। মাথার বালিশের কাছে রয়েছে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা ছোটদের জন্য লেখা গল্পের বই। আর একটা কিশোর-পত্রিকা। বাবা ঘণ্টাখানেক আগে অফিসে বেরিয়ে গেছেন। মায়ের এক বান্ধবী এসেছেন, রেখামাসি। মা তাঁর সঙ্গে বসার ঘরে বসে গল্প করছেন।

শরীর কেউ ইচ্ছে করে খারাপ করে না। মা'র ধারণা গোগোল বৃষ্টিতে ভিজে ইস্কুলে খেলতে গিয়ে ঠাণ্ডা লাগিয়েছে। আর তার জন্যই ওর জ্বর আর কাসি হয়েছে। অবিশ্যি জ্বর বা সর্দিকাসি কোনওটাই এমন কিছু বেশি নয়, জ্বর এখন অল্পই আছে। ওর নিজের সেই রকম ধারণা। কাসিটাও অল্পই আছে। আজ চার দিন ও ইস্কুল কামাই করে শুয়ে রয়েছে। শুয়ে থাকতে আর মোটেই ভাল লাগছে না। কিন্তু মা'র কড়া বারণ, চুপচাপ শুয়ে বিশ্রাম নিতে হবে। গোগোল বুঝেছে, সবসুদ্ধ এক সপ্তাহ ইস্কুল যাওয়া হবে না। বন্ধুরাও কেউ বাড়ি নেই যে, ডেকে নিয়ে এসে গল্প করবে। সবাই এখন ইস্কুলে গেছে!

গোগোল মা'র কথায় বাধ্য ছেলের মতো চোখ বুজে শুয়েছিল। বাড়িতে নতুন কোনও বই বা পত্রিকাও নেই যে পড়বে, মাঝে-মাঝে নীচে থেকে গাড়ির হর্নের শব্দ ভেসে আসছে। কোনও গাড়ি আসছে, অথবা বেরিয়ে যাচ্ছে। ওদের বিল্ডিংয়ের সামনে রাস্তা দিয়ে যাওয়া-আসা গাড়ির একটুআধটু শব্দ শোনা যায়। আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

গোগোলের এক সময়ে একটু যেন তন্দ্রামতো এসেছিল। এই অবস্থায় ও শুনল, কোথায় ঠুক ঠুক করে শব্দ হচ্ছে। শুনতে শুনতে ওর তন্দ্রা ভেঙে গেল, আর তখনই শব্দটাও থেমে গেল। কোথা থেকে শব্দটা আসছিল? ওদের নিজেদের ফ্ল্যাটেই কি শব্দ হচ্ছিল? বঙ্কিমদা কি কোনও ঘরের দেওয়ালে পেরেক বা কিছু পুঁতছিল?

গোগোল মিনিটখানেক কান পেতে থেকে, আবার চোখ বুজে অন্য পাশ ফিরে শুল। তন্দ্রার ঘোরে নয়, হয়তো জ্বরের ঘোরে ভুল শুনছে, ফ্ল্যাটের মধ্যে কোনও ঘরে পেরেক ঠুকলে আরও জোরে শব্দ হয়। কিন্তু ঠুক ঠুক শব্দটা শোনা যাচ্ছিল খুব আস্তে-আস্তে। গোগোলের মন থেকে ভাবনাটা চলে গেল। আবার একটু তন্দ্রার ঘোর এল। ওর কানে শব্দ ভেসে এল। কেউ যেন খুব আস্তে কোথাও করাত ঘষছে। শুনতে শুনতে আবার ওর তন্দ্রা ভেঙে গেল। কেউ কোথাও করাত চালাচ্ছে? শব্দটা যেন সেই রকমই শোনাচ্ছে। কাঠের উপর করাত চালাচ্ছে। নাকি লোহার ওপর কিছু ঘষছে? ভাবতে-ভাবতেই শব্দটা থেমে গেল। কোথা থেকে শব্দটা ভেসে আসছিল? ওদের ফ্ল্যাটের মধ্যে নিশ্চয়ই নয়। ওপরের ফ্ল্যাটে শব্দ হচ্ছে কি? ওপরের ফ্ল্যাটটা ঠিক গোগোলদের মতোই। ওদের শোবার, বসবার, খাবার, আর বাথরুমের ওপরের ফ্ল্যাটেও একই রকম সব।

বঙ্কিমদা ঘরের মধ্যে ঢুকল। সে গোগোলদের বাড়িতে অনেকদিন আছে। গোগোলের জন্মের সময় থেকে। বঙ্কিমদা ওকে রীতিমত শাসন করে। বাবা-মা'র সেই রকম নির্দেশ আছে। গোগোল জিজ্ঞেস করল "বঙ্কিমদা, আমাদের ওপরের ফ্ল্যাটে কোনও কাজ হচ্ছে?"

"কী কাজ হবে?" বঙ্কিমদা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমাদের ওপরে তো টুকাইদের ফ্ল্যাট।"

গোগোল তা জানে। টুকাই ওর বন্ধু। ওদের ফ্ল্যাটের নাম্বার বাষট্টি-এ। টুকাইদের ফ্ল্যাটে কি কোনও কাজ হতে পারে না? গোগোল বলল, "টুকাইদের ফ্ল্যাটে বোধহয় কিছু কাজ হচ্ছে।"

কী সব আজেবাজে কথা বলছ?" বঙ্কিমদা কাঠের আলমারি খুলে কী যেন বের করে নিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বলল, "তোমার জ্বরটা বেড়েছে নাকি?"

গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেন, জ্বর তো বাড়েনি।"

বঙ্কিমদা'র যেন বিশ্বাস হল না। খাটের কাছে এসে গোগোলের কপালে হাত দিয়ে দেখে, চোখ কপালে তুলে বলল, "এ কী জ্বর তো বেশ ভালই রয়েছে। বেড়েছে বলেই মনে হচ্ছে। তাই তুমি টুকাইদের ফ্ল্যাটে শব্দ শুনতে পাচ্ছ! কিন্তু ওদের ফ্ল্যাট তো খালি। কেউ নেই। ওরা কয়েক দিনের জন্য কলকাতার বাইরে কোথায় গেছে। জ্বরের ঘোরে ও-রকম অনেক কিছু শোনা যায়। চুপ করে শুয়ে থাকো।"

বঙ্কিমদা হাসতে হাসতে ঘরের বাইরে চলে গেল। গোগোলের মনে পড়ে গেল, তাই তো! টুকাইরা যে ওর মামাতো দিদির বিয়েতে কয়েকদিনের জন্য কৃষ্ণনগর গেছে। তা হলে কি ঠুকঠুক ঘঁসঘঁস কোনও শব্দ শোনেনি? নেহাতই জ্বরের ঘোরে শব্দ শুনতে পেয়েছে? ভাবতেই বেশ স্পষ্ট সেই ঠুকঠুক শব্দ আবার শব্দ শুনা গেল। এবার আস্তে শব্দটা হচ্ছে। ঠিক যেন গোগোলের মাথার ওপরেই শব্দটা হচ্ছে। এখন তো ও আর তন্দ্রার ঘোরে নেই। রীতিমত চোখ চেয়ে জেগে শুয়ে আছে। কোনও সন্দেহ নেই। শব্দটা হচ্ছে ওর মাথার ওপরে,

ঘরের মেঝেয়। অথচ টুকাইদের ফ্ল্যাটে কেউ নেই!

গোগোল উত্তেজনায় উঠে বসল। আর তৎক্ষণাৎ শব্দটা বন্ধ হয়ে গেল। কী রে বাবা! যেন ওপরে তন্দ্রা ভাঙা আর উঠে বসার সঙ্গে শব্দ থেমে যাবার একটা যোগ আছে? ও মুখ তুলে তাকাল। সিলিং পাখা বন্ধ করা আছে। তাকিয়ে দেখে বোঝার কিছুই নেই। নিজেরই সন্দেহ লাগে, সত্যি শব্দটা শুনেছে কি না।

আবার আচমকা বেশ ভারী কিছু পড়ার একটা শব্দ হল। কিন্তু শব্দটা এ-ঘরের মাথার ওপরে মেঝেয় হয়নি। পাশের বা পশ্চিমের ব্যালকনির দিকে ঘরের মেঝেয় যেন শব্দটা হল। বেশ ভারী কিছু যেন হঠাৎ পড়ে গেছে। শব্দটা হল মাত্র একবার। আর কোনও শব্দ নেই।

গোগোল ওপরের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। মনেই হচ্ছে না, ওপরের কোনও শব্দ হয়েছে। সব চুপচাপ। কিন্তু শব্দ যে হয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। গোগোল ওর নিজের কানকে এতটা অবিশ্বাস করতে পারে না। আর এই শব্দের অভিজ্ঞতা ওর ছেলেবেলা থেকেই ভারী গোলমেলে। কাশ্মীরে পহলগ্রামে বেড়াতে গিয়ে, একটা অদ্ভুত গাড়ির ভেতরে ইঁদুরের ঠুকঠুক শব্দ শুনে কী ভয়ঙ্কর ঘটনাই না ঘটেছিল! বিরাট এক ব্যাঙ্ক-ডাকাতির ডাকাতরা আর টাকা সবই ধরা পড়েছিল। এই বাড়িরই ছ' তলায় ডাবুদা'কে যখন চুরি করা হয়েছিল, গোগোল তখন সেই ফ্ল্যাটের ভেতরে একজনের গলার স্বর শুনতে পেয়েছিল। অথচ মহেশানিদের ফ্ল্যাট তখন খালি ছিল। ডাবুদা'কে সেই ফ্ল্যাটেই পাওয়া গেছিল।

গোগোলের হঠাৎ মনে হল টুকাইরা ফিরে আসেনি তো? বঙ্কিমদা হয়তো জানে না। কথাটা মনে হতেই, ও খাট থেকে আস্তে-আস্তে নামল। মা টের পেলে খুব রেগে যাবেন। আর ও কী করতে যাচ্ছে, সে-কথা তো মাকে বলাই যাবে না। ওকে বাবার ঘরে যেতে হলে, বসার ঘরের ওপর দিয়েই যেতে হবে। তবে বসার ঘরের মাঝখানে যেতে হবে না। বসার আর খাবারঘরের পাশ দিয়ে বাবার ঘরে যাওয়া যায়। ও ঘরের দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে বসার ঘরের দিকে উঁকি দিল। মা আর রেখামাসিকে খানিকটা দেখা যাচ্ছে। দুজনেই এত ব্যস্ত, এদিকে তাকাবার সময় নেই।

গোগোল ঘর থেকে বেরিয়ে, বাঁ দিকে ঘুরে বাবার ঘরের দরজায় চলে গেল। বঙ্কিমদা দেখলে মা জেনে যাবেন। ও বাবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। বাবার ঘরেই টেলিফোনটা থাকে। টুকাইদের টেলিফোন-নাম্বারও গোগোলের মনে আছে। ওর ধারণা টুকাইরা কৃষ্ণনগর থেকে ফিরে এসেছে, নইলে ওই রকম শব্দ হতে পারে না। ও টেলিফোনের কাছে গিয়ে রিসিভার তুলে ডায়াল করল। টুকাইদের ফ্ল্যাটে টেলিফোন বাজছে। এখন টুকাই ইস্কুলে গেছে। ওর বাবা অফিসে গেছেন। ওর মা বা দিদি টেলিফোন ধরতে পারেন। কিন্তু কেউ টেলিফোন ধরছেন না। বেজেই যাচ্ছে।

গোগোল রিসিভারটা চোখের সামনে তুলে দেখল। আবার কানে চাপল। বাজছে। সন্দেহ হল, ঠিক নাম্বার ডায়াল করেছিল তো? সন্দেহ হতেই, রিসিভার নামিয়ে রেখে আবার

তুলল। ডায়ালের শব্দ হচ্ছে। টুকাইদের নাম্বারটা মনে মনে আউড়ে প্রত্যেকটি নাম্বার ধরে ধরে ডায়াল করল। রিং হচ্ছে। কিন্তু সেই একই ব্যাপার। বেজেই যাচ্ছে। কেউ লাইন ধরছে না। গোগোল বেশ খানিকক্ষণ শুনে, হতাশ হয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল। হয় টুকাইদের টেলিফোন খারাপ আছে। গোগোল শুনতে পাচ্ছে, অথচ ওদের ফোনে বাজছে না। অথবা ওরা সত্যি-সত্যি কৃষ্ণনগর থেকে ফেরেনি। তা হলে যে ভারী মুশকিল!

গোগোল পা টিপে টিপে আবার নিজের ঘরে ফিরে এল। খালি পায়ে হাঁটাহাঁটি করতে দেখলেই মা রেগে যাবেন। ও খাটের ওপর উঠে বসল। আর ভাবল, তবে শব্দগুলো কোথা থেকে এল? ও কি সত্যি ভুল শুনেছে? বসে না থেকে ও আবার শুয়ে পড়ল। এখন কোনও শব্দই শোনা যাচ্ছে না। ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইটা টেনে নিল। সব গল্পই পড়া। মাঝখান থেকে একটা পাতা খুলল। শরদিন্দুবাবুর গল্প একবার-দু'বারের বেশিও পড়া যায়।

পাতা মেলেও গল্প পড়া হল না। আবার শব্দ! করাত ঘষার শব্দ। খুব আস্তে শব্দটা শোনা যাচ্ছে। করাত যে কাঠের ওপর চলছে না, তা বোঝা যায়। টিন বা লোহার ওপরে খুব আলতো চেপে একটা কিছু চালানো হচ্ছে। আর শব্দটা স্পষ্ট ওর মাথার ওপরেই হচ্ছে। মিনিটখানেক শব্দটা হল। হঠাৎ ওপরের মেঝের ওপর টং করে একটা কিছু পড়ে যেন একটু গড়িয়ে গেল, তারপরেই আবার শব্দ বন্ধ। টুঁ শব্দটিও নেই।

গোগোল আবার উঠে বসল। এখনও কি ওর নিজের কানকে অবিশ্বাস করতে হবে? এও কি জ্বরের ঘোর? এর পরে ওর ওপরে যাওয়া ছাড়া কী উপায় আছে? ওকে ওপরে গিয়ে দেখতে হবে, টুকাইরা আছে কি নেই। না থাকলে, শব্দ কেন হচ্ছে? কারাই বা শব্দ করছে? ইঁদুর, ছুঁচোতে ওই রকম শব্দ করতে পারে না। কিন্তু এ রকম জ্বর নিয়ে, যদি বা বাবার ঘরে যেতে পেরেছিল, ওপরে উঠতে পারবে কি? অবিশ্যি দরজা খুললেই লিফট। কিন্তু মা যদি দেখতে পান। ও ফ্ল্যাটের বাইরে এক পা-ও বেরোতে পারবে না। তা ছাড়া বেরোতে গিয়ে যদি মাথা ঘুরে পড়ে যায়?

"কী ব্যাপার গোগোল?" মা দরজায় উঁকি দিলেন, "বসে কী করছ? জ্বর-গায়ে তোমাকে আমি শুয়ে থাকতে বলেছি।"

গোগোল কিছু বলতে যাচ্ছিল। রেখামাসি ঘরে ঢুকে খাটের সামনে চলে এলেন। গোগোলের কপালে আর গলায় হাত দিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, "এ কী, জ্বর তো বেশ ভালই রয়েছে। চোখও লাল দেখাচ্ছে। শুয়ে পড়ো গোগোল।"

"গোগোল সত্যি বড় অবাধ্য হয়েছে," মা বললেন, ইস্কুলে খেলতে গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লাগিয়ে জ্বর করেছে। শুয়ে থাকতে বলেছি। দ্যাখ, উঠে বসে আছে।"

গোগোল বাধ্য হয়ে শুয়ে পড়ল। রেখামাসি বেরিয়ে গেলেন। মা রেখামাসিকে বাইরের ঘরের দরজায় এগিয়ে দিতে গেলেন। আর তখনই আবার ঠুকঠুক শব্দ শোনা গেল। ও কি জ্বরের ঘোরে শব্দ শুনছে? মা, বঙ্কিমদা, কারও কানেই কি এই হঠাৎ-হঠাৎ শব্দ যাচ্ছে না? ভাবতে-

ভাবতেই ঠুকঠুক শব্দ থেমে গেল। গোগোল ওপরের দিকে তাকাল। কিন্তু সেই করাত চালাবার শব্দটা শোনা গেল।

মা রেখামাসিকে বিদায় দিয়ে ঘরে এলেন। খাটের সামনে গিয়ে গোগোলের কপালে হাত দেবার আগেই বললেন, "চোখ দেখেই অবস্থা বোঝা যাচ্ছে। সেই আগের মতোই একশো দুই জ্বর রয়েছে। আমি চান করে এসে থারমোমিটার দিয়ে দেখব। ওষুধও খাওয়াব। উঠবে না একদম। শুয়ে থাকবে।"

গোগোল তখন অবাক। মা ঘরে ঢোকামাত্র শব্দটা বন্ধ হয়ে গেছে। ও কিছু বলতে পারল না। মা যেমনি বেরিয়ে গেলেন, আবার শব্দটা শোনা গেল। কিন্তু শব্দ কি কেবল এ-ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে? মা বা বঙ্কিমদার কানে কি শব্দ যাচ্ছে না? কয়েকমিনিট অপেক্ষা করে গোগোল উঠে বসল। খাট থেকে আস্তে আস্তে নামল। বুঝতে পারছে, ফ্ল্যাটের বাইরে যাওয়া হবে না। বঙ্কিমদা টের পাবে। একটা হই চই লেগে যাবে। ও আবার বাবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। টেলিফোনের রিসিভার তুলে একটা নাম্বার ডায়াল করল। সঙ্গে সঙ্গে ওপার থেকে একজন ভদ্রলোকের মোটা গম্ভীর স্বর ভেসে এল, "ইয়েস।"

"আমি বাতায়নী বিলডিং-এর বাহান্ন নম্বর ফ্ল্যাট থেকে বলছি।" গোগোল বলল।

ওপার থেকে ভদ্রলোক মোটা গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "কে কথা বলছেন আপনি? কোনও মহিলা?"

"না। আমি গোগোল বলছি।"

"তোমার গলার স্বরটা এ রকম নাকি-নাকি শোনাচ্ছে কেন?"

"আমার জ্বর হয়েছে।"

"কী দরকার বলো।"

গোগোল ঘটনাটা বলল। ওপার থেকে মোটা গম্ভীর স্বর ভেসে এল, "জ্বরের ঘোরে এসব শুনছ। ঠিক আছে। যাও শুয়ে থাকো গে। ওসব শব্দ নিয়ে তোমাকে জ্বর-গায়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না।"

গোগোল বুঝল, কিছুই হবে না। ও রিসিভার নামিয়ে রেখে টলতে টলতে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

গোগোল ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমোবার আগে, ও সেই শব্দ শুনেছিল। ঘুমটা ভাঙল প্রচণ্ড জোরে একটা শব্দ শুনে। শব্দটা ওর মাথার ওপরেই হয়েছে। তারপরেই ওদের কলিংবেল বেজে উঠল। আর ওপরেও তখন ধুপধাপ অনেক শব্দ শোনা যাচ্ছে। ও শুয়ে শুয়েই শুনল, বাইরের ঘরে অনেকের গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। তার মধ্যে টেলিফোনে-শোনা সেই গম্ভীর স্বরও। তিনি তখন জিজ্ঞেস করছেন, "কই কোথায় গোগোল? ওর কাছে আমাকে নিয়ে চলুন।"

মা'র সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন ইউনিফর্ম-পরা একজন পুলিশ অফিসার। বেশ দশাসই তাঁর

চেহারা। গোগোল তাঁকে চেনে। ওদের লোকাল থানার অফিসার ইনচার্জ। তিনি তাড়াতাড়ি খাটের কাছে এসে গোগোলের কপালে হাত দিলেন। বললেন, "ও যে ঘামছে! মিসেস চ্যাটার্জি দেখুন তো জ্বরটা কি ছাড়ছে?"

মা এসে দেখলেন, গোগোল সত্যি ঘামছে। শিয়রের কাছে রাখা তোয়ালে দিয়ে গোগোলের জামার ভেতরে মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন, "এর মধ্যে তুমি আবার কী ঘটিয়েছ?"

"ঘটিয়েছে খুব মোক্ষম ঘটনাই।" থানার ও-সি বললেন, "আপনারা শুনতে পাননি, আপনাদের মাথার ওপরের ফ্ল্যাটে চুপচাপ মস্ত ডাকাতি হয়ে যাচ্ছিল। একটা স্টিলের আলমারিকে পেট কাটার মতো, মাঝখান থেকে কেটে ফাঁক করে ফেলেছে। ভেতরে রয়েছে সোনার গহনা নগদ টাকা। আরও অনেক কিছু। গোগোল জ্বরের ঘোরে যেটুকু শুনেছে, তাই আমাকে টেলিফোনে জানিয়ে দিয়েছে। জ্বরের ঘোরে হলেও, গোগোলের কানে যখন ঢুকেছে তখন আমি তো ছাড়তে পারিনি। খুব সময়মতো এসে পড়েছিলুম যা হোক।"

গোগোলের বুকের মধ্যে তখন ধকধক করছে। জিজ্ঞেস করল, "মা, আমি একটু উঠে বসব?"

"বোসো।" মা নিজেই গোগোলকে উঠে বসতে সাহায্য করলেন।

ঘরের মধ্যে তখন অন্যান্য ফ্ল্যাটের অনেক মহিলা, পুরুষ এসেছেন, ও-সি তাঁর টুপি খুলে বললেন," গোগোল জ্বরের ঘোরে তুমি আজ মস্ত বড় ডাকাতি ধরিয়ে দিয়েছ। তুমি সন্দেহ না করলে, কিছু ধরা পড়ত না। দাও, তোমার হাত দাও।"

গোগোল হাত বাড়াবার আগেই ও-সি তাঁর মস্ত বড় হাত বাড়িয়ে গোগোলের হাত ধরলেন, বললেন, "এবার তোমার জ্বর সেরে যাবে। পরে আবার আসব। এখন ডাকাত-মহাশয়দের একটা হিল্লে করি।"

গোগোলের দিকে সবাই অবাক মুগ্ধ চোখে তাকিয়েছিলেন, গোগোল মায়ের কাঁধের কাছে মুখটা গুঁজে দিল। মা ওর মাথায় হাত দিলেন। জানালা দিয়ে তখন বিকেলের রোদ ঘরের মেঝেয় এসে পড়েছে।

মৃত্যু রহস্যময়

•ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়•

অমন সুন্দর চেহারা সচরাচর চোখে পড়ে না। ঘাড় অব্দি লটকানো চুল। টানা টানা চোখ। আর টকটকে ফর্সা গায়ের রঙ। ঠিক যেন চাপা ফুলের পাপড়ির মতো। বয়সও খুব বেশি নয়। ষোলো থেকে আঠারোর মধ্যে। একেবারে গৌরাঙ্গ অবতার যাকে বলে ঠিক তাই। অথচ এই রকম একটি রূপবান ছেলের হাতে হাতকড়া দিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ফৌজদারি কোর্টে। তার অপরাধ? একটি অষ্ট ধাতুর মূর্তি চুরি এবং বাড়ির গৃহিনীকে খুন। ভাবতেও অবাক লাগে এই রকম একটি ফুটফুটে তাজা কিশোর খুন করেছে বলে। যার বাইরের রূপ অমন নির্মল। জ্যোছনার মতো তার ভেতরে ঐ রকম পাশব প্রবৃত্তি কি করে জাগে?

ব্যাপারটা আমার মনকে বেশ নাড়া দিল। আমার এক উকিল বন্ধুর কাছে একটি বিশেষ কাজে হাওড়া কোর্টে গিয়েছিলাম। সেখানেই দেখলাম দৃশ্যটা। উকিল বন্ধু বললেন—আমরা ও রকম কত দেখছি ভাই। তুমি দেখো। আসলে লোভ অমনিই জিনিস যে লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ করতে পারে না এ জগতে এমন কিছুই নেই।

উকিলবন্ধুর কথায় কিন্তু আমার মন ভরল না। তাই ওর বিচার দেখতে গেলাম।

আমার মনের মধ্যে যা হচ্ছিল ছেলেটির মুখ দিয়েও বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তাই ব্যক্ত হল। ছেলেটি আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে বললো—না না না। আমি খুন করিনি। আর ঐ মূর্তি? আমি ওর নিত্য সেবা করি। ও মূর্তি চুরি করে আমার লাভ? তাছাড়া করবই বা কেন?

বিচারক জিজ্ঞেস করলেন—তুমি যদি সত্যি এ কাজ না করে থাকো তাহলে অনুমান করতে পারো কে করেছে বা করতে পারে?

তা কি করে জানব হুজুর, তবে আপনি বিশ্বাস করুন ও কাজ আমি করিনি।

কিন্তু পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট বলছে হেমপ্রভা দেবীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এবং সেই অস্ত্রের হাতলে তোমার হাতের ছাপ। শুধু তাই নয়, বাড়ির মালিক সুধাকান্ত-বাবুও তোমাকেই সন্দেহ করছেন। এর পরও তুমি বলবে তুমি খুন করনি?

ছেলেটি এবারও কেঁদে কেঁদেই বলল—হ্যাঁ, এর পরেও আমি বলব আমি খুন করিনি? আমি চুরি করিনি। কে করেছে তাও জানি না। আমি সন্ধ্যের সময় শীতল আরতি করব বলে ঠাকুর ঘরে গিয়ে দেখি মূর্তি নেই। আর মা ঠাকরুণ ঘরের মেঝেয় মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ঘর। মা ঠাকুরুণের বুকের মাঝখানে একটা ছোরা গাঁথা। আমি নিজের হাতে সেটা বুক থেকে তুলে নিই। আর ঠিক সেসময়ই বাবু বাইরে থেকে বেরিয়ে এসে ঠাকুর ঘরে প্রণাম করতে গিয়ে ঐ দৃশ্য দেখেই অজ্ঞান হয়ে যান। তারপর তো থানা পুলিশ অনেক কিছুই হ'ল! পুলিশ আমার কোন কথাই বিশ্বাস করল না। আমাকে ধরে নিয়ে আটকে রাখল।

শুনানি সেদিনের মতো মুলতুবি রেখে জজ সাহেব উঠে চলে গেলেন।

আমি আমার মনোযোগ ছেলেটির প্রতি আরো বেশি করে নিবদ্ধ করলাম। ছেলেটির মুখ দেখে বা তার বক্তব্য শুনে আমার দৃঢ় প্রত্যয় হ'ল যে ছেলেটি নির্দোষ। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম ছেলেটি যদি সত্যিই নির্দোষ হয় তাহলে যে ভাবেই হোক বাঁচাব তাকে আর সেই সঙ্গে আমি নিজে পূর্ণ তদন্ত করে আসল ঘুঘুকে খাঁচায় পুরে লটকে দেব ফাঁসির দড়িতে।

সে রাতে অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলাম ছেলেটার কথা। ওর সরলতায় ভরা মুখখানি বার বার ভাসতে লাগল চোখের সামনে।

আইনের চোখে ও হয়তো নাবালক। কিন্তু শিশু ও কিশোরদের মনস্তত্ব নিয়ে বিচার করতে গিয়ে আমি যেটুকু জেনেছি তাতে একেবারে বেওয়ারিশ রাস্তায় ছেলে ছাড়া এই বয়সের কিশোরদের মধ্যে বড় একটা খুন করার প্রবণতা জাগে না। এক্ষেত্রেও ছেলেটি বার বার বলছে সে খুনি নয়। এবং এই অপরাধ সে করেনি। ছেলেটি সত্যিই যদি খুনি না হয় তাহলে তাকে বাঁচানো মানুষ হিসাবে আমার এটা পবিত্র কর্তব্য নয় কি?

আমি সরকারি গোয়েন্দা নই। প্রাইভেট ডিটেকটিভ। কোথাও কোন রহস্যের গন্ধ পেলে ছুটে যাই। এবং সাধ্যমতো জট ছাড়াবার চেষ্টা করি। ঈশ্বরের কৃপায় এখনো পর্যন্ত ব্যর্থ হয়নি আমি। তাই এই ছেলেটির ব্যাপারেও আশা করি সফল হতে পারবো।

আমার উকিল বন্ধু রণেন্দুশেখরকে বলেছি যেভাবেই হোক ছেলেটিকে জামিনে ছাড়িয়ে আনতে হবে। পুলিশকেও ফোনে অনুরোধ করেছি এই ব্যাপারে তাঁরাও যেন আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেন।

ছেলেটির সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে যা জেনেছি তা হ'ল, ছেলেটি নিরাশ্রয় এবং পিতৃমাতৃ-হীন। বর্তমানে সুধাকান্ত রায় নামে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে থাকত। তাঁর অন্নে প্রতিপালিত

হোত। কোচবিহারের মহারাজার দেওয়া অষ্টধাতুর মূর্তির সেবা-পূজো করত ছেলেটি। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে ঐ অষ্টধাতুর মূর্তিটি চুরি করে এবং চুরির জন্যই খুন করে বাড়ির গৃহিনীকে। যদিও মূর্তিটি ছেলেটির কাছ থেকে পাওয়া যায় নি।

রাত এখন দশটা। আজ আর কোন রকম পড়াশুনায় মন বসাতে পারলাম না।

ঘরের কোণে কেরোসিন জনতায় ভাত ফুটছে। দুটো ডিম ছিল। একই সঙ্গে সিদ্ধ হতে দিয়েছি। খেয়ে শুয়ে পড়া যাবে।

ছেলেটির পক্ষেও কোন আইনজীবি নেই যে তা নয়। সরকারি উকিল একজন যিনি আছেন ওকে রক্ষা করার ব্যাপারে তাঁরও কোন আগ্রহ নেই। নেহাত দাঁড়াতে হয় তাই দাঁড়িয়েছেন। এখন একমাত্র আমি যদি এই জটিল রহস্যের জট খুলে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারি তো বাঁচে ছেলেটি।

এমন সময়…ক্রিরিরিরিরিং…ক্রি…।

আমি উঠে গিয়ে ফোন ধরলাম। রিসিভার কানে লাগিয়ে বললাম—হ্যাল্লো! অম্বর চ্যাটার্জী স্পিকিং।

আমি রণেন্দ্র বলছি।

হ্যাঁ বলো। কি খবর? জানতে পারলে কিছু?

তার আগে বলো কেসটা কি তুমি সত্যিই নিচ্ছ?

প্লিজ। এর মধ্যে আর কোন কিন্তু রেখো না। ওর ব্যাপারে তদন্তটা আমিই করব। পুলিশকেও আমি সে কথাটা জানিয়ে দিয়েছি। আর উকিল হিসেবে ওর হয়ে তোমাকেই দাঁড়াতে হবে। তুমি 'না' কোরো না।

ব্যাপার কি বলতো? হঠাৎ তুমি ছেলেটির প্রতি এত সদয় হয়ে উঠলে কেন?

তা জানি না ভাই। তবে সত্যিকথা বলতে কি ছেলেটিকে দেখে আমার খুব মায়া হচ্ছে। আর বিশ্বাস করো ওর ঐ অসহায় অবস্থা এবং চোখের জল দেখে আমি থাকতে পারছি না। তাছাড়া কেন জানি না আমার মন বার বার বলছে ছেলেটি খুনি নয়। ও চুরি করেনি।

আমি কালই ওকে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু ছেলেটাকে তুমি রাখবে কোথায়?

কেন আমার বাড়িতেই।

তোমার বাড়িতে? তুমি কি জান ছেলেটি যদি সত্যিই খুনি হয় তাহলে ও যখন বুঝবে গোয়েন্দা হয়ে তুমি ওর খুনের তদন্ত করছ তখন হয়তো তোমাকেই খুন করে বসবে। তার চেয়ে আমি বলি কি ও পুলিশের হেফাজতেই থাকুক। তুমি বরং ওর সঙ্গে দেখা করে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে তোমার তদন্ত চালাও। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় অমন কাঁচা কাজ করতে যেও না। এই বলে রণেন্দ্র ওর ফোন নামিয়ে রাখলো।

আমিও ঠিক কি যে করব তা ভেবে পেলাম না। ও একজন বুদ্ধিজীবি মানুষ। কথা যা বললো তা মিথ্যে নয়। কে বলতে পারে যে ছেলেটির ঐ অসামান্য রূপের ভেতরেও একটা কদর্য

রূপ নেই ? ছেলেটি তো সত্যিই খুন করে থাকতে পারে। বিশেষ করে ওর যখন কেউ কোথাও নেই তখন ওর কাছে আমার এই মোড়িগ্রামের ঘরখানিও যা কয়েদখানাও তাই।

আমি আর দেরি করলাম না। গরম ভাতে ঘি আর ডিম সিদ্ধ দিয়ে খেয়ে নিলাম। তারপর ঠিক কোন কোন পদ্ধতিতে এই কেসটা নিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করব সে বিষয়ে ভাবতে ভাবতে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে যখন আমি পুলিশ হেফাজতে ছেলেটির সঙ্গে দেখা করব বলে গেলাম তখন ওখানকার ভারপ্রাপ্ত অফিসার রহমন সাহেব আমার সঙ্গে খুবই ভদ্র ব্যবহার করলেন।

রহমন সাহেব এখানে নতুন এসেছেন। কিন্তু মানুষটি খুব ভালো। বললেন— আমারও মশাই মায়া হচ্ছে ছেলেটিকে দেখে। তবে কিনা এই সব ক্রিমিনালদের ধরণ ধারণ যে কত রকমের হয় তা বোঝা মুশকিল। মনে করুন ঘরের ভেতর কেউ নেই। শুধু এই ছেলেটি এবং হেমপ্রভা দেবী ছাড়া। বহুমূল্য একটি অষ্টধাতুর মূর্তি উধাও এবং সেই সঙ্গে গৃহকর্ত্রী খুন। ছোরার হাতলে ছেলেটির হাতের ছাপ। তার ওপর ছেলেটি ওদের অনাত্মীয়। যদিও ভয় দেখিয়ে বা মারধোর করে কোন রকমে ওর মুখ থেকে কোন কথা আমরা বার করতে পারিনি তবুও ছেলেটি নিরপরাধ এমন কোন প্রমাণও আমরা পাইনি। অতএব বাধ্য হয়েই সন্দেহভাজন হিসেবে ওকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। এবং বিচারকের কাছে নিয়ে গেছি। সবচেয়ে আশ্চর্য ঐ বাড়ির যিনি মালিক অর্থাৎ সুধাকান্তবাবু পর্যন্ত ওর ব্যাপারে হ্যাঁ না কিছু বলছেন না।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। উনি কেবলই বলছেন আপনারা যা ভালো বোঝেন তাই করুন। আমার কি রকম সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

আচ্ছা, এমন কি হতে পারে না, সুধাকান্তবাবু নিজেই খুন করেছেন স্ত্রীকে ?

হতে পারে। তবে বর্তমানে বয়সের ভারে উনি এত বেশি অক্ষম হয়ে পড়েছেন যে এখন আর তাঁকে সন্দেহ করা যায় না।

উনি কি চলা ফেরা করতে পারেন না ?

সব পারেন। লাঠি ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামা ওঠাও করেন। পার্কে গিয়ে বসেন। তবুও বড় দুর্বল।

আমি এ ব্যাপারে ছেলেটির সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

বেশ তো বলুন।

আমি উঠে গিয়ে গরাদের ফাঁক দিয়ে ছেলেটিকে দেখলাম। এক কোণে বসে বসে কাঁদছিল ছেলেটি।

গরাদের তালা খুলে ওকে বার করে আনতেই ছেলেটি আমার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল। তারপর কেঁদে বলল—আমাকে বাঁচান। আপনি বিশ্বাস করুন, আমি চুরি করিনি। আমি খুন

করিনি। বিনা দোষে আমার জেল হবে, ফাঁসি হবে। আমাকে সবাই বলছে আপনি নাকি আমাকে রক্ষা করবেন বলে এগিয়ে এসেছেন।

সবাই কারা ?

এই তো পুলিশরা। এরা বলছে যে লোক তোর হয়ে দাঁড়িয়েছে তোর আর ভয় নেই। এবার তুই ছাড়া পাবি।

ওরা ঠিকই বলছে। আমি দাঁড়াচ্ছি তোমার জন্যে। কিন্তু বাবা আমি যা-জিজ্ঞেস করব তার ঠিক মতো উত্তর যদি দাও তো সহজেই বেরিয়ে আসতে পারবে। নাহলে আমারও কিছু করবার থাকবে না। কেননা পুলিশই বলো আর গোয়েন্দাই বলো আমরা তো আইনের উর্ধে নই। আগে বলো তোমার নাম কি ?

আমার নাম রাখহরি চক্রবর্তী।

রাখহরি! এ নাম তো তোমাকে মানায় না। এ তো চাকর বাকরদের নাম। তোমার নাম হওয়া উচিত ছিল রাধামোহন, গৌরাঙ্গসুন্দর এই রকম।

ছেলেটি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো—কি করব বলুন, মা বাবা আদর করে যে নাম রেখেছেন তাই রয়েছে। শুনেছি আমার দু'তিন দাদা জন্মাবার পরই মারা যান বলে আমার নাম হয়েছে রাখহরি। হরি আমাকে রক্ষা করেছেন।

হরি এবারও তোমাকে রক্ষা করবেন যদি তুমি সত্যি কথা বলো বা নির্দোষ হও।

আমি নির্দোষ।

তোমার মা বাবা বেঁচে আছেন ?

না। আমি যখন খুব ছোট তখনই মারা যান তাঁরা। এক বছরের মধ্যে মা বাবা দুজনেই।

তাঁদের কারো কথা মনে পড়ে তোমার ?

মায়ের কথা আমার আজও মনে পড়ে। কী সুন্দর দেখতে ছিল আমার মাকে। দুধে আলতায় গোলা গায়ের রঙ। আমরা খুব গরীব ছিলুম। সেজন্যে পেট ভরে খেতে দিতে পারতেন না বলে আমাকে বুকে নিয়ে কত কাঁদতেন আমার মা।

যাক বাবার কথা তাহলে মনে পড়ে না তোমার ?

খুব আবছা। কেননা বাবা তো বর্ধমানে কাজ করতেন। মাঝে মাঝে বাড়ি আসতেন।

দেশ কোথায় তোমার ?

আমাদের দেশ জৌগ্রাম। সেখানে অবশ্য কিছুই নেই এখন। কেউ কোথাও নেই।

হুঁ। সুধাকান্তবাবুর সঙ্গে তোমার পরিচয় কি করে হলো ? কি ভাবে তুমি ওনার বাড়িতে এলে ?

আমার জেরার উত্তরে ওর মুখ থেকে যা শুনলাম তা হ'ল এই—

রাখহরি যখন সাত বছর বয়স তখন ওর বাবা মারা যান। আট বছর বয়সে মা। তারপর থেকে এর ওর বাড়িতে মানুষ ও। বাবা মা'র কৃপাতেই গ্রামের পাঠশালায় বর্ণ-পরিচয় যা হবার তা

হয়েছিল। তারপর বছর তিনেক কেটে যাবার পর এগারো বছর বয়সে ওর গ্রাম সুবাদে এক কাকা ওকে কলকাতায় নিয়ে আসেন এবং কালীঘাটে পৈতে দিয়ে এক ঠাকুর বাড়িতে রেখে যান। সুধাকান্তবাবু সেখান থেকেই আবিস্কার করেন ওকে। ওর ফুট ফুটে চেহারা এবং ঢল ঢল নিষ্পাপ মুখখানি দেখে অপুত্রক সুধাকান্তবাবু এবং তাঁর স্ত্রী ওকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে এসে ছেলের মতো আদর যত্নে রেখে দেন। সুধাকান্তবাবুর স্ত্রী হেমপ্রভা দেবী তাঁর বহুমূল্য অষ্ট ধাতুর বিগ্রহের সেবা পুজোর দায়িত্ব রাখহরিকেই দেন। রাখহরিও নিষ্ঠার সঙ্গে তার কাজ করতে থাকে। সুধাকান্তবাবুরা রাখহরি সৎ-চরিত্রের নিদর্শন পেয়ে এবং তার আনুগত্যে বিগলিত হয়ে ঠিকই করেছিলেন তাকে তাঁরা আইনগতভাবে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করবেন এবং তাদের বিষয় সম্পত্তি সব কিছু তাকেই দিয়ে যাবেন। বিনিময়ে রাখহরি ওদের দুজনকে মা বাবা বলে ডাকবে এবং তাঁদের মৃত্যুর পর ছেলের কাজ করবে। অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদিকৃত্য ইত্যাদি। কিন্তু হঠাৎ কিছুদিন আগে সুধাকান্তবাবুর এক ভাগনা পাটনা থেকে এসে সব কিছু গোলমাল করে দিল। সে এসে প্রায় মাসখানেক এই বাড়িতে বসে রইল। এবং রাখহরিকে তাড়িয়ে দিয়ে যাতে তাকে এখানে রেখে দেওয়া হয় এইরকম আবদারও ধরল। শুধু তাই নয়, এও বলল যে এইসব অজ্ঞাতকুলশীল ছেলেরা কখনো পোষ মানে না। এবং সুযোগ পেলেই এরা গৃহস্থের বুকে ছুরি মেরে পালায়। যাই হোক, হেমপ্রভা দেবী এবং সুধাকান্তবাবু দুজনেই তাকে সহ্য করতে পারতেন না। কারণ তার চাল চলন কথাবার্তা ছিল লোফারদের মতো। একদিন হেমপ্রভা দেবী খুব যা তা করে অপমান করলেন তাকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিরে যেতে বললেন। ভাগ্নাবাবুটি বিদায় নিল। তবে যাবার আগে রাখহরিকে শাসিয়ে গেল সে যদি এক মাসের মধ্যে সেচ্ছায় এই বাড়ি থেকে চলে না যায় তাহলে তার কপালে নাকি অনেক দুঃখ আছে।

আমি ধৈর্য ধরে রাখহরির সব কথা শুনছিলাম এতক্ষণ। এইবার তাকে প্রশ্ন করলাম— সুধাকান্তবাবুর সেই ভাগ্নেবাবুর নাম কি?

ভালো নাম জানি না। তবে ওকে রাজা বলে ডাকা হোত। ওর নাম রাজা রায়।

রাজা রায় এই বাড়ি থেকে বিদায় নেবার কতদিন পরে খুনটা হয়েছে?

তা ধরুণ চার পাঁচ দিনের মাথায়।

আচ্ছা, এই খুনের ব্যাপারে তুমি কি কাউকে সন্দেহ করো?

কাকে করব বলুন? রাজাবাবু থাকলে ওকেই সন্দেহ করতাম। কেননা ওর যা চাল চলন তাতে একাজ করা ওর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়।

তা এই খুনের মামলায় সুধাকান্তবাবু তোমাকেই বা অভিযুক্ত করলেন কেন?

সেটা আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। মা ঠাকরুণ খুব ভোরে উঠে পুজোর আয়োজন করতেন। আমিও সাতটা নাগাদ পুজো শেষ করে পড়তে যেতাম। তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে চলে যেতাম স্কুলে। ফিরতাম বিকেল বেলা। তারপর একটু ঘুরে বেড়িয়ে এসে সন্ধ্যেবেলা শীতল দিয়ে আবার পড়াশুনা করতে বসতাম। এই ভাবেই দিন চলছিল। এরই মাঝে রাজাবাবু এলেন।

তবে রাজাবাবু চলে যাবার পর বাবু যেন কি রকম হয়ে গেলেন। সেদিন সন্ধ্যেবেলা আমি যখন ঠাকুর ঘরে শীতল দেবো বলে গেছি তখন দরজা খুলে আলো জেবলেই দেখি, সর্বনাশ। চারিদিক রক্তে ভেসে যাচ্ছে। আর মা ঠাকরুণ মেঝেতে পড়ে আছেন। তাঁর বুকে একটা ধারালো ছোরা গাঁথা আছে। আমি ছুটে গিয়ে সেই ছোরাটা বুক থেকে যখন টেনে তুললাম তখন মা-ঠাকরুণ মরে গেছেন। আর ঠিক সেই সময়ই বাবুও বাইরে থেকে এসে পড়লেন। এসে আমার হাতে ছোরা ও মা ঠাকরুণের ঐ অবস্থা দেখে চিৎকার করে উঠলেন। তারপর জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। বাবুর চিৎকারে লোকজন সব হৈ হৈ করে ছুটে এলো। তারপর থানা পুলিশ অনেক কিছুই গড়াল। আমিও অ্যারেস্ট হলাম।

সবই তো বুঝলাম। শুধু বুঝতে পারছি না সুধাকান্তবাবু তোমাকেই বা সন্দেহ করছেন কেন? ঠিক আছে। তুমি নির্ভয়ে থাকো। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব তোমাকে বাঁচাবার। বলে রাখহরির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের বাসায় চলে এলাম।

হাওড়া শহরের উপকণ্ঠে সুধাকান্তবাবুর বাড়ির সামনে যখন এসে পৌঁছলাম বেলা তখন দশটা। সাবেক কালের বনেদী বাড়ী। কড়ি বরগা দেওয়া ঘর। পাঁচিল ঘেরা বাগান। পুকুর। এক পাশে ঠাকুর ঘর। ঘরের দরজায় শিকল দেওয়া। সুধাকান্তবাবু দোতলায় থাকেন।

আমি যেতেই এক ঘোমটা টানা মহিলা বললেন, কাকে চাই?

সুধাকান্তবাবু আছেন?

হ্যাঁ। ওপরে যান।

আমি ওপরে ওঠার আগে থেমে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে মা?

আমি এ বাড়ির ঝি।

অ। কতদিন কাজ করছ এখানে?

তা ধরুন না বছর দশেক।

আচ্ছা মা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি তোমায়, এখানে রাখহরি নামে যে ছেলেটি থাকত সে ছেলেটি কি রকম? শুনলুম সে নাকি খুনের দায়ে—।

তা কি করে বলব বলুন? এমনি তো খুব ভালো। কিন্তু তার মনে যে এই ছিল তা কি কেউ জানত? ঘরের ছেলের মতোই ছিল। হঠাৎ কি যে মতিচ্ছন্ন হ'ল।

হুঁ। তোমার ঘরের কে কে আছে?

আমার একটি ছেলে ছাড়া কেউ নেই বাবা।

আচ্ছা, রাজাবাবু নামে কাউকে চেনো তুমি?

কেন চিনবুনি? বাবুর ভাগ্নে তো। সে কিন্তু ঠিক কথাই বলেছিল। পরের ছেলেকে এইভাবে ঘরে ঢুকিও না। একদিন খুন করে পালাবে। ঠিক তাই হ'ল।

আমি মহিলাকে বেশ ভালো করে এক নজর দেখে নিয়ে বললাম, তুমি কোথায় থাকো?

ঐ তো। ঐ আমার ঘর। ঐ যে টিনের চালাটা দেখা যাচ্ছে। আপনি কে বাবু?

আমি তোমাদের বাবুর একজন বন্ধু।

আমি দোতলায় উঠলাম।

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বারান্দার গায়ে প্রথম যে ঘরটা সেই ঘরের খাটে একটি পরিস্কার বিছানায় শুয়ে ছিলেন সুধাকান্তবাবু। আর বেশ গাঁট্টা গোট্টা গোছের ছাব্বিশ সাতাশ বছর বয়সের একটি ছেলে খুব যত্ন করে তাঁর পা টিপে দিচ্ছিল।

আমি যেতেই ছেলেটি বলল, বাবু, কে এসেছেন।

কে?

আপনি আমাকে চিনবেন না। আমার নাম অম্বর চ্যাটার্জী। আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

অ। তাই নাকি? আসুন আসুন। আসতে আজ্ঞা হোক। ওরে ভোলা! বাবুকে বসতে জায়গা দে।

ভোলা আমাকে একটা চেয়ার এনে দিল।

আমি চেয়ারে বসে বললাম, তুমি কে?

আজ্ঞে আমি বাবুকে একটু দেখাশোনা করি। আমার মা এ বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে।

একটু আগে যে মহিলাকে নীচে নেমে যেতে দেখলাম উনিই কি তোমার মা?

হ্যাঁ।

আমি এবার সুধাকান্তবাবুকে বললাম—আচ্ছা, আপনার বাড়িতে রাখহরি নামে যে ছেলেটি থাকত আপনার কি ধারণা ঐ ছেলেটিই আপনার স্ত্রীকে খুন করেছে?

দেখুন, রাখহরি আমাদের ছেলের মতন হয়ে গিয়েছিল। কাজেই কোন কিছুর লোভে ও যে আমার স্ত্রীকে খুন করবে এ হতে পারে না।

অথচ পুলিশকে আপনি অন্য কথা বলেছেন?

মোটেই না। পুলিশকে আমি কোন কথাই বলিনি। সেদিন ঐ দৃশ্য দেখার পর আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর জ্ঞান যখন ফিরল তখন দেখলাম আমার ঘর পুলিশে ভর্তি। আমার তখন উঠে বসারও ক্ষমতা নেই। ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করল আমি কি দেখেছি। তা যা দেখেছি তাই বললাম। ওরা তখন একটা কাগজে কি সব লিখে আমাকে সই করতে বলল। আমি করলাম। পরে শুনলাম রাখহরিকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে।

ও। এই ব্যাপার। আচ্ছা এবারে বলুন তো ঐ মূর্তি চুরির ব্যাপারে আপনি কাউকে সন্দেহ করেন কিনা?

কাকে করব? তবে রাখহরি নেয় নি। ও নিতে পারে না।

আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম—ছেলেটির ওপর আপনার এত ভাল ধারণা থাকা সত্বেও ওকে যে জেল খাটানোর ব্যবস্থা হচ্ছে সে ব্যাপারে আপনি নীরব কেন?

কী করতে পারি বলুন ? এখন আমার উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। তার ওপর পুলিশ ওকেই সন্দেহ করছে। ছোরার হাতলে ওর হাতের ছাপ আছে। তা পুলিশ যা করা তাই করুক।

সে কি! ছোরার হাতলে হাতের ছাপ আছে বলেই ছেলেটি অপরাধী হয়ে যাবে ? ও তো আপনার স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্যে ওটাকে টেনে তুলতেও পারে ? তাছাড়া আপনি তো নিজেই বলছেন এ মূর্তি ও চুরি করতে পারে না। ঘটনায় এও জানা যাচ্ছে খুনের অপরাধে রাখহরিকে যখন ধরা হয়েছিল তখন মূর্তি তার কাছে ছিল না। অর্থাৎ এটা বেশ পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে চোর মূর্তি চুরি করে পালাতে যাবার সময় আপনার স্ত্রীর দ্বারা বাধা পায় এবং নিরুপায় হয়েই আপনার স্ত্রীকে খুন করে পালায়।

আপনার অনুমানই ঠিক। আমিও কিন্তু মনে মনে ঐ রকমই চিন্তা করছি।

আমি হেসে বললাম—আপনার ভাগ্নাবাবুর খবর কি ?

সে তো চলে গেছে।

আপনার কি মনে হয় না এই খুনের পিছনে তারও কোন হাত থাকতে পারে ?

সুধাকান্তবাবু বললেন—তার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই তো সে সেই পাটনা থেকে এখানে এসে সামান্য একটু বিষয় সম্পত্তির লোভে আমার স্ত্রীকে খুন করবে—কী যে বলেন মশাই। এ কোন ছিঁচকে চোরের কাজ।

আমি আর এই ব্যাপারে কোন জিজ্ঞাসাবাদ না করে মোটামুটিভাবে একটা খসড়া তৈরী করে তাইতে সই করালাম সুধাকান্তবাবুকে। খসড়ার বিষয়বস্তু হ'ল এই যে রাখহরির প্রতি সুধাকান্তবাবুর কোন রকম সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে তিনি যে স্টেটমেণ্টে সই করেছেন তা না জেনে। এই চুরি ও হত্যাকাণ্ড বহিরাগত কারো দ্বারাই সম্ভব।

সুধাকান্তবাবুর কাছ থেকে আমি রাজা রায়ের ঠিকানা নিয়ে সেদিনের মতো ফিরে এলাম সেখান থেকে।

দিন কয়েকের মধ্যেই রাজা রায়কে অ্যারেস্ট করে কলকাতায় নিয়ে আসা হল। বেশ সুদর্শন চেহারা। তবে একটু লোফার ও মস্তান প্রকৃতির। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের পর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা রাজাবাবু, সুধাকান্তবাবু আপনার কে হন ?

মামা।

হুঁ। আপনি কিছুদিন আগে এখানে এসে মামা মামীর সঙ্গে খুব ঝগড়া করে গিয়েছিলেন ?

হ্যাঁ। কারণ আমাকে আমার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছিল। আমি থাকতে অন্য একটি ছেলেকে এ বাড়িতে রেখে মানুষ করে তার হাতে সব কিছু তুলে দেবার দরকার কি ? তাহলে কেন আমি ঝামেলা করব না বলুন ? কেন আমি আমার অধিকার ছেড়ে দেবো ? আর এ

সবই হচ্ছিল আমার মামার যোগসাজসে।

কিন্তু আপনাকে বঞ্চিত করার কারণটা কি?

তা কি করে জানব? তবে মামী আমাকে একদম সহ্য করতে পারতেন না। আসলে ইনি তো মামার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। এই বিয়ে নিয়ে আমার মায়ের সঙ্গে মামার প্রচণ্ড ঝগড়া হয়। তারপর থেকে প্রায় বছর দশেক মুখ দেখাদেখি ছিল না। কিন্তু যখন শুনলাম ওরা অন্য একজনকে পোষ্যপুত্র নিয়ে সব কিছু লিখে দেবার মতলব করছে তখন আমি এখানে এসে হুজ্জোতি করি।

এবং পরে এখান থেকে অষ্ট ধাতুর মূর্তিটা হাতিয়ে নিয়ে মামীর বুকে ছুরি মেরে কেটে পড়েন, এই তো? দু'এক দিন আশপাশে গা ঢাকা দিয়ে থেকে কাজটা করেন। যাতে দোষটা পরের ছেলের ঘাড়েই চেপে যায়, কি বলুন?

এসব কি বাজে কথা বলছেন আপনি?

ঠিকই বলছি। সুধাকান্তবাবুর স্ত্রীকে আপনিই খুন করেছেন। রাখহরির বদলে আপনাকেই ফাঁসির দড়িতে ঝোলানো হবে। আর সেই সঙ্গে সুধাকান্তবাবুকেও বুড়ো বয়সে বেশ কিছুদিন জেলের ঘানি টানাব। সম্পূর্ণ ন্যাকা সেজে একটি নিরীহ ছেলের ক্ষতি হচ্ছে জেনেও বুড়ো ভাম হয়ে বসে থাকার মজা দেখাচ্ছি আমি।

সে যা করবেন করুন। তবে আমার নামে মিথ্যে বদনাম দেবার চেষ্টা করবেন না। আমি খুন করিনি। চুরিও করিনি। ঐ রাখহরি ছেলেটাই আমার ঘাড়ে দোষ চাপাবার জন্য এই সব করছে।

আমি এখন রাজাবাবুকে না ঘাঁটিয়ে আবার রাখহরির কাছে গেলাম। রাখহরি আমার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে বলল—কী! কিছু হল? আমাকে ছাড়িয়ে আনার কোন ব্যবস্থা করতে পারলেন?

আমি হেসে বললাম—ব্যবস্থা হচ্ছে। তাছাড়া ছাড়া পেয়েই বা তুমি করবে কি? যাবে কোথায়? মা ঠাকরুণ তো নেই। সুধাকান্তবাবুও নিশ্চয়ই তোমাকে বাড়িতে ঢোকাবেন না। থাকবে কোথায়?

ফুটপাথে থাকব। মোট বইব। তবু একটা স্বাধীন জীবন আমার চাই।

আচ্ছা রাখহরি, তোমার মা ঠাকরুণের সঙ্গে বাবুর সম্পর্ক কি রকম ছিল? মানে, কোন ঝগড়াঝাঁটি হোত কি?

না। বরং মা ঠাকরুণকে নিয়ে বাবুর খুব চিন্তা ছিল তাঁর অবর্তমানে মা ঠাকরুণের কি হবে? তিনি কি একা সব কিছু সামলাতে পারবেন?

আচ্ছা ঐ বাড়িতে যে ভোলার মা কাজ করে সে কি রকম?

কেন, ভালোই তো। ওর ছেলেটাও ভালো। বড় গরীব ওরা।

আচ্ছা তোমার মা ঠাকরুণকে সুধাকান্তবাবু কোন কারণে খুন করতে পারেন না?

অসম্ভব। আমি যখন ঘরে ঢুকে মা ঠাকরুণকে ঐ অবস্থায় দেখে তাঁর বুক থেকে ছোরা

টেনে বার করি, বাবু তখন সবে মাত্র বাইরে থেকে এসেছেন। এই সময় রোজই উনি ঠাকুর প্রণাম করেন, ওপরে যান। তা ঐ দৃশ্য দেখেই তিনি যে ভাবে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেলেন তাতে ওনার পক্ষে এ কাজ করা কোন মতেই সম্ভব নয়। বিশেষ করে এই বয়সে উনি কিসের স্বার্থে এ কাজ করতে যাবেন বলুন ?

আচ্ছা এমনও তো হতে পারে রাজাবাবুই এখানে কাছে পিঠে কোথাও দু' একদিন লুকিয়ে থেকে ঐ কাজ করে তারপর পাটনায় চলে যায় ?

হতে পারে। তবে এ ব্যাপারে হ্যাঁ না কিছুই আমি বলতে পারব না আপনাকে।

জিজ্ঞাসাবাদ যতই চলছে অবস্থা ততই ঘোরালো হয়ে উঠছে। রাজাবাবু, সুধাকান্তবাবু এবং রাখহরির মধ্যে কে যে আসল অপরাধী তা কে জানে ? তবে সুধাকান্তবাবু মানষটি বড়ই রহস্যময়।

সে রাত্রিটা এক ভয়ংকর উত্তেজনার মধ্যে কাটল আমার। মনে মনে যত রকম ছক তৈরী করি সবই কি রকম এলোমেলো আর অসার বলে মনে হয়। রাজা রায় যে যুক্তি দেখিয়েছে তা নেহাৎ ফেলে দেবার মতো নয়। আপাতঃ দৃষ্টিতে রাখহরিকে নির্দোষ বলেই মনে হয়। আর সুধাকান্তবাবু কি ওই বয়সে নিজের স্ত্রীকে এইভাবে হত্যা করবেন ! এ হতে পারে না। বিশেষ করে ঐ দৃশ্য দেখার পর যে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায় তাঁকে সন্দেহ করারও কোন অবকাশ নেই।

সবচেয়ে রহস্যময় ব্যাপার হ'ল মূর্তিটা গেল কোথায় ? এই অঞ্চলে বহু অনুসন্ধান করেও ঐ অষ্টধাতু মূর্তির কোন হদিশ পাওয়া যায় নি। মূর্তিটা হয় এখানেই লুকোন আছে, কোথাও নয় তো স্থানান্তরে বহুদূরে চলে গেছে।

পরদিন সকালে রহমন সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে এবং কিছু পুলিশ সহ সুধাকান্তবাবুর বাড়ি, বাগান, পুকুর তল্লাসী করতে চললাম। মেন গেট বন্ধ ছিল। অনেক ডেকেও সাড়া না পেয়ে পিছন দিকে গিয়ে বাগানের পাঁচিলের ভাঙা অংশটা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। কিন্তু ভেতরে ঢুকে যা দেখলাম তাতে শিউরে উঠলাম। বারান্দার নীচে মাটিতে ঘাসের ওপর সুধাকান্তবাবু উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। মুখের কাছে নাকের কাছে চাপ চাপ রক্ত। না খুন নয়। খুব সম্ভবতঃ বারান্দার রেলিংএ কোন কারণে ভর দিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে গেছেন। সুধাকান্তবাবুর এই মর্মান্তিক পরিণতি সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।

যাক। পুলিশ গোটা ঘর তল্লাসী করেও কিছুই পেল না।

ভোলা বা ভোলার মা কারো পাত্তা নেই।

রহমন সাহেবের চার্জে সব কিছু রেখে একজন কনস্টেবলকে নিয়ে ভোলাদের বাড়ি গেলাম।

আমাকে দেখেই এবং সঙ্গে পুলিশ দেখে আঁতকে উঠল ওরা।

আমি ভোলার মাকে বললাম—কী ব্যাপার ! এখনো কাজে যাওনি যে ?

ভোলার মা ফ্যাকাশে মুখে ম্লান হেসে বলল, আমি একটু দেরি করেই ও বাড়িতে যাই।

কিন্তু আপনারা কোন দিক দিয়ে এখানে এলেন বাবু ?

মেন গেট বন্ধ। তাই পিছন দিক দিয়ে এলাম। কিন্তু সুধাকান্তবাবুকে ঘরে দেখতে না পেয়ে এখানে এলাম আমরা। কোথায় উনি ?

ভোলার মা চমকে উঠল—সেকি ! উনি ঘরে নেই ?

না। তুমি ওবাড়িতে কাজ করো। তোমার ছেলেও ওনার দেখা শোনা করে অথচ মানুষটা যে বাড়িতে নেই একথা তোমরা জান না ? তাছাড়া সেদিন যখন বেলা দশটা নাগাদ আমি এখানে এসেছিলাম তুমি তখন কাজ করে ফিরে আসছিলে। আর আজ বেলা দশটা বেজে গেল এখন তুমি কাজে গেলে না কেন ? তারপর ভোলাকে বললাম—তা বাবা ভোলানাথ, সেদিন সকালে গিয়ে তো দেখলাম দিব্যি বসে বসে বাবুর পদ সেবা করছিলে। আজ এখনো এখানে যে ? ব্যাপারটা কি ?

ভোলা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল—বিশ্বাস করুন বাবু, কাল সারা রাত খুব পেটের যন্ত্রণা হয়েছে। বিছানা থেকে একদম উঠতে পারিনি। এই এখনই যাব ভাবছিলাম।

তা এত বেলা হল, তুমি যে সকাল থেকে যেতে পার না সে কথা তোমার মাও একবার গিয়ে বাবুকে বলে আসার দরকার মনে করল না ? তাহলেই তো টের পেতে মানুষটা আছেন কি নেই।

ভোলার মা বলল—বাবু, সত্যিকথা বলতে কি আমরা গরীব লোক। কাল ছেলেটার খুব শরীর খারাপ ছিল। তাই ও রাত্রেও শুতে যেতে পারেনি। আমি বাবুকে রাত্রিবেলা খাইয়ে দাইয়ে সেকথা বলে এসেছিলাম। কিন্তু আজ সকালে বাবুকে দেখতে গিয়ে দেখি—

বাবু বারান্দার রেলিং ভেঙে নীচে পড়ে গিয়ে মারা গেছেন, এই তো ?

হ্যাঁ।

আর সেই ভয়ে পাছে বাইরের লোক কেউ এসে দেখে ফেলে তাই মেন গেট বন্ধ করে মা ব্যাটায় ঘরে ঢুকে বসে আছ। কেউ যেন টের না পায়। বলিহারী বুদ্ধি।

হ্যাঁ বাবু।

তা বাবা ভোলানাথ, তোমাকে যে এবার থানায় যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। ওঠো।

ভোলা হাউ মাউ করে কেঁদে উঠে দাঁড়াতেই বললাম—একি ! তোমার পায়ে এত পানা লেগে কেন ?

ও কিছু নয় বাবু। কাল সন্ধ্যেবেলা পুকুরে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম।

আমার মনের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকের মতো এক ঝলক সন্দেহ উঁকি দিল। বললাম—এই, কোথায় ? কোন পুকুরে মাছ ধরতে গিয়েছিলে ? আমায় একটু দেখাবে চল তো।

ভোলা বলল—চলুন।

আমি ভোলাকে সঙ্গে নিয়ে পুকুর পাড়ে এলাম।

এবার বলো কোনদিকে তুমি মাছ ধরেছিলে ?

ভোলা তখন একটা জায়গা দেখিয়ে দিল।

আমি ভালো জায়গাটা লক্ষ্য করে বললাম —না। তুমি ঠিক বলছ না। এখানে তুমি আসনি। এখানকার ভিজে মাটিতে কাদায় তোমার পায়ের কোন ছাপ দেখছি না।

ভোলা তখন ন্যাকা সাজার ভান করে বলল, তাহলে কোন দিক দিয়ে এসেছিলাম কে জানে।

তোমাকে আর জানতে হবে না। আমিই জেনে নিচ্ছি। বলে আমার সঙ্গের কনস্টেবলকে বললাম—লোকটাকে একটু নজরে রাখো তো। মনে হচ্ছে বেশ রীতিমতো গোলমাল আছে। লক আপে পুরে রহমন সাহেবকে দিয়ে বেশটি করে ঘা কতক দেওয়ালেই সব কথা বেরিয়ে যাবে ওর মুখ থেকে।

ভোলার মুখে আর কথাটি নেই।

মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে ওর মুখ।

আমি তখন তন্ন তন্ন করে চারিদিক খুঁজলাম। খুঁজতে খুঁজতে একদিকে আবিস্কার করলাম পুকুরে নামার অনুপযুক্ত এই জায়গাটা দিয়ে কেউ নেমেছে উঠেছে। সেই পথ ধরে আমিও নিচে নেমে গেলাম। দেখলাম এক জায়গায় পুকুরের নরম মাটি কাদায় পায়ের গভীর ছাপ। আর পুকুরের এক কোণে লম্বালম্বিভাবে একটি কঞ্চি পোঁতা আছে। জলের মতই পরিষ্কার। কোন কিছু লুকনো আছে ওখানে।

আমি ধীরে ধীরে ওপরে উঠে এসে ভোলার বুকে পিস্তল তাগ করে বললাম—ওখানে কি লুকিয়ে রেখেছিস বল?

কি-কি-কিছুই রাখিনি বাবু।

ঠিক করে বল। নাহলে তোর বাঁচার কোন রাস্তা নেই।

ভোলা মাথা হেঁট করে বলল—ওখানে মা ঠাকরুণের গয়নাগুলো একটা বাক্সয় করে রাখা আছে।

হু, গয়না তুই পেলি কোথায়?

কাল রাতে বাবু ঘুমিয়ে পড়লে আমি বালিশের তলা থেকে চাবি বার করে সিন্দুক খুলে মা ঠাকরুণের সমস্ত গয়না চুরি করে নিই। তারপর সব নিয়ে যখন পালাতে যাই বাবু তখন জেগে ওঠেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলো নিভিয়ে দিই। উনি তখন চোর চোর বলে চেঁচিয়ে যেই না ঘর থেকে বেরতে যাবেন আমি অমনি বাবুকে ধাক্কা দিয়ে পালাতে যাই। আর সেই ধাক্কায় বাবু টাল সামলাতে না পেরে বারান্দার রেলিং টপকে মুখ থুবড়ে পড়ে যান। অমনি হয়ে যায় ঐ বিপজ্জনক কাণ্ড। নাহলে সত্যি বলছি বাবু বিশ্বাস করুন খুন করবার মতলব নিয়ে কিছু আমি করিনি।

তা না হয় হ'ল। এইবার বল তো বাবা অষ্টধাতুর মূর্তিটাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস?

ওটার ব্যাপারে আমি কিছু জানি না, বিশ্বাস করুন।

রহমন সাহেব যে কখন কথার ফাঁকে আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তা লক্ষ্য করিনি। হঠাৎ রাগের মাথায় ভোলার তলপেটে একটা লাথি কসিয়ে বললেন—বল শিগগির।

লাথি খেয়ে ককিয়ে উঠল ভোলা। দু'হাতে পেট ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল—আমি জানি

না বাবু, বিশ্বাস করুন। সত্যি বলছি, আমি জানি না।

বিশ্বাস করছি, দাঁড়া। বলেই রহমন সাহেব বললেন—এই, আমার রুলটা নিয়ে আয় তো গাড়ি থেকে। বেশ করে ঘা কতক দিই। না দিলে মুখ খুলবে না।

ভোলার মা কাছে পিঠেই কোথাও ছিল বোধ হয়। ছুটে এসে রহমন সাহেবের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বলল—ও না বলুক আমি বলছি বাবা। দয়া করে ওকে মেরো না। মূর্তি'টা আসলে রাজাবাবুর কাছে আছে।

রাজাবাবুর কাছে? সেকি!

হ্যাঁ বাবু, রাজাবাবু যেদিন পাটনা চলে গেলেন তার পরদিনই আমাদের এখানে এসে হাজির।

তারপর?

আমি অবাক হয়ে বললাম—একি রাজাবাবু! আপনি বাড়ি যান নি?

রাজাবাবু বললেন—না। তবে আমি যে এখানে এসেছি তা যেন কেও জানতে না পারে। বলেই আমার হাতে একশোটা টাকা দিয়ে বললেন যে ভাবেই হোক ঠাকুর ঘর থেকে অষ্টধাতুর মূর্তি'টা এনে দিতে। কেননা রাখহরিকে মিথ্যে মামলায় না জড়ালে বা ওর প্রতি মামা মামীর মন বিরূপ করতে না পারলে এই সম্পত্তি তার হবে না রাজাবাবুর মতলব ছিল মূর্তি চুরির পর এটা নিয়ে যখন খুব হৈ চৈ হবে সেই সময় মূর্তি'টা লুকিয়ে রাখহরির ঘরে কোথাও লুকিয়ে রেখে পুলিশকে খবর দেওয়া। আমি প্রথমে রাজি হইনি বাবু। রাজাবাবু তখন আমাকে অনেক লোভ দেখালেন। বললেন, রাজাবাবু যদি এই সম্পত্তির মালিক হন তাহলে আমাদের আর কোন অভাব রাখবেন না। আমার ভোলাকে সব সময় তাঁর কাছে কাছে রাখবেন। এবং মাস গেলে মোটা টাকা মাইনে দেবেন!

সেই লোভে সুধাকান্তবাবুর স্ত্রীকে খুন করে ঐ মূর্তি তুমি রাজাবাবুর হাতে তুলে দিয়েছিলে তাই না!

না। আমি খুন করিনি বাবু। সেদিন সন্ধ্যেবেলা ঠাকুর ঘর মোছবার অছিলায় চাবি খুলে ঘরে ঢুকে যেই না মূর্তি'র গায়ে হাত দিয়েছি অমনি দেখি মা-ঠাকরুণ কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছেন।

আচ্ছা, সন্ধ্যেবেলা কেন? তুমি তো মূর্তি চুরি করতে রাত্রিবেলাও আসতে পারতে।

রাত্রিবেলা কি করে আসব বাবু। চাবি যে ঠাকরুণের কাছে থাকত। আমি সন্ধ্যেবেলা চাবি খুলে ঘর মুছতাম। আর মা ঠাকরুণ আরতির ব্যবস্থা করে দিতেন। তারপর রাখহরি ঠাকুরের শীতল দিয়ে চলে গেলে মা নিজে হাতে তালা দিয়ে চলে যেতেন। কাজেই ঐ সময়টাই ছিল মূর্তি চুরির আসল সময়।

তারপর কি হল বল।

হ্যাঁ, মা ঠাকরুণ তো আমাকে দেখেই অবাক হয়ে বললেন, একি সরলা তুই! একি করছিস? ঠাকুর তুলছিস কেন? ভয়ে আমার হাত থেকে তখন মূর্তিটা পড়ে যায় আর কি? আর ঠিক সেই সময়ই কে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার হাত থেকে মূর্তি'টা ছিনিয়ে নিল। আমি কিছু বুঝে ওঠার

আগেই দেখি মা-ঠাকরুণ মেঝেয় পড়ে কাতরাচ্ছেন। তাঁর বুকে ছুরি গাঁথা। চেয়ে দেখি দরজার পাশে রাজাবাবু। আমাকে বললেন, হাঁ করে দেখছিস কি? শিগগির পালা। একথা কাউকে বললি না। তাহলে তোদের মা ব্যাটা দুজনকেই পুঁতে ফেলব।

আমরা অবাক বিস্ময়ে সব কিছু শুনলাম।

ভোলার মা এবার গড় গড় করে বলে চলল—রাজাবাবু বড় সাংঘাতিক লোক বাবু। তাই ভয়ে আমরা মুখ খুলিনি। বিনা দোষে রাখহরিকে পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেল, তাও চোখে চেয়ে দেখলাম। বাবুও দু' তিন দিন অজ্ঞান অচৈতন্যর মতো পড়েছিলেন। তারপর জ্ঞান হলে একদিন বললেন, দেখ ভোলার মা! আমার কি মনে হয় জানিস? রাখহরি তোর মা-ঠাকরুণকে খুন করেনি। এ ঠিক ঐ শয়তানটার কাজ। রাজাই ওকে খুন করেছে। অথচ আমার দিদির ঐ একটিই মাত্র ছেলে। যদি ধরিয়ে দিই তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। দিদি আমার বাঁচবে না। বুড়ো বয়সে হার্টফেল করবে। জামাইবাবু বেঁচে নেই। ঐ ছেলেটিই দিদির সব। তবে যাক। আমার সম্পত্তির ভাগ ওকে আমি দিচ্ছি না। যে কটা দিন বেঁচে আছি তোরা যদি আমার দেখা শোনা করিস তো তোদের নামেই লিখে দিয়ে যাব। তবে মুখে সে কথা বললেও কাগজে কলমে বাবু কিছু করে যাননি অবশ্য করে গেলেও ঐ সম্পত্তির উপর আমাদের খুব একটা লোভ ছিল না। কারণ ঐ সম্পত্তি ভোগ করলে রাজাবাবু আমাদের ছাড়ত না। তাই আমরা মা ব্যাটাতে যুক্তি করে মা ঠাকরুণের গয়নাগুলো চুরি করেছিলাম! ভেবেছিলাম! একদিন চুপি চুপি এখান থেকে পালিয়ে যাব।

আমি বললাম—থাক। এবারে যা কিছু বলবার থানায় গিয়ে বলবে। তোমাদের কথা গুলো ওখানে টেপ করা দরকার। চলো সব।

একজন কনস্টেবল পুকুর থেকে মা-ঠাকুরুণের গয়নগুলো উদ্ধার করে আনলে পুলিশ ভোলা ও ভোলার মাকে থানায় নিয়ে গেল।

মর্গ থেকে লোক এলো সুধাকান্তবাবুর মৃতদেহ ময়না তদন্তে নিয়ে যাবার জন্যে। আমিও আর দেরি না করে সোজা আমার উকিল বন্ধু রণেন্দু শেখরের বাড়ি চলে এলাম।

আমি সেইদিনই রাখহরিকে জামিনে খালাস করলাম! তারপর পরম আদরে তাকে নিয়ে এলাম আমার মৌড়ি গ্রামের বাড়িতে। অনেক দিন ধরে মনে মনে এই রকম একটি ছেলেকেই খুঁজছিলাম আমি। এতদিনে পেলাম, রাখহরিও আমার বাড়িতে নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে দারুণ খুশি হল। আদালতের বিচারে রাখহরি বেকসুর খালাস পেলেও বিচারক ভোলা ও ভোলার মায়ের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং রাজা রায়ের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিলেন।

অনেকদিন বাদে ছোটমামাকে আসতে দেখে মা খুশি হয়ে উঠলেন। বললেন, "আয়, বিরু, বোস। চা খাবি তো? মোচার চপ করেছি।"

একগাল হেসে ছোটমামা বললেন, "তা হলে তো ঠিক দিনেই এসেছি দেখা যাচ্ছে। তা তোমরা ভাল তো, ছোড়দি? জামাইবাবু বুঝি ফেরেননি অফিস থেকে?" তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, "বুলি, তোর খবর কী? পিণ্টু কোথায়?"

"কোথায় আবার।" বিরক্ত সুরে জবাব দিলেন মা, "ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। স্কুল থেকে ফিরেই যে বেরিয়েছে আর পাত্তা নেই। পারেও বাবা..."

আমি বললাম, "বিশ্বকর্মা পুজো আসছে যে। এখন তো সবাই ঘুড়ি ওড়াবে।"

ছোটমামা বললেন, "ঘুড়ি ওড়ানোকে অত অশ্রদ্ধার চোখে দেখো না ছোড়দি! কখনও কখনও ঘুড়ি ওড়াতে জানাটা কাজে এসে যায়। যেমন আমার একবার হয়েছিল..."

গল্পের গন্ধ পেয়ে আমি লাফিয়ে উঠলাম, "বলো না ছোটমামা, কবে, কোথায়..."

"বলছি, আগে চা আন তো দেখি।"

অবশ্য ছোটমামা এলে যে চা আনতে হবে সেটা জানা কথা। তাই ওঁর আওয়াজ শুনে জলের কেটলি গ্যাস-স্টোভে চাপিয়েই এসেছিলাম। এবার ছুটলাম চা করতে।

মোচার চপ সহযোগে চা খাওয়া শেষ করে ছোটমামা গল্প শুরু করলেন। ততক্ষণে পিন্টুও এসে গেছে।

"বুঝলি বুলি" ছোটমামা শুরু করলেন, "এটা আমার আমেদাবাদ বাসের গোড়ার দিকের কথা। কোম্পানির সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় চায়ের এজেন্সিটা ছেড়ে দিয়েছি। অর্থাৎ বেকার। তবে আমেদাবাদটা কলকাতা নয়, তক্কেতক্কে থাকলে কাজ ঠিকই জুটে যায়। আমারও জুটে গেল। একজন শেঠ, অর্থাৎ বড় বিজনেসম্যানের হেড অফিসের ক্যাশবই লেজার এসব লেখার কাজ। কাজটা

অবশ্য টেম্পোরারি, কিন্তু তার জন্য আমি পিছপা হলাম না। দশটা-পাঁচটা এক জায়গায় বসে খাতা লেখার চাকরিকে পার্মানেন্ট করতে কে চায়। মাসখানেক চাকরি করার পরই বুঝতে পারলাম যে, শেঠ আমার প্রতি খুব সন্তুষ্ট। খাতা লেখা ছাড়াও বিজনেসের অনেক ব্যাপারেই আমার পরামর্শ নিতে লাগলেন। আর মাসের শেষে মাস-মাইনে ছাড়াও খানকয়েক দশ টাকার নোট হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'বিরুভাই, এটা তোমার বোনাস।'

"এর কিছুদিন পর নজর করলাম যে শেঠকে কেমন মনমরা দেখাচ্ছে। চিন্তিতও। একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করে ফেললাম কারণটা।

"বুঝলে বিরুভাই" বললেন শেঠ, 'খুব মুশকিলে পড়েছি। কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছি যে, আমার কাপড়ের মিলের নতুন ডিজাইনগুলো অন্য মিলে পাচার হয়ে যাচ্ছে। আমাদের কাপড় বাজারে বেরোবার আগেই অন্য মিল থেকে সেই ডিজাইনের কাপড় বাজারে বেরিয়ে যাচ্ছে। বুঝতেই পারছ, তাতে আমাদের কাপড়ের চাহিদাও আর ততটা হচ্ছে না।'

'আপনাদের ডিজাইন অন্য মিলে পাচার হয়ে যাচ্ছে!' অবাক হলাম, আমি। 'কী করে। ডিজাইন ডিপার্টমেন্টের চার্জ তো আপনার জামাই নবীন পারেখের ওপর। তবে কি আপনাদের আর্টিস্টই ডিজাইনের কপি অন্য মিলে…'

"না হে না। এই আর্টিস্ট অনেকদিন ধরে আমাদের এখানে ডিজাইন সাপ্লাই করে। ওকে খুব ভাল করে চিনি আমি।'

"তা হ'ল? ডিজাইন ডিপার্টমেন্টের চার্জ যখন আপনার জামাইয়ের ওপর…'

"হ্যাঁ, নতুন ডিজাইন আর্টিস্টের কাছ থেকে এসে নবীনের কাছেই থাকে। মুশকিল তো ওখানেই।'

"কীরকম?"

"আমার যদ্দুর মনে হয়, নবীনই এসব ডিজাইন অন্য মিলে দিচ্ছে।'

"তা হলে ওকে চেপে ধরুন না কেন?'

"চেপে যে ধরব, প্রমাণ কই? হাজার হোক জামাই, প্রমাণ ছাড়া কোনও অ্যাকশন নিতে পারব না। তবে ও কোথায় যায়, কার সঙ্গে মেশে সব-কিছু আমার নখদর্পণে। কিন্তু কোথায়, কীভাবে কার সঙ্গে যোগাযোগ করছে ও সেটা বুঝতে পারছি না। আমার কথা শুনে অবশ্য আমার মেয়েও চোখ রাখছে, যাতে নবীন অন্য মিলের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারে।'

"মিঃ পারেখ তো চিঠির মারফত ডিজাইন পাচার করতে পারেন, কিংবা টেলিফোন করে কারও সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তারপর…'

"সম্ভব নয়। ওর চিঠিপত্রের ওপর কড়া নজর রাখছি আমি। সবাইকে বলা আছে যাতে ওর লেখা কোনও চিঠিই আমাকে না দেখিয়ে পোস্ট না করা হয়। আর টেলিফোন? অফিসের টেলিফোনের ডিটেলস তো আমি অপারেটারের কাছ থেকে পেয়ে যাই। বাড়িতে টেলিফোনে প্যারালাল কানেকশান। কাজেই ও টেলিফোন করলে বা কেউ ওর কাছে ফোন করলে আমার শোবার

ঘরের ফোন তুলে শুনতে পারি সেটা। কিন্তু বুঝতে পারছি না নবীন কেন এমন করছে ?'

"বুঝলি বুলি, আমি অবশ্য শেঠকে বলতে পারতাম কারণটা। উনি আমাকে বোনাস দিলেও সাধারণভাবে বেশ কঞ্জুষ। নবীন পারেখ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। শ্বশুরের আশ্রিত। আর এই শেঠের ধারণা সাধারণ ঘরের ছেলেরা হাতে টাকা পেলেই বেমক্কা ফুর্তিতে সব উড়িয়ে দেয়। তাই নবীন পারেখের বাড়ি গাড়ি দামি জামা-কাপড় আছে বটে, কিন্তু হাতে নগদ খুব কম। ডিজাইন ডিপার্টমেণ্টের ইনচার্জের বেতনটা অবিশ্বাস্য রকমের অল্প। তবে এসব কথা শুনতে শেঠের ভাল লাগবে না, তাই কিছু বললাম না আর।

"এর প্রায় দিন পনেরো পরে শেঠ আবার আমায় একান্তে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'বিরুভাই, তোমার বুদ্ধির ওপর আমার আস্থা আছে। নবীনের ওপর একটু চোখ রাখবে ক'টা দিন ? আমাকে হয়তো বাইরে যেতে হতে পারে।'

"কোনও বিশেষ কারণ ঘটেছে কী ?"

"হ্যাঁ। আজই আমাদের আর্টিস্টের কাছ থেকে একগাদা নতুন ডিজাইন এসেছে।"

"একটু চিন্তা করে বললাম, 'মিঃ পারেখ বসেন দোতলায় আর আমি একতলায়। নজরটা রাখব কী করে ? অবশ্য আপনি যদি ওঁর ঘরেরই এক কোণে আমার বসার জায়গা করে দেন তো হয়…"

"কিন্তু তা কী করে হবে ? ও রাজি হবে কেন ?"

"ওঁকে বলুন না কেন, আমার ওপর নজর রাখতেই এই ব্যবস্থা করেছেন আপনি।"

"ব্যাপারটা বুঝতে এক মিনিট সময় নিলেন শেঠ। তারপর আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'ব্র্যাভো, মাথাটা তোমার সত্যিই পরিষ্কার।"

"চলে আসছি, শেঠ ডেকে বললেন, 'বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম। পরশু মকর-সংক্রান্তি। আমার বাড়ি এসো। বিকেলের দিকে ঘুড়ি ওড়ানো দেখবে আর সন্ধ্যার পর খাবে পুরি-উন্ধিয়া।'

"বুঝলি পিণ্টু, তোদের যেমন বিশ্বকর্মা পুজোর দিনটা ঘুড়ি ওড়ানোর পরব, গুজরাতি-দের তেমনি মকর-সংক্রান্তি। সেদিন সকাল থেকেই গুজরাতি ছেলে-বুড়ো সবাই ঘুড়ি ওড়ানোতে মেতে ওঠে। সন্ধ্যের পর খাওয়া-দাওয়া হয়। বিশেষ করে পুরি-উন্ধিয়া।"

মা বললেন, "লুচিকে বোধহয় ওরা পুরি বলে ? কিন্তু উন্ধিয়াটা আবার কী ?"

ছোটমামা বললেন, "রেসিপিটা ঠিক বলতে পারব না। তবে সব তরকারি মিশিয়ে তৈরি। খেতে ফাইন।"

আমি বললাম, "ছোটমামা. তোমাকে রান্নার রেসিপি দিতে হবে না। তারপর কী হল বলো।"

"ব্যস্ত হোসনে বুলি। বলছি তো। হ্যাঁ, মকর-সংক্রান্তির দিনে, দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর খানিক বিশ্রাম করে গেলাম শেঠের বাড়ি। উনি থাকেন পুরনো আমেদাবাদে, যেখানে বসতি যথেষ্ট ঘিঞ্জি। চারতলা বাড়ি ওর। পৌঁছতেই একজন আমায় সোজা নিয়ে গেল ছাতের

ওপর। দেখি শেঠের পরিবারের প্রায় সবাই সেখানে। অনেক বন্ধুবান্ধও আছেন মনে হল।' কম বয়েসী, বেশী বয়েসী সব ছেলেদের হাতেই ঘুড়ি-লাটাই। মেয়েরা এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে গল্পগুজব করছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি শ'য়ে শ'য়ে ঘুড়ি উড়ছে। সে এক দৃশ্য।

"আমি যেতেই আমার হাতে একটা ঘুড়ি-লাটাই ধরিয়ে দিলেন শেঠ।'

"সেই কবে ছোটবেলায় ঘুড়ি উড়িয়েছি। প্রথমটায় ঠিক ম্যানেজ করতে পারছিলাম না। কিন্তু জানিস তো, কোনও কাজেই পিছপা হবার পাত্র নয় বীরেশ্বর। দু' চারজনকে একটু নজর করে দেখেই কায়দা-কানুন রপ্ত করে ফেললাম। ফর্‌ফর্‌ করে আকাশে উড়ল আমার ঘুড়ি। তার আগেই অবশ্য নজরে পড়েছিল নবীন পারেখ একটু একটেরে হয়ে একমনে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। আমাকে ওর দিকে তাকাতে দেখে শেঠ বললেন, 'আমার জামাইয়ের ঘুড়ি ওড়াবার শখ খুব। প্রায় রোজই ওড়াই।'

"আমার ঘুড়ি ততক্ষণে অনেক ওপরে উঠে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বীরবিক্রমে দু দুখানা ঘুড়ি কেটে ফেললাম। কিন্তু জানিস তো বুলি, উত্থান হলেই পতন আছে। এর পরই আমার ঘুড়িখানা কেটে গেল।'

"সত্যিকথা বলতে কী, অনভ্যাসের দরুণ আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে ঘাড়ে ব্যথা করছিল। ভাবলাম ঘুড়ি যে ওড়াতে পারি, সেটা তো প্রমাণ হয়েই গেছে, একটু আয়েস করা যাক এখন। আলসেতে হেলান দিয়ে অন্যের ঘুড়ি ওড়ানো দেখতে লাগলাম, আর তখনই নজর করলাম ব্যাপারটা।'

"নবীন পারেখ ঘুড়ি ওড়াচ্ছে বটে, কিন্তু নিজের ঘুড়ি সযত্নে বাঁচিয়ে। অন্য ঘুড়ি কাটারও ওর কোনও যেন আগ্রহ নেই। শুধু পাশের বাড়ির ছাদ থেকে উড়ছে সবুজ ঘুড়ি, ওই ঘুড়ি দেখলেই নবীনের ঘুড়ি ঝাঁপিয়ে পড়ছে ওর ওপর। আর সেই সবুজ ঘুড়িও যেন কচুকাটা হতে গলা বাড়িয়েই আছে। হাওয়ার গতি এ-বাড়ির দিকেই, ছাদটাও বিরাট, তাই নবীনের কাটা-ঘুড়ি উড়তে উড়তে প্রায়ই এ-বাড়ির ছাতে এসে পড়ছে এবং নবীন পারেখ ঝাঁপিয়ে পড়ে কাটা ঘুড়িটা ঢুকিয়ে রাখছে একখানা সুটকেসে। আরও লক্ষ্য করলাম, পাশের বাড়ির ছাত থেকে উড়ছে ওই সবুজ-রঙা ঘুড়িই। আর ওই লোকটাও নিজের ঘুড়িটা অন্য ঘুড়ির থেকে সরিয়ে এনে নবীনের ঘুড়ির দিকেই বাড়িয়ে দিচ্ছে। যেন লোকটা চায় শুধু নবীনই ওর ঘুড়ি কাটুক। অথচ নবীনের ঘুড়ি কাটার জন্যে ওর তরফ থেকে কোনও চেষ্টাই নেই।

"এর মানে কী, মনে হল একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।

"এর পর আমি কী করলাম জানিস? নতুন একটা ঘুড়ি নিয়ে আবার শুরু করলাম ওড়াতে। ইচ্ছে ওই সবুজ ঘুড়ি একটা কাটব, বার-দুই বিফল চেষ্টার পর তৃতীয়বার সফল হলাম আমি ও একটা সবুজ ঘুড়ি কেটে ফেললাম। কপালগুণে কাটা-ঘুড়িটা উড়তে উড়তে আমার পায়ের কাছেই এসে পড়ল।

"নিচু হয়ে ঘুড়িটা ওঠালাম। উঠে দাঁড়াতেই দেখি নবীন পারেখ। ও বলল, 'ঘুড়িটা আমাকে দেবেন কাইন্ডলি।'

"হেসে বললাম, 'ঘুড়ি কাটলাম আমি, আর নেবেন আপনি? আর দেখলাম তো এই সবুজ-রঙা ঘুড়ি অনেক কেটেছেন আপনি। আর যত্ন করে কাটা-ঘুড়ি সুটকেসে তুলে রাখছেন, ব্যাপারটা কী বলুন তো?"

"একটু আমতা আমতা করে নবীন পারেখ বলল, 'ওই লোকটার সঙ্গে প্রায়ই আমার ঘুড়ি কাটাকাটি হয় তো। তাই আর কি কাটা-ঘুড়িগুলো রেখে দিচ্ছি, দেখি ক'টা কাটতে পারি।"

"'রেকর্ড' করবেন বুঝি? তা হলে তো আপনাকে ঘুড়িখানা দিয়ে দিতেই হয়।' বলে দিয়ে দিলাম ঘুড়িটা। অবশ্য ততক্ষণে দেখে নিয়েছি যে, সবুজ ঘুড়িটার লেজের দিকটার দু'ধারে সাদা কাটা কাগজ বসিয়ে নকশা করা। কিন্তু ফুলপাতার নকশার মধ্যে সাজানো রয়েছে একটা গুজরাতি অক্ষর, 'নি'। তবে কি সবগুলো ঘুড়িতেই কোনও না কোনও অক্ষর আছে? কেন?

"নিজে আর ঘুড়ি ওড়ালাম না। দেখতে লাগলাম। তবে নজর রাখলাম নবীনের ওপর।

"অবশেষে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ঘুড়ি ওড়ানো বন্ধ হল। সবাই কলকল করে কথা বলতে বলতে নীচে নামতে লাগলেন। আমি অবশ্য নবীন পারেখের কাছাকাছিই রইলাম। নীচে নেমেই ওকে বললাম, 'মিঃ পারেখ আপনার সবুজ ঘুড়ির কালেকশনটা একটু দেখতে চাই।'

"নবীন পারেখ ভুরু কুঁচকে বললে, 'ঘুড়িতে দেখার কী আছে, সবই তো প্রায় একই রকম।'

"শেঠ কাছাকাছিই ছিলেন। এগিয়ে এসে বললেন, 'মনে হচ্ছে, বিরুভাই তোমার মতোই ঘুড়িতে ইন্টারেস্টেড। দেখাও না, ক্ষতি কী।"

"অগত্যা নবীন পারেখ আমাকে নিয়ে পাশের একটা ঘরে ঢুকল।"

"সুটকেস খুলে ঘুড়িগুলো বার করলে দেখলাম, সবগুলিতেই নীচের দিকে সাদা কাগজ দিয়ে নকশা করা ও নকশার মাঝখানে বসানো এক-একটা গুজরাতি অক্ষর। কিছু অক্ষর একাধিক ঘুড়িতে রয়েছে। সব কাটা ঘুড়ি যদি নবীনের হাতে না আসে তার জন্যই কি এই বাড়তি ব্যবস্থা? কিন্তু অক্ষরগুলো কী করে ঢোকা যায়?

"জানিস তো বুলি, তোদের ছোটমামার কাছে কোনও প্রবলেমই বেশিক্ষণ প্রবলেম থাকে না। চট করে নবীন পারেখের দিকে ফিরে বললাম, 'ঘুড়ির লেজের দিকে চমৎকার নকশা দেখছি। একটু টুকে নিয়ে যেতে চাই। কলকাতা গিয়ে বিশ্বকর্মা পুজোয় এরকম ঘুড়ি তৈরি করাব। একটু কাগজ-পেন্সিল দিতে পারেন?' অবশ্য অনুরোধ করার আগে চারপাশ দেখে নিয়েছিলাম যে, অন্তত সে-ঘরে কোনও কাগজ-পেন্সিল দেখা যাচ্ছে না।

"নবীন বললে, 'বসুন, আমি নিয়ে আসছি।"

"আসলে কাগজ ও একটা বলপয়েন্ট পেন আমার পকেটেই ছিল। নবীন পারেখ সরে যেতেই আমি চটপট অক্ষরগুলো টুকে নিলাম। একটু পরে নবীন পারেখ ফিরল কাগজ-পেন্সিল

নিয়ে। তখন অবশ্য দু-একটা নকশা টুকতেই হল আমায়।

"এর পর আর উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি সেখানে, অবশ্য খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা বাদ দিলে।

"বাড়ি ফিরেই সেই টোকা অক্ষরগুলো নিয়ে পড়লাম। জানিস তো, 'শব্দ-জব্দ' খেলায় আমার হাত পাকা। খানিকক্ষণ চেষ্টার পরই অক্ষরগুলো ঠিক ভাবে সাজিয়ে ফেললাম। দেখা গেল কিছু বাড়তি অক্ষর বাদ দিলে এই কথাটা তৈরি হয়ে যায় 'রবিবার বিকেল ভাবনির্ঝর।'

"ভাবনির্ঝর শহরের বাইরে একটা সুন্দর বাগানের নাম। নানারকম গাছপালা, ফুল—এসব ছাড়াও ধ্যান করার জন্য মন্দির রয়েছে একটা। ভারী নিরিবিলি ও চমৎকার জায়গাটা। তবে কি রবিবার বিকেলে ভাবনির্ঝরে যেতে নবীনকে সংকেত পাঠাচ্ছে কেউ? ঘুড়ির মারফত অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করা হচ্ছে? কিন্তু লোকটা কে? এই কি সেই লোক, যাকে ডিজাইন পাচার করছে নবীন? তা হলে তো এক্ষুনি কিছু করতে হয়, কারণ পরদিনই তো রবিবার।

"তক্ষুনি বের হয়ে একটা পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করলাম শেঠকে। 'আপনি একটা কাজ দিয়েছিলেন আমায়। সে সম্পর্কেই বলছি। আপনাদের মধ্যে কেউ যদি কাল ভাবনির্ঝরে যান তবে আমাকেও সঙ্গে নেবেন দয়া করে।"

"শেঠ বললেন, 'কী আশ্চর্য', একটু আগেই আমার মেয়ে এসে বলছিল যে, কাল বিকেলে নবীন ভাবনির্ঝরে বেড়াতে যেতে চায়। ঠিক আছে, তোমাকে নিয়ে যাওয়া হবে।"

"আমি বললাম, 'আপনিও আসুন না। ভাল হবে তা হলে।"

"পরদিন দু' গাড়ি বোঝাই করে সবাই গেলাম ভাবনির্ঝরে। দেখা গেল শেঠ শুধু নিজেই আসেননি, ওঁর স্ত্রী এবং ছোট ছেলেমেয়েদেরও নিয়ে এসেছেন। নবীন অবশ্য আমাকে দেখেই ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'আপনি!'

"'ভাবনির্ঝর জায়গাটা ভারী সুন্দর, না?' ভালমানুষের মতো মুখ করে বললাম।

"ভাবনির্ঝরে এসে সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল। লক্ষ্য করলাম নবীন একা একা হাঁটছে। ওর নজরে না পড়ে এভাবে ওর পিছু নিলাম আমি। দেখলাম একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে ও বসে পড়ল। যেন কারও অপেক্ষায়।

"আমি ছুটে শেঠকে ডেকে নিয়ে এসে একটু আড়ালে দাঁড়ালাম।"

"একটু পরেই দেখলাম ছোট ব্রিফকেস হাতে আরেকটি লোক এল নবীনের কাছে এবং দু'জনে নিচু গলায় কী সব কথাবার্তা বলল। তারপর ব্রিফকেস খুলে লোকটি বার করল একতাড়া নোট আর নবীন প্যাণ্টের পকেট থেকে বার করল কিছু কাগজ। দূর থেকেও আমরা বুঝতে পারলাম যে, ওগুলি ট্রেসিং পেপার, যাতে ডিজাইন আঁকা রয়েছে।

"কাগজগুলো দেখেই শেঠ এক লাফে নবীনের কাছে এসে হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, 'নবীন, এটা কী হচ্ছে?"

"আমি সরে এলাম। আত্মীয়দের ব্যাপারে বাইরের লোক না থাকাই ভাল। আর নবীন যখন হাতেনাতেই ধরা পড়েছে তখন আমার আর করবারও কিছু নেই। তাই বলছিলাম ছোড়দি, ঘুড়ি ওড়ানোকে অত অশ্রদ্ধার চোখে দেখো না। আমি ঘুড়ি ওড়াতে না গেলে নবীন পারেখের ব্যাপারটা ধরাই পড়ত না।"

ছোটমামা থামলেন। কিন্তু আমার কিছু প্রশ্ন বাকি। বললাম, "ছোটমামা, শেঠ নবীনকে কোনও শাস্তি দিলেন না?"

"আরে সে এক মজার ব্যাপার। কয়েক দিন বাদে হঠাৎ অফিসে আমার ঘরে এসে হাজির নবীন পারেখ। আমি তো বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেছি। ও কিন্তু সোজা এসেই হ্যাণ্ডশেক করে বলল, "থ্যাঙ্কস বিরুভাই, আপনার গোয়েন্দাগিরি আমার কাছে শাপে বর হয়ে গেছে। শ্বশুরমশাই আমাকে ফ্রান্সে পাঠাচ্ছেন টেক্স্‌টাইল ডিজাইনিং শেখার জন্য। তিন বছরের কোর্স। আমার স্ত্রীও সঙ্গে যাচ্ছে। ফেরার আগে ইউরোপ ঘুরে দেখারও পারমিশন দিয়েছেন।"

মা বললেন, "তুই-ই ধরলি ব্যাপারটা, আর তোকে কিছু দিল না শেঠ?"

ছোটমামা একটা হাই তুলে বললেন, "মাস পেরোলে বড় গোছের বোনাস একটা দিতেন নিশ্চয়ই, কিন্তু ততদিনে দি গ্রেট শিলিগুড়ি টি কোম্পানির সঙ্গে আমার মিটমাট হয়ে গেছে। কাজেই ছেড়ে দিলাম চাকরিটা।"

রবিবার বিকেলে খেলতে বেরিয়েই বাবলু দ্যাখে তার বাড়ির সামনে জগন। চাপা উত্তেজিত স্বরে জগন বলল, "লাহাবাড়িতে একজন বুড়োমত ভদ্রলোক এসেছেন, মনে আছে, আর তাঁর কাজের লোক। আর কেউ এসেছে ওখানে?"

"কই না।" বাবলু জানায়, "আর কাউকে দেখিনি।"

"আমিও দেখিনি। কিন্তু ও-বাড়িতে আর কেউ আছে। আর তা নইলে…," জগন ভুরু কুঁচকে থামে।

"কী ব্যাপার?" বাবলু বিস্মিত।

জগন চট করে জবাব দেয় না। উত্তেজনার কারণটা গুছিয়ে নেয় মনে-মনে। এই ফাঁকে জগন, বাবলু এবং লাহাবাড়ির আগন্তুকদের সঙ্গে পরিচয় সেরে নেওয়া যাক।

জগন ও বাবলু থাকে সুকচরে। গঙ্গার ধারে আধা শহর। কলকাতা থেকে বাসে ঘণ্টাখানেকের পথ। দু'জনে পরম বন্ধু। স্থানীয় স্কুলে ক্লাস টেন-এ পড়ে।

জগনের পাড়ায় লাহাদের বাগানবাড়ি। গঙ্গার তীরে বিঘেখানেক পাঁচিল ঘেরা জমি, ভেতরে নদী ঘেঁসে মাঝারি দোতলা বাড়ি। কম্পাউণ্ডে নানা ফল-ফুলের গাছ। বাড়িটা বছরভর প্রায় ফাঁকাই থাকে। আগে বুড়ো লাহা-কর্তা প্রায়ই আসতেন এখানে। বছর-ছয়েক হল তিনি গত হয়েছেন। এখন লাহা-পরিবারের কেউ বা তাঁদের আত্মীয়বন্ধুরা এখানে বেড়াতে আসন খুব কম এবং এলেও মাত্র কয়েকদিনের জন্য।

লাহারা ধনী ব্যবসায়ী। বাস কলকাতায়। লাহাদের বাগানবাড়িতে কারা আসে যায় এই পাড়ার লোক তফাতে থেকে লক্ষ্য করে বটে, তবে আগন্তুকদের সঙ্গে তাদের আলাপ হয় কদাচিৎ।

লাহাবাড়ির স্থায়ী বাসিন্দা বলতে বৃদ্ধ মালী বংশী আর তার স্ত্রী। তারা থাকে বাগানের এককোণে, কুটিরে।

চারদিন আগে লাহাবাড়ির সামনে একটা প্রাইভেট মোটর এসে থামে। ড্রাইভার বাদে গাড়ীতে ছিল তিনজন আরোহী। স্কুল ছুটি ছিল সেদিন। জগন, বাবলু ও কয়েকজন ছেলে কাছেই ডাঙ্গুলি খেলছিল। ছেলেরা খেলা ছেড়ে গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

গাড়ির পেছনের সিটে বসেছিলেন দুই ভদ্রলোক। দু'জনেই প্রৌঢ়। একজন ফুলপ্যাণ্ট ও ফুলহাতা শার্ট পরা, শ্যামবর্ণ, ছোটখাটো, রোগাটে। পাশের জনের চেহারা দিব্যি শৌখিন ও সুদর্শন। তাঁর রং পরিষ্কার, মাথা-ভর্তি ঢেউখেলানো কাঁচা-পাকা চুল। সমান করে ছাটা আধপাকা মোটা গোঁফ। চোখে রুপোলি সরু গোল্ ফ্রেমের চশমা। ড্রাইভারের পাশের লোকটির চেহারা সাদাসিধে। পরনে শস্তা শার্ট ও ধুতি। তার রং ময়লা। বয়স তিরিশের কোঠায়। মাঝারি লম্বা, গাট্টাগোট্টা।

গাড়ির হর্ন শুনে বংশী হন্তদন্ত হয়ে গেট খুলে দিল। মোটর গেট দিয়ে ঢুকে ইট বাঁধানো সোজা পথ ধরে গিয়ে থামে বসতবাড়ির গায়ে। জগনরা গেটের কাছ থেকে লক্ষ্য করে আরোহীরা গাড়ী থেকে নামল।

পাজামা-পাঞ্জাবি, চটি-পরা শৌখিন লোকটি কয়েক পা হেঁটে লাঠিতে ভর করে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। লোকটি বেশ লম্বা-চওড়া, তবে একটু কুঁজো। ড্রাইভারের পাশে-বসা লোকটি নেমেই গাড়ি থেকে নামায় ট্রাংক, সুটকেস, বিছানা ও দু-তিনটে ব্যাগ। ড্রাইভার বংশী ও সেই লোকটি মালপত্র বয়ে নিয়ে ঢোকে বাড়ির ভেতরে। এর পর প্যাণ্ট পরা লোকটির পিছন পিছন বাড়িতে ঢোকেন শৌখিন ভদ্রলোক।

ঘণ্টাখানেক বাদে ড্রাইভার মোটর নিয়ে ফিরে যায় শুধুমাত্র প্যাণ্ট-শার্ট পরা ভদ্রলোকের সঙ্গে। অর্থাৎ বাকি দু'জন রয়ে গেল। সেই দিনই বংশীর থেকে জগন জেনে নেয় আগন্তুকদের পরিচয়।

লম্বা, সুপুরুষ সেই ভদ্রলোকের নাম কানাইলাল রায়। উনি মাসখানেক এই বাড়িতে থাকবেন। সঙ্গের লোকটি কানাইবাবুর পরিচারক ভূষণ। যে ভদ্রলোক ফিরে গেলেন তাঁর পরিচয় জানে না মালি। তবে আগে একবার ছোট লাহা-কর্তার চিঠি নিয়ে এসে উনি বাড়িটা দেখে গেছেন। রায়মশাইয়ের আসন্ন আগমনের কথা ছিল চিঠিতে। মালি, মালির স্ত্রী ও ভূষণ মিলে রায়বাবুর দেখাশোনা করবে। বংশী ইতিমধ্যেই রায়বাবুর ওপর বেশ সন্তুষ্ট। কারণ তিনি এসেই বংশীকে দশ টাকা বখশিশ দিয়েছেন।

লাহাবাড়ির আগন্তুকদের নিয়ে জগনরা আর মাথা ঘামায়নি। কানাইবাবুকে সকাল-বিকেল দেখা গেল বাড়ির ভেতর আস্তে-আস্তে লাঠি হাতে পায়চারি করছেন। তৃতীয় দিন সকালে তিনি লাহাবাড়ির সামনে রাস্তায় টুকটুক করে খানিক ঘুরে এলেন। তিনি সর্বদা ফিটফাট। গম্ভীর প্রকৃতির। এখানে কারও সঙ্গে মেলামেশায় তাঁর আগ্রহ দেখা যায়নি।

ভূষণ কিন্তু বেজায় আলাপী। সে দু-তিনদিনেই ওই অঞ্চলের সব দোকানপাট চিনে নিল এবং অনেক আড্ডায় ভাব জমিয়ে ফেলল। বাবলুদের কাজের লোক দাশুর সঙ্গে ভূষণের আলাপ হয়েছে। দাশুর কাছ থেকে বাবলু জানতে পারে যে, কানাই রায়ের বাস কলকাতার বেহালা অঞ্চলে। পয়সাওলা লোক। কাঠের কারবারি। বিপত্নীক। ওঁর এক ছেলেও বাবার সঙ্গে ব্যবসা দ্যাখে। অনেকদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগে রায়বাবুর শরীর কাহিল। ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছেন, কিছুদিন চেঞ্জে যেতে। অথচ কলকাতার ব্যবসা ছেড়ে বেশিদিন দূরে থাকার উপায় নেই। তাই কাছেপিঠে এই বাড়িটা ভাড়া নিয়েছেন দালাল মারফত নদীর ধারে হাওয়া বদলাতে। যে ভদ্রলোক সঙ্গে এসেছিলেন তিনি রায়বাবুর ম্যানেজার। প্রয়োজনে রায়বাবুর ছেলে বা ম্যানেজার এখানে আসতে পারবেন। ভূষণও বেহালায় যাবে রায়মশাইয়ের চিঠিপত্র নিয়ে।

এবার জগন ও বাবলুর কথাবার্তায় ফিরে আসা যাক।

জগন খানিক গুম হয়ে থেকে বলল, "আজ সকাল এগারোটা নাগাদ লাহাদের একটা আম গাছে উঠেছিলুম। গলির দিকে পাঁচিলের ধারের গাছটায়। বেশ উঁচুতে ডালে বসে একটা আমের গুটি ছুরি দিয়ে ছুলে ঝাল-নুন মাখিয়ে খাচ্ছি। খট করে একটা শব্দ হতে লাহাবাড়ির দোতলার ওদিককার খোলা জানালার দিকে তাকালাম। জানলা দিয়ে ঘরের ভেতর খানিকটা দেখা যাচ্ছিল। দেখলাম, একজন অচেনা লোক এসে দাঁড়াল ঘরের মাঝে। তার গা খালি, লুঙ্গি পরা, তোয়ালে দিয়ে ঘাড়-মুখ মুছছে। হঠাৎ সে জানালা দিয়ে আমগাছের দিকে তাকিয়েই চট করে সরে গেল। আর তাকে দেখতে পেলুম না। আমি তো দেখে ফেলেছে ভেবে কাঠ হয়ে রইলুম। একটু বাদে জানলার পরদাটা কেউ টেনে দিল পাশ থেকে। আর খানিক বাদে ওই ঘরের বারান্দার দিকের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন স্বয়ং কানাই রায়। লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি পরে। ওঁর লুঙ্গির রং যেন ঘরে দেখা সেই লোকটির লুঙ্গির মতোই। রায়বাবু আমার দিকে তাকালেন না। ধীরেসুস্থে চলে গেলেন। মনে হল সিঁড়ি দিয়ে নামলেন। আমার কৌতূহল হল। অন্য ঘরের লোকটি কে? রায়বাবুর কেউ এসেছে নাকি? আরও মিনিট-দশেক তেমনি বসে রইলাম। কিন্তু ও-ঘর থেকে আর কেউ বেরোল না। এই সময় ভূষণ নীচ থেকে আমায় ধমকে ডাকল, 'অ্যাই খোকা, ওখানে কী করছ? নেমে এসো শিগগির।'

"কী আর করি? নেমে চলে গেলাম ওখান থেকে। অবশ্য ভূষণ আর কিছু বলেনি। বুঝলি, সারা দুপুর এই নিয়ে ভেবেছি। ব্যাপারটা রহস্যজনক।"

"তুই মিছে এত ভাবছিস," বাবলুর মন্তব্য, "নিশ্চয় রায়বাবুদের চেনা কেউ এসেছে। রায়বাবু বেরিয়ে যাবার পর উনি ঘরেই ছিলেন। এমনি বেরোননি।"

"উঁহু," ঘাড় নাড়ে জগন, "আমি দুপুরে এক ফাঁকে বংশীকে জিজ্ঞেস করে এসেছি। লাহাবাড়িতে নতুন আর কেউ আসেনি।"

"অর্থাৎ তুই বলতে চাস…" বাবলুর হালকা ভাব উধাও।

"হুঁ, ছদ্মবেশ," দৃঢ় কণ্ঠে জানায় জগন, "কানাই রায়ের চুল, গোঁফ খুব সম্ভব ফলস।

হাবভাব নকল। কারণ যাকে ঘরে পা মুছতে দেখেছিলাম তার হাইট, ফিগার, রং কানাইবাবুর মতোই। কিন্তু মাথার চুল কালো, ছোট-ছোট। গোঁফ নেই। আর ঢের বেশি ইয়ং।"

বাবলু দপ্ করে ওঠে, "চ, তদন্ত করে আসি। আজ ফুটবল থাক।"

"কীভাবে করবি ?"

"লাহাবাড়ির পাশের গলিতে লুকিয়ে নজর করব, সত্যি ও-বাড়িতে নতুন কেউ এসেছে কি না ? এবং রাববাবুর চালচলন।"

লাহাবাড়ির উত্তরে সরু গলিতে ঢুকে, পাঁচিলের একটা ভাঙা অংশ দিয়ে জগনরা উঁকি মারে ভেতরে। সেখান থেকে লাহাবাড়ির খানিকটা নজরে আসে। গলির দিকে একতলায় সব জানালা তখন বন্ধ কাছেই পাঁচলের ওধারে একটা বড় আমগাছ। ওই গাছেই উঠেছিল জগন। মিনিঠ-দশেক বাদেই দু'জনে আড়ষ্ট হয়ে যায়।

কানাই রায় সদর দরজা দিয়ে বেরোচ্ছেন। দীর্ঘকায় মানুষটি লাঠি হাতে ধীরে হেঁটে গেট অবধি গেলেন। তারপর ফিরলেন একই পথে। এইভাবে বাড়ি ও গেটের মধ্যে চলল তাঁর পদচারণ। মাঝে-মাঝে অবশ্য থামছেন। দেখছেন এদিক-ওদিক। বার-দুই বিশ্রাম নিলেন বেদীতে বসে।

ইতিমধ্যে ভূষণ বেরোল বাড়ি থেকে। রায়বাবুর কাছে গিয়ে সে থামল। কিছু কথা হল দু'জনে। এরপর ভূষণ গেট খুলে বেরিয়ে গেল।

জগনদের নিরাশ হতে হল। কানাইবাবু খানিক পরেই বাগানে পায়চারি সেরে বাড়িতে ঢুকে গেলেন। আর বেরোলেন না। তাঁর চালচলনে আপাতত সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না জগনদের। লাহাবাড়িতে নতুন কোনও ব্যক্তির আগমনের প্রমাণও মিলল না। আরও মিনিট-পনেরো অপেক্ষা করে জগন ও বাবলু পাঁচিলের গা থেকে সরে এল। জগন তবু হাল ছাড়ে না। সে বলল, "কাল ওধারে জামগাছটায় চড়ে ওয়াচ করব। ওটা আরও উঁচু।"

গলি থেকে বেরিয়ে লাহাবাড়ির সামনে চওড়া রাস্তায় পা দেওয়া মাত্র ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠল দুই বন্ধু। গলির মোড়ে মস্ত কৃষ্ণচূড়া গাছটার গুঁড়ির আড়াল থেকে আর্বিভূত হল ভূষণ। সে নিচু স্বরে বলল, "বাবু আপনাদের ডাকছেন। একবার ভিতরে আসুন।"

চকিতে জগনের মাথায় খেলে, এরা নিশ্চয় তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করেছে। ভেতরে ডাকছে কেন ? মতলবটা কী ? যাওয়া কি উচিত হবে ? ফাঁদে পড়ব না তো ? জগন, বাবলু চোখাচোখি করে। দু'জনের মনে একই সংশয়। তবু বিপদের আশঙ্কা ছাপিয়ে কৌতূহল ও রহস্যের আকর্ষণই বেশি জোরালো হয়ে ওঠে। দুই বন্ধুই বেজায় ডানপিটে। যথেষ্ট বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তারা কম অ্যাডভেঞ্চার করেনি। জগন বাবলুকে ইশারা করে, চল। ভূষণের পিছু-পিছু তারা লাহাবাড়িতে প্রবেশ করল।

খোলা সদর দরজা দেখিয়ে ভূষণ বলল, "ভিতরে যান। বাবু সামনের ঘরে রয়েছেন।"

জগন, বাবলু ঘরে ঢোকে।

এটা বৈঠকখানা। মস্ত ঘরটায় অনেকগুলো পুরনো আমলের আসবাব। একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন রায়বাবু, মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে। জগনরা ঢুকতেই তিনি মৃদু কণ্ঠে আহ্বান জানালেন, "এসো। বোসো।"

কানাই রায়ের মুখোমুখি কৌচে বসল জগনরা। জগন চট করে একবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে নেয়। বাড়ির বাইরে ও অন্দরে যাবার দুটো দরজাই খোলা। ভূষণ ঘরে ঢোকেনি। বোধ হয় ও সদর দরজার পাশে ঘাপটি মেরে রয়েছে। ঘরে একটা খোলা জানলা দিয়ে বিকেলের রোদ ঢুকছে। নিস্তব্ধ বাড়ি।

রায়বাবুর পাশে রাখা মোটা লাঠিটা কি সাধারণ লাঠি, না গুপ্তি জাতীয় কোনও অস্ত্র? জগন সন্দিগ্ধ। কৌচের ধার ঘেঁষে বসল সে যাতে ছোট কাঠের টি-পয়খানা নাগালে পায়। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ওটা ছুঁড়ে মারা যাবে। আড়চোখে দেখল, বাবলুও সতর্ক।

রায়বাবু স্থির দৃষ্টিতে জগনদের একটুক্ষণ লক্ষ্য করে নিচু স্পষ্ট গলায় কথা বললেন, পরপর কতগুলি প্রশ্ন। "তোমরা এখানে থাকো? কী নাম? কী করো?"

জগনরা প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিল যথাসম্ভব সংক্ষেপে।

বাবলু খেয়াল করল যে, চুল, গোঁফ আধপাকা, চোখের কোণে কালচে ছোপ, ধরনধারণে বয়স ও ক্লান্তির ছাপ থাকলেও সামনে বসা মানুষটির দেহের বাঁধুনি এবং মুখের টানটান চামড়ায় যেন অনেক কম বয়সের চিহ্ন। প্রশ্নগুলির জবাব পেয়ে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে কানাইবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা ফুটবল খেলো?"

"হুঁ, খেলি।" দু'জনেই জানায়।

"হুম্।" রায় তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে দুই বন্ধুকে একবার দেখে নিয়ে ঘাড় নিচু করেন। কোনও মতলব ভাঁজছেন কি? জগন ও বাবলু প্রস্তুত।

"তুমি কোন টিমের সাপোর্টার? ইস্টবেঙ্গল না মোহনবাগান?"

রায়বাবুর এই অদ্ভুত প্রশ্নটা শুনে থতমত জগনের মুখে কথা সরে না।

"কী?" ফের জিজ্ঞেস করেন রায়।

"মোহনবাগান," জগনের আমতা-আমতা জবাব।

"আর তুমি?" এবার লক্ষ্য বাবলু।

"আমিও মোহনবাগান," বাবলু জানায়।

"ভেরি গুড। যাক, একটা দুশ্চিন্তা কাটল।" রায়মশাইয়ের মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তাঁর এই আচরণের দিশে পায় না জগনরা। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তারা।

দুই বন্ধুর মনের ভাব আঁচ করে রায়মশাই গম্ভীর ভাবে বললেন, "তোমাদের একটা কথা জানাতে চাই। এটা সিক্রেট। তবে আগে কথা দিতে হবে, যা শুনবে তা আর কাউকে বলবে না।"

"কী কথা?" জগনরা থই পায় না।

"আগে প্রমিস করো, তারপর বলব।"

"বেশ, করছি প্রতিজ্ঞা।" জগন, বাবলু বলে ওঠে।

"মনে রেখো সত্যি যদি তোমরা মোহনবাগান ক্লাবকে ভালবাসো তা হলে কক্ষনো কথার খেলাপ করবে না।"

"না না, আপনি বলুন।" জগনদের তর সয় না।

কানাই রায় কিঞ্চিৎ ইতস্তত করে বললেন, "শোনো, এই যে আমায় দেখছ, এটা আমার ছদ্মবেশ। আমি মিডল্ এজেড নই। সবে মাত্র পঁচিশ পেরিয়েছি।"

"মানে!" জগন, বাবলু চমকে যায়।

রায় বললেন, "আমার এই আধপাকা চুল, গোঁফ ফলস। চশমাটাও ফলস। পাওয়ার নেই। এই লাঠি হাতে ঝুঁকে চলা স্রেফ অ্যাকটিং। আরও বারো-তেরো দিন আমায় এমনভাবে কাটাতে হবে তোমাদের প্রিয় ক্লাব মোহনবাগানের স্বার্থে।"

"আরও বারো-তেরো দিন কেন?" বাবলুর প্রশ্ন।

"কারণ এ-বছর নাকি কলকাতায় ফার্স্ট ডিভিশন ফুটবলে কোন প্লেয়ার কোন ক্লাবে খেলবে তার জন্য সই করার লাস্ট ডেট আরও তেরো দিন বাকি। সেদিন মোহনবাগানের হয়ে সাইন করে আমার মুক্তি। সই করতে যাবার ঠিক আগে আমার এই ছদ্মবেশ ঘুচবে।"

"আপনি এবার মোহনবাগানে খেলবেন?" জগন চেঁচিয়ে ওঠে।

"অ্যাঁ, মোহনবাগান!" বাবলুও তাজ্জব।

"হুঁ, তাই ঠিক আছে।"

"কিন্তু এই লুকিয়ে থাকার কারণ?" বাবলুর জিজ্ঞাসা।

"যাতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কোনওমতেই না আমার হদিস পায়।"

"ও, ইস্টবেঙ্গলও বুঝি আপনাকে চাইছে?" জগন চমৎকৃত।

"আপনি যে ক্লাবে খুশি খেলবেন। আপনার ইচ্ছে না থাকলে ইস্টবেঙ্গল কি আপনাকে জোর করে খেলাতে পারে?"

বাবলু সন্দিগ্ধ।

"তা পারে। ওইখানেই আমার প্রবলেম।" রায়ের কণ্ঠে উদ্বেগ ফোটে, "আমার হিস্ট্রিটা শুনলে বুঝবে।"

কানাই রায়ের হাবভাব এখন বেমালুম পালটে গেছে। বুড়োটে অসুস্থ ভাব উধাও। খাড়া হয়ে বসে সতেজ গলায় তিনি শুরু করেন, "আমি ছোটবেলায় ছিলাম পাটনায়। বাবা চাকরি করতেন ওখানে। আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি বাবা হঠাৎ মারা যান। মা একটা স্কুলে পড়াতেন ওখানে। তাই অভাবে পড়লেও অকূলে পড়লাম না। আমার এক ছোটভাই আর ছোটবোন আছে। পড়াশুনো আমার তত ভাল লাগত না। তাই স্কুল পাশ করার পর চাকরির ধান্দায় লাগি। কিন্তু সুবিধে হল না। তখন পাড়ি দিলাম ব্রাজিল। ব্রাজিলে আমার এক পিসতুতো দাদা ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করে। তার কাছে উঠলাম। ইচ্ছে ছিল ওখানে কিছু শিখে-টিখে দেশে ফিরব। ফরেন

কোয়ালিফিকেশন থাকলে এ-দেশে কাজ পেতে সুবিধে হয়। ব্রাজিলে ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতির কাজ শিখি। ছোট থেকেই ভাল ফুটবল খেলতাম। ব্রাজিলে গিয়েও ফুটবলটা চালিয়ে গেলাম। একটা ক্লাবে খেলতে লাগলাম। কোচিংও নিলাম। সেখানে চাকরিও করলাম কয়েক বছর। খেলা কিন্তু থামাইনি।"

"অ্যাঁ! আপনি ব্রাজিলিও স্টাইলে ফুটবল শিখেছেন!" জগনের কণ্ঠে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়।

"তা বলতে পারো, ও-দেশে যখন কোচিং নিয়েছি।" রায়ের মুখে আত্মপ্রসাদ।

"পেলের খেলা দেখেছেন?" জগন উৎসুক।

"না ভাই, সে সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমি থাকতাম পেলের শহর থেকে অনেক দূরে। একবার মাত্র চোখে দেখেছি একটা ফাংশনে।"

"আপনি কোন ক্লাবে খেলতেন?" বাবলু জানতে চায়।

"সে নেহাতই ছোট ক্লাব। তবে ও-দেশে ফুটবলের যা স্ট্যাণ্ডার্ড, ওই ক্লাবই ইণ্ডিয়ার টপ্ টিমকে হারিয়ে দিতে পারে।"

"কোন পজিশনে খেলতেন?"

উত্তর হল, "স্ট্রাইকার।"

"মোহনবাগান আপনার খোঁজ পেল কীভাবে?" জগনের কৌতূহল।

রায় বললেন, "বছরখানেক আগে আমি দেশে ফিরি। মুঙ্গেরে একটা চাকরি পেলাম। ওখানকার একটা ক্লাবে ফুটবল খেলতে লাগলাম। বেশ নামও হল। মাসতিনেক আগে মোহনবাগান ক্লাব মুঙ্গেরে যায় এগ্‌জিবিশন ম্যাচ খেলতে। আমি খেলি মুঙ্গের ইলেভেনের হয়ে। আমার খেলা মোহনবাগানের নজরে পড়ে। ওখানেই মোহনবাগান আমায় এই সিজনে মোহনবাগানে খেলার অফার দিল। শর্ত হল, মোহনবাগানে খেলার জন্য সই করলে আমায় নগদ কুড়ি হাজার টাকা দেবে ক্লাব, এ ছাড়া কিছু খরচা। এমন সুযোগ···তাই রাজি হয়ে গেলাম। ঠিক হল, ক্লাব ট্রান্সফারের লাস্ট ডেটের মাসখানেক আগে আমি ছুটি নিয়ে কলকাতায় চলে আসব।"

"মাত্র কুড়ি হাজার। আপনি খাস ব্রাজিলে খেলেছেন! এঃ, একদম ঠকিয়েছে।" ক্ষুব্ধ জগনের মন্তব্য।

"হুঁ, এখানে এসে আমারও তাই মালুম হচ্ছে। যাকগে, ভাল খেলতে পারলে নেক্সট ইয়ারে দর বাড়াব।"

"তা ইস্টবেঙ্গল নিয়ে ঝামেলায় পড়লেন কেন?" বাবলুর প্রশ্ন।

"আমারই বোকামিতে," উত্তর দেন রায়, "হ্যাঁ, কথামতো চলে এলাম কলকাতায়। উঠলাম টালিগঞ্জে আমার এক কাকার বাড়ি। খুড়তুতো ভাইয়ের সঙ্গে গিয়ে লোকাল ক্লাবে প্র্যাকটিসও লাগালাম। মোহনবাগান ক্লাব বারণ করেছিল আমার এখানে আসার মতলব কাউকে জানাতে। কিন্তু ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেল আমারই দোষে। পাড়ার কয়েকজনকে বড়াই করে বলে ফেলেছিলাম আমার কলকাতায় আসার উদ্দেশ্য।

"কয়েকদিন বাদে লোকাল মাঠে সকালে প্র্যাকটিসের সময় নজর করলাম, ভারিক্কি চেহারার দুই ভদ্রলোক মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে আমাদের খেলা দেখছেন। প্র্যাকটিসের শেষে ওই ভদ্রলোকেরা আমায় আড়ালে ডেকে জানালেন যে, তাঁরা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অফিসিয়ালস। ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল টিমে এ-বছর আমায় খেলাতে চান এবং এর জন্য তাঁরা মোহনবাগানের অফারের চেয়ে দু'হাজার টাকা বেশি দেবেন।

"আমি স্রেফ না করে দিলাম। ভদ্রলোকরা চলে গেলেন। কিন্তু এরপর এল রীতিমত প্রেশার, অন্য সোর্সে। আমার কাকার অফিস-বস্ একদিন কাকাকে ডেকে প্রায় হুকুম দিলেন আমায় ইস্টবেঙ্গলে সই করতে রাজি করাতে। বস্ ইস্টবেঙ্গলের একজন কর্তা।

"কাকা পড়লেন মহা মুশকিলে। বস্ চটলে চাকরির ক্ষতি হতে পারে। এদিকে আমারও গোঁ, কথা যখন দিয়েছি এ-বছর মোহনবাগানেই খেলব। এই কাকাকে আমি খুব ভালবাসি। আমাদের আপদেবিপদে খুব করেছেন। মোহনবাগানকে জানালাম আমার প্রবলেম। ওদের কিছু টপ অফিসিয়ালস আমায় অ্যাডভাইস দিলেন, কাকার বাড়ি থেকে পালাও লুকিয়ে। ছদ্মবেশে অজ্ঞাতবাসে থাকো বাকি ক'টা দিন। সই-সাবুদ হয়ে যাবার পর কাকার বাড়িতে আশ্রয় না জুটলে মোহনবাগান আমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করবে। প্ল্যানমাফিক পালালাম। মোহনবাগান থেকেই আমায় এখানে পৌঁছে দিয়ে গেছে। আমার থাকার খরচ জোগাচ্ছে। এই লুকনোর অ্যারেঞ্জমেণ্ট করেছে। পালাবার সময় কাকার নামে একটা চিঠি রেখে এসেছি। আমার জন্য দুশ্চিন্তা না করতে। অবাধ্য ভাইপো না বলে কোথায় ভেগেছে, ঠিকানা জানা নেই। সুতরাং কাকার ঘাড়ে আর দায়িত্ব থাকে না।"

"যিনি ফিরে গেলেন, উনি কে?" জগনের প্রশ্ন।

"ওকে গাইড হিসেবে ক্লাব আমার সঙ্গে দিয়েছিল।"

"আর ভূষণ?" বাবলু জানতে চায়

"মোহনবাগান থেকেই দিয়েছে আমার দেখাশোনা করতে। লোকটা বেশ চালাকচতুর। ওই তো নীচ থেকে দেখে বোঝে, জগন আমার আসল চেহারা বোধ হয় দেখে ফেলেছে। আমি ঘর থেকে ধরতে পারিনি। তাই ঠিক করলাম তোমাদের সব খুলে বলাই ভাল। অবশ্য তোমরা যদি মোহনবাগানের জেনুইন সাপোর্টার হও। নইলে আমি এখান থেকে পালাতাম।"

কানাই রায় মুচকি হেসে বললেন, "কী ভেবেছিলে আমায়? নিশ্চয় দুষ্টু লোক। কোয়াইট ন্যাচারাল। ওঃ, সারাক্ষণ এই পরচুলা আর ঝুটা মোচ যে কী যন্ত্রণা। স্নানের সময় খুলতেই হয়। যাক, সব তো শুনলে। তোমাদের ফেভারিট ক্লাবের ইণ্টারেস্টটা দ্যাখো। কথাটা যেন লিক না হয়। কেউ আমার বেশি খোঁজ করলে আমায় সাবধান করে দিও। ইস্টবেঙ্গল কি সহজে ছাড়বে? প্রেস্টিজ ইস্যু।"

"নিজে নিজে মেক-আপ করতে পারেন?" বাবলু উৎসুক।

"পারি। আমায় মেক-আপ দিতে এক থিয়েটারের মেক-আপ ম্যান এনেছিল মোহনবাগান।

তিনি আমায় শিখিয়ে দিয়েছেন।"

দিন-তিনেক বাদে জগন ও বাবলু ফের লাহাবাড়িতে ঢুকল, গলি পথে পাঁচিল টপকে। যেন পেয়ারা বা কাঁচা আমের সন্ধানে লুকিয়ে ঢুকছে।

দোতলায় বারান্দার এক কোণে বসে ছিলেন কানাই রায়। খুশি হলেন জগনদের দেখে। বসতে বললেন সেখানে। একটু একটু করে দুই বন্ধুর অনেক খবর জেনে নিলেন। যেমন, জগনের বাবা নেই। দাদার আয়ে টেনেটুনে সংসার চলে। বাবলুর বাবা কিন্তু বড় চাকুরে। বাবলু পড়াশুনায় খুব ভাল। জগন মোটামুটি পাশ করে যায়। তবে ফুটবল খেলায় ওর খুব নাম। জগন কাছেই থাকে। বাবলুর বাড়ি খানিক দূরে, ইত্যাদি।

ব্রাজিলের ফুটবল নিয়ে জগনের প্রচণ্ড আগ্রহ। রায় বললেন, "ওরা জাত ফুটবলার। বাচ্চা ছেলেদের বল কণ্ট্রোল দেখলে তাজ্জব বনে যাবে। কত রকম ট্রেনিং দেয় ক্লাবে।"

রায় বললেন, "তোমরা এখানে আমায় কানুদা বলে ডেকো, তবে অন্যদের সামনে কিন্তু আমি কাকা।"

বাবলু একটা অটোগ্রাফ খাতা বের করে বলল, "কানুদা, পরে যখন ফেমাস হয়ে যাবেন, তখন কি আর আপনার নাগাল পাব? তাই এখনই অটোগ্রাফটা নিয়ে রাখি।"

কিঞ্চিৎ অনিচ্ছার সঙ্গে অটোগ্রাফ খাতায় ইংরেজিতে কানাইলাল রায় নাম সই করে কানুদা সাবধান করে দিলেন, "এটা এখন আর কাউকে দেখিও না।"

জগন বলল, "এখানে ক'টা বাড়ি চমৎকার নিরিবিলি। আমাদের রাস্তায় এক বুড়ো আচ্ছা জ্বালাচ্ছে। সারাদিন তারস্বরে ট্রানজিস্টার বাজায়। বুড়ো কানে কম শোনে। কাজকম্ম নেই। বাইরে রকে চেয়ারে বসে থাকে। পাশে রেডিও চলে। সব সময় শোনেও না। বসে-বসে ঝিমোয়।"

"বুড়োর বাড়িতে কে কে আছে?" কানুদা জিজ্ঞেস করেন।

"শুধু এক ছেলে, আর এক ভাইপো। তারা ঘুরে-ঘুরে পুরনো কাগজ কিনে তাই দিয়ে ঠোঙা বানিয়ে বেচে।"

"পাশের বাড়ির লোক প্রটেস্ট করে না?"

"করে। বদমাশ বুড়ো শোনে না। পাশের বাড়ির মণ্টুরা তাই বাধ্য হয়ে ওদিককার জানলা বন্ধ রাখে। আগের ভাড়াটেদের এসব ঝামেলা ছিল না।"

"এরা কদ্দিন এসেছে?" কানুদা জানতে চান।

"এই বছরখানেক।"

"সোশ্যাল নুইসেন্স," কানুদা ফোঁস করে ওঠেন, "বিদেশে এরকম কেসে পাড়ার লোক পুলিশে রিপোর্ট করে। কোর্টে ফাইন করে দেয়।"

জগন বলে, "আমরাও রেডিও-বুড়োকে টাইট দিতে পারি, কিন্তু মণ্টুর বাবাই বারণ করেন। আসলে ওই বাড়িটাও মণ্টুদের। পুরনো লঝ্ঝড়ে বাড়ি। ওদের সারাবার পয়সা নেই।

তাই সহজে ভাড়াটে জোটে না। বেশি গোলমাল করলে পাছে বুড়ো উঠে যায় সেই ভয়ে মণ্টুরা ওদের বিশেষ কিছু বলে না।"

বাবলু বলল, "কানুদা, আপনার প্র্যাকটিসের ক্ষতি হচ্ছে না?"

উত্তর হল, "নিশ্চয়। কিন্তু উপায় কী? দোতলায় বন্ধ ঘরে গোপনে খানিক এক্সারসাইজ করি। যতটা পারি, ফিট্‌নেস রাখছি। এবার থেকে বাড়ির বাইরেও অনেকটা হাঁটব।"

সন্ধ্যা নেমে গেছে। জগন ও বাবলু তাই বিদায় নিল।

সিধুখুড়ো একদিন জগনকে পাকড়ালেন, "কী রে, ওই যে চেঞ্জার এসেছে লাহাবাড়িতে, ওর সঙ্গে তো খুব জমিয়ে নিয়েছিস ওর বাড়ি যাস দেখেছি।"

"বেশি যাইনি। দু'বার মাত্র গেছি," প্রতিবাদ জানায় জগন, "পেয়ারা পাড়তে যাই। কছু বলেন না পাড়লে।"

"শুধু পেয়ারা, না সন্দেশ-রসগোল্লাও কিছু জোটে? বড়লোকের সঙ্গে অত মাখামাখির দরকারটা কী?" সিধুখুড়ো ভুরু কুঁচকে বললেন, "ওঁর চারকটা সুবিধের নয়। দু'দিন দেখেছি লোকটা রাত ন'টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। গতকাল ও বেরনোর পর আমি একঘণ্টা জেগে নজর রেখেছিলাম, লোকটা ফেরেনি। পাড়ায় চুরি হচ্ছে। এসব উটকো লোককে বিশ্বাস নেই।"

জগন সেদিনই সন্ধ্যায় গিয়ে কানুদাকে বলল, "জানেন, ভূষণ, নাকি প্রায় রাতেই বেরিয়ে যায়। অনেকক্ষণ বাইরে কাটিয়ে আসে।"

"কে বলল?" কানুদা অবাক।

"সিধুখুড়ো। এই রাস্তায় থাকেন। সবার হাঁড়ির খবর রাখেন। খুড়ো নাকি দেখেছেন ভূষণকে রাতে বেরোতে।"

"কোনও আড্ডায় যায় হয়তো।" কানুদা বিড়বিড় করেন।

জগন বলল, "ভূষণকে বারণ করবেন রাতে বেরোতে। খুব চুরি হচ্ছে। কাল রাতে মন্টুদের বাগানে একটা লোক ঘাপটি মেরে ছিল। মণ্টুর মা দেখে ফেলে চেঁচামেচি করতে তখন পালায়। পাড়ায়-পাড়ায় ছেলেরা নাইট-গার্ড দিচ্ছে। কোনওদিন সন্দেহ করে ধরবে ভূষণকে। তখন আপনাকে নিয়েও টানাটানি হবে।"

কানুদা শশব্যস্ত হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, আমি ওকে মানা করে দেব। সার্টেনলি। আর পাঁচটা দিন সেফলি কাটলে বাঁচি।"

পরদিন স্কুলে দেখা হইতেই বাবলু থমথমে মুখে জগনকে বলল, "আমার কালীঘাটের কচিমামাকে তো দেখেছিস। কচিমামা মোহনবাগানের দারুণ সাপোর্টার। ফুটবলের পোকা। প্রত্যেক ফুটবল সিজনে ময়দানের বড় ক্লাবগুলো কে কোন প্লেয়ার কোত্থেকে আনছে সব খোঁজ রাখে। ক'দিন আগে কথায়-কথায় মামাকে জিজ্ঞেস করি যে, এবার মোহনবাগান কি মুঙ্গের থেকে কোনও স্ট্রাইকার আনছে? মামা বলেছিল, কই শুনিনি তো? আজ কচিমামা এসে প্রায় ডেফিনিট হয়ে বলল এবার মোহনবাগান মুঙ্গের বা বিহারের কোথা থেকেও কোনও ফুটবলার আনছে না।

এর মানেটা কী ?"

"কী বলতে চাইছিস ?" জগন উদ্বিগ্ন।

বাবলু কড়া সুরে বলে, "সোজা কথা, ওই ছদ্মবেশী লোকটি আসলে কে ? উনি কি সত্যি মোহনবাগানে সই করার অপেক্ষায় লুকিয়ে আছেন, না অন্য কোনও কারণে ? ব্যাপারটা খুব গোলমেলে ঠেকছে।"

মোহনবাগানের পরম ভক্ত দুই কিশোর সারাদিনেও স্থির করে উঠতে পারে না, কী কর্তব্য ? তারা শেষে ঠিক করে যে, আরও দু-তিনদিন অপেক্ষা করা যাক। নজর রাখি কানু রায়ের হালচাল, ভূষণের গতিবিধি। সন্দেহ বাড়লে কানাই রায় সম্পর্কে অন্যদের জানানো ছাড়া উপায় নেই।

পরদিন সকালে বাবলু ঘুম থেকে উঠতেই তার মা বললেন, "জানিস, পঞ্চাননতলায় পুলিশ এসেছে, কাদের নাকি ধরতে।"

পঞ্চাননতলা অর্থাৎ জগনদের পাড়া। নির্ঘাত কানাই রায় নামে ছদ্মবেশীকে অ্যারেস্ট করতেই পুলিশের আগমন। লোকটি নিশ্চয় কোনও অপরাধ করে লুকিয়ে ছিল। বাবলু চটপট রাস্তায় বেরোয়। মা সাবধান করেন, "খবরদার, কাছে যাসনি। হয়তো ডাকাত-টাকাত। যদি বোমা ছোঁড়ে ?"

পঞ্চাননতলায় পৌঁছে বাবলু দেখল, ভিড়টা লাহাবাড়ির সামনে নয়। রেডিও-বুড়ো ওরফে চণ্ডীচরণের বাড়ী ঘিরে প্রচুর পুলিশ এবং জনতা। জগনও রয়েছে ভিড়ের মাঝে। বাবলু জগনের সঙ্গ ধরল।

পাড়ার মাতব্বর মুখুজ্যেমশাই হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলেন। এই দারুণ খবরটা ওঁর কানে একটু দেরিতে পৌঁছেছে। তিনি খড়দা থানার মেজোবাবুকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার, সার ?"

হেঁড়ে গলা কিঞ্চিৎ খাটো করলেও জগনরা শুনতে পেল মেজোবাবুর কথা 'নোট জালের কারবার। খুব ঘোড়েল পার্টি। ওই চণ্ডীবুড়ো ওরফে নদে-প্রিণ্টার লিডার। বুড়ো বাইরে বসে জোরে রেডিও বাজাত ঘরের মধ্যে নোট ছাপার শব্দ ঢাকতে। আর গার্ড দিত। কাল সন্ধ্যায় বুড়োর সেজ-ছেলেটা হাতেনাতে ধরা পড়েছে রাজাবাজারে। ওর থলের ভেতর ঠাসা ছিল জাল নোট। ওপরে কিছু ঠোঙা সাজানো। ফার্স্টক্লাস টেকনিক। ঠোঙা বিক্রির ভান করে মাল পাচার করত বেটারা।"

"ওরা বুড়োর ছেলে-ভাইপো নয় ?" মুখুজ্যে বিমূঢ়।

"ঘোড়ার ডিম। শাগরেদ মশাই শাগরেদ," মেজোবাবু জানান।

"আপনারা টের পেলেন কী করে ?" মুখুজ্যের কৌতূহল।

মেজোবাবু গলা আর-এক পরদা নামিয়ে বললেন, "বড়বাবু ছাড়া লোকাল থানার আর কেউ জানত না। এটা লালবাজার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের কাজ। ওরাই ধরেছে। লালবাজার থেকে ফোর্স এসেছে, আমরাও আছি।"

খড়দা থানার বড়বাবু চন্ডীচরণের বাড়ির সামনে সাধারণ শার্ট-প্যাণ্ট পরা এক ভদ্রলোকের

সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন এদিকে পিঠ ফিরে। দারোগা বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলেন। পাশের লোকটি তেমনই দাঁড়িয়ে রইলেন।

"উনি কে? সেই লোকটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেন মুখুজ্যে।

"লালবাজারের সি. ই. ডি. ইন্সপেক্টর। এই অপারেশনের চিফ।" জানালেন মেজোবাবু।

জগন ও বাবলু ওই ইন্সপেক্টরের পিছনে গিয়ে খোলা দরজা দিয়ে চণ্ডীচরণের বাড়ির ভেতর উঁকি মারে।

চারজন পুলিশ বড়-বড় দুটো কাঠের বাক্স বয়ে এনে পুলিশ-ভ্যানে তুলল। তাদের একজনকে দেখে অনেকেই থ। জগন বলল, "ভূষণ, না?"

ভূষণের পরনে পুলিশের ইউনিফর্ম। তার সেই আগের হাসিখুশি ভাবটি উধাও। গম্ভীর, কঠোর মুখ।

"কারেক্ট। সাবইন্সপেক্টর ভূষণ দাস, ইণ্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ।"

চাপা গলায় এই কথাগুলি কানে যেতে জগন ও বাবলু চমকে দ্যাখে, লালবাজারের সেই ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর কখন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছেন প্রায় তাদের পাশে। বলছেন তিনিই। আড় চোখে দেখছেন তাদের।

"অ্যাঁ কানুদা!" জগন চিনতে পারে। কারণ, নকল চুল-গোঁফ চশমাবিহীন বছর পঁয়ত্রিশের কানুদাকে সে একবার দেখেছিল। এতক্ষণ এঁর মুখ সে লক্ষ্য করেনি।

ইন্সপেক্টরের ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলক।

জগনের অস্ফুট 'কানুদা' ডাক এবং কণ্ঠস্বরে বাবলুও বুঝে ফ্যালে। ভীষণ অবাক হয়ে বলে, "আপনি ডিটেকটিভ!"

কানুদা একবার ঘাড় ঝাঁকালেন সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে। তারপর গটগট করে এগিয়ে গেলেন পুলিশ-ভ্যানটার দিকে।

একটি অগ্নিগর্ভ বই

বাণীব্রত চক্রবর্তী

সন্ধ্যে থেকেই টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। বইপাড়া অন্ধকার। এই তো একটু আগে আলো ছিল। লোডশেডিং হোক আর নাই হোক, খলিলের কিছু এসে যায় না। সন্ধ্যে হলে তাকে কারবাইডের বাতি জ্বালাতে হয়। অথচ পাশাপাশি দোকানগুলিতে ইলেকট্রিকের আলো জ্বলে। প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিং-এর গায়ে কতকাল, কতকালের পুরনো বইয়ের দোকানগুলির পত্তন হয়েছিল। কতকালের পুরনো এইসব দোকান। তারপর অনেকখানি সময় বয়ে গেছে। প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিংগুলি এখন নেই। সেখানে এখন পাঁচিল উঠেছে। কিন্তু বইয়ের দোকানগুলি নিশ্চিহ্ন হয়নি। আজও আছে। তবে পঁচিশ-তিরিশ বছর আগের চেহারা এখন নেই! আগে বইগুলি দড়িতে ঝুলত। কারও-কারও আবার কেরোসিন কাঠের র‍্যাক ছিল। মাথায় আচ্ছাদন বলতে তেরপল। এইসব নিয়েই ছিল কলেজ স্ট্রিটের পুরনো বইয়ের দোকান।

আগে এখানে মণি-মাণিক্যের মতন দুর্লভ বই পাওয়া যেত। কেবল এদেশী কেন, বিদেশীরাও এইখানে সেইসব মণি-মাণিক্যের সন্ধানে ছুটে এসেছেন। কলকাতার দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে পুরনো বইয়ের দোকানগুলির আকর্ষণ কম ছিল না।

এখন পুরনো বইয়ের দোকানের সেই চেহারা নেই। পালটে গেছে। দড়িতে বা কেরোসিন কাঠের র‍্যাক এখন বইগুলির আশ্রয় নয়। এখন যেমন রেলিং অন্তর্হিত হয়ে পাঁচিল উঠেছে, তেমনই দোকানগুলির চেহারা পালটেছে। একমাত্র খলিল যেন পালটায়নি। খলিল এসবের ভেতর মূর্তিমান ব্যতিক্রম।

বাতি জ্বালিয়ে খলিল কাঠের টুলের উপর চুপ করে বসে থাকে। মানুষটা যেমন পুরনো তার ব্যবসার রসদও পুরনো।

সন্ধ্যেবেলার টিপটিপে বৃষ্টির মধ্যে একজন মানুষ খুব মন দিয়ে পুরনো বইয়ের পাতা

ওলটাচ্ছে। সেই মানুষটি অচেনা নয়। সাত্যকি দত্ত।

মজুমদারমশাই বলেছিলেন, "খলিল আপনাকে খুঁজছে।" খলিলের সঙ্গে সাত্যকির একটা অলিখিত চুক্তি আছে। দুষ্প্রাপ্য দুর্মূল্য কোনও বইটি পেলে সে যেন সাত্যকিকে জানায়।

মজুমদারমশাই তো রীতিমত আক্ষেপ করেন, "দেখছেন মশাই, কাণ্ডটা দেখছেন? খলিলের উচিত তো আগে আমাকেই বইটই দেখানো। তা নয়। ওর মাথায় দত্তবাবু চেপে বসেছেন।"

সুতরাং সাত্যকি কেমন করে বাড়িতে বসে থাকবে। তাই খবর পেয়ে এই বৃষ্টির মধ্যে সে ছুটে এসেছে। কোনও এক বাঙালিবাবুর কাছ থেকে খলিল এক ডজন বই পেয়েছে। খলিল জানে, এই বইয়ের সমঝদার মজুমদারমশাই আর দত্তবাবু। পুরনো বইগুলির পাতা ওলটাতোপালটাতে সাত্যকি যে খুব খুশি হচ্ছিল, তা নয়। কেননা চমকে ওঠা বা আহ্লাদে আটখানা হওয়ার মতো বই সাতটি বইয়ের মধ্যে নেই। পাঁচটা বই এখনও বাকি।

সাত্যকির চোখ বইয়ের পাতায়। খলিলের চোখ দত্তবাবুর মুখের উপর। তখনও টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। মাঝে-মাঝে হাওয়া। রাস্তায় লোকজন যে খুব তা অবশ্য নয়। তবে এমন আবহাওয়ায় তারাই বাড়ির বাইরে বেরোয় যাদের না বেরিয়ে উপায় নেই। বইগুলি ওলটাতে-ওলটাতে সাত্যকি জিজ্ঞেস করল, "এই বইগুলো কত টাকায় কিনলে?"

খলিল হাসল। বলল, "এক পয়সাও নয়।"

"তার মানে?"

"আজ্ঞে, যদি বেচতে পারি তবে টাকা দেব।"

সাত্যকি বলতে যাচ্ছিল, 'খলিল, এ বই ফেরত দিয়ে দাও। তুমি ভাবছ এ-বই বেচে দু' পয়সা লাভ করবে? তা বোধহয় হবে না। এ-বই এমন কিছু আহামরি নয়।" কিন্তু বলা হল না। ছাই থেকে এবার অমূল্য রতন বেরিয়ে পড়ল। সাত্যকি নির্দ্বিধায় পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বার করে খলিলের হাতে গুঁজে দিল। খলিল স্তম্ভিত। এ-ব্যবসা তার আজকের নয়। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে সে প্রেসিডেন্সি কলেজের এই ফুটপাথের ধারে বই বেচছে। সে লেখাপড়া জানে না ঠিকই, কিন্তু বই কিনতে তার ভুল হয় না। এক বাবু এক ডজন বই বেচতে দিয়ে গেছেন। এর মধ্যে একশো টাকায় বিক্রি করার মতন বই ছিল না। তাই খলিল জিজ্ঞেস করল, "কী বই নিলেন বাবু?"

সাত্যকি বইটা তুলে ধরল। "বোমকেশ শীলের আত্মকথা"। খলিল হাত বাড়িয়ে বইটা নিল। তারপর বইটা বাতির সামনে নিয়ে গিয়ে উলটে-পালটে দেখল। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না। এটা কী এমন বই যে, দত্তবাবু সঙ্গে-সঙ্গে কিনে ফেললেন। কত বইতো দত্তবাবু খলিলের কাছ থেকে নিয়ে যান। যাওয়ার সময়ে বলেছে, "আগে নেড়ে-চেড়ে দেখি। তারপর যদি নেওয়ার মতো হয় তো নেওয়া যাবে।" কোনওদিন হয়তো একসঙ্গে আট-দশটা বই নিয়ে গেলেন। তারপরে ক'দিন বাদে সব নিয়ে এসে খলিলের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "না খলিল, এর মধ্যে একটাও কেনার মতন বই নেই। শুধু-শুধু ঘরের বোঝা বাড়িয়ে কী লাভ। আজ কি কোনও নতুন বই এসেছে?"

হয়তো খলিল মাথা নেড়ে, বলেছে "না দত্তবাবু, আর কোনও নতুন বই আসেনি।" দত্তবাবু বলেছেন, "তা হলে নতুন বইটই এলে খবর দিও কেমন?" খলিল মাথা নেড়ে বলেছে, "ঠিক আছে বাবু।"

নতুন বই-টই এলো অর্থাৎ নতুন লটের পুরনো বই আর কি, খলিল দত্তবাবুকে খবর পাঠায়। খবর পাঠানোয় অসুবিধে নেই। কাছেই মজুমদারমশাইয়ের দোকান। তাঁর মাধ্যমে খবর পাঠানো যায়। আর যদি মজুমদারমশাইকে না পাওয়া যায় তা হলেও অসুবিধে নেই। খলিল বাদুড়বাগান চেনে। বাদুড়বাগানে দত্তবাবুর বাড়ি। এবারে মজুমদারমশাইকে পাওয়া গিয়েছিল। তাঁর মাধ্যমেই সে দত্তবাবুকে খবর পাঠিয়েছিল। খবর পেয়েই বইপাগল দত্তবাবু ছুটে আসেন। আজ আবহাওয়া খারাপ। সকাল থেকেই বৃষ্টি। আকাশ মেঘলা। প্রাকৃতিক আবহাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিক্রিবাটার আবহাওয়াও খারাপ। ওই মেঘলা আকাশের মতন সারাদিন খলিলের মনটাও মেঘলা ছিল। সারাদিনে এতক্ষণ পর্যন্ত পাঁচ টাকারও বই বিক্রি হয়নি। কিন্তু এক্ষুনি কী যে হল। সাত্যকি ওই বইটার ভিতর কী এমন খুঁজে পেল যে, একেবারে সঙ্গে-সঙ্গে পকেট থেকে একখানি পুরোপুরি একশো টাকার নোট বার করে খলিলের হাতে গুঁজে দিল। নাহ্, খলিলের মাথায় কিছু ঢুকছে না। দত্তবাবু ওই বইটা কিনলেন কেন? আর যদিও-বা কিনলেন তবে এত দাম দিয়ে কেন?

২

তখন বোধ হয় রাত সাড়ে আটটা হবে। সত্যিকি গিরিশবাবুর বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। পটলডাঙার এই সরু গলিতে ভদ্রলোক থাকেন। এই গলিতে ঢুকলে সাত্যকির বেনারসের গলির কথা মনে পড়ে। সেখানকার গলিগুলি এইরকম সরু। এইরকম সর্পিল, এইরকম স্যাঁতসেঁতে, এখন এই ভর দুপুর বেলাতেও সাত্যকি এই গলিতে ঢুকেছে। তখনও দেখেছে এই গলিতে অন্ধকার। অন্ধকার যেন এই গলিতে থাকার জন্যে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে রেখেছে। অন্ধকারের চোখ-শাসানিতে এখানে আলো ঢুকতে পায় না।

দরজা খুললেই উঠোন। স্যাঁতসেঁতে রকের উপর দিয়ে হেঁটে কোণের ঘরটায় যেতে হয়। অকৃতদার বৃদ্ধ গিরিশ চক্রবর্তী এই বাড়ির একতলায় একখানি ঘর নিয়ে একাই থাকেন। একটা ঠিকে-লোক আছে, সে বিকেল-বিকেল কাজ শেষ করে চলে যায়। সকালের রান্না সে করে। রাত্রে গিরিশবাবু কোনওদিন মুড়ি খান। কোনওদিন পাউরুটি। মাঝে-মাঝে খই-দুধ।

সাত্যকি যখন পেঁছিল তখন গিরিশবাবু হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছেন। সাত্যকিকে দেখে গিরিশবাবু অবাক হলেন। খুশিও হলেন। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল বলে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

সাত্যকি গিরিশবাবুর পাশে গিয়ে বসল। জিজ্ঞেস করল, "কোনও ওষুধটষুধ খেয়েছেন।

উনি হাঁপাতে-হাপাতে হেসে বললেন' "খেয়েছি।"

সাত্যকি বলল, "কী খান? অ্যালোপ্যাথি না হোমিওপ্যাথি?"

গিরিশবাবু বললেন, "কবিরাজি। শ্বাসবজ্র, তালীশাদ্যা, জ্বরাশনির সঙ্গে অনুপান জল।"

কিছুক্ষণবাদে গিরিশবাবুর হাঁপের টান কমে এল। এবার সাত্যকি আসল কথাটা পাড়ল, "ব্যোমকেশ শীলের আত্মকথা বইটা পেয়েছি।"

গিরিশ চক্রবর্তী হতভম্বের মতন সাত্যকির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

খলিল এই বইটার দাম বুঝতে পারেনি। গিরিশ চক্রবর্তীর সঙ্গে পরিচয় না হলে সাত্যকিও এই বইটার গুরুত্ব বুঝতে পারত না।

বয়স্ক লোকেদের সঙ্গে সাত্যকির ভাব বেশি। এ-ব্যাপারে তার যুক্তিও আছে। ষাট পেরোলে মানুষের আসল জ্ঞানটা হয়। অভিজ্ঞতার একটা দাম আছে না?

মাস-কয়েক আগের এক বিকেলবেলার কথা। সাত্যকি কলেজ স্কোয়ারের বেঞ্চে বসে ছিল। বিকেলবেলায় এখানে মহাভারত পাঠ হয়। মাঝে-মাঝে সাত্যকি এইরকম কোনও পার্কে বা দিঘির ধারে গিয়ে একা-একা ঘুরে বেড়ায় বা বসে থাকে। এইসব জায়গায় কতরকম মানুষ আসে। কত ধরনের মানুষ। নানা বয়সের, নানা পেশার নানা চরিত্রের মানুষ। মানুষদের পর্যবেক্ষণ করতে তার ভাল লাগে। নতুন মানুষ দেখলে কখনও-কখনও সে এগিয়ে গিয়ে আলাপ করে। সাত্যকি লেখক নয়। তবে সত্যান্বেষণে সে পিছপা নয়। পৃথিবীর জটিল রহস্যের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িয়ে রয়েছে মানুষ। আর মানুষই সবচেয়ে রহস্যময়। এইভাবে সেদিন সে কলেজ স্কোয়ারের বেঞ্চে বসে নানা কথা ভাবছিল। দেখতে-দেখতে অনেকখানি সময় পেরিয়ে গিয়েছিল। অবশেষে মহাভারত পাঠ শেষ হয়। এতক্ষণ যেসব মানুষ মহাভারত পাঠ শুনছিলেন, তাঁরা গাত্রোত্থান করলেন। সাত্যকি লক্ষ্য করেছিল, শ্রোতারা সকলে বৃদ্ধ আর বৃদ্ধা। তাঁদেরই মধ্যে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে সাত্যকির পাশে বসে ছিলেন। ভদ্রলোকের বয়স সত্তরের কাছাকাছি হবে। সাত্যকি মিশুকে। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে তাই সে সহজে আলাপ করে নেয়। অসম-বয়সী দুটি মানুষ সেদিন দুই বন্ধুতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোকের নাম গিরিশ চক্রবর্তী। থাকেন পটলডাঙায়। রেলে চাকরি করতেন। ভারতবর্ষটা পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখেছেন। তিন কুলে আপন বলতে কেউ নেই। নিজেও বিয়ে-থা করেননি।

বিগত কয়েকটি মাস সাত্যকি গিরিশবাবু ছাড়া আর কাউকে চেনেনি। এই বইটির কথা গিরিশবাবুই বলেন। পঞ্চাশ বছর ধরে গিরিশ চক্রবর্তী ব্যোমকেশ শীলের আত্মকথা নামের বইটি হন্যে হয়ে খুঁজেছেন। কী আছে এতে? কী এমন বই?

কথায়-কথায় গিরিশবাবু বলেছিলেন, "দ্যাখো সাত্যকি, এতকাল বাদে আমি মনের কথা খুলে বলবার মতন একটা লোক পেলুম বটে। তুমি আমার ছেলের মতন। কিন্তু আজ মনের মতন বন্ধু তুমিই।" সাত্যকি রুদ্ধনিশ্বাসে গিরিশবাবুর কথা শুনছিল। সে কল্পনা করতে পারেনি একটা বইয়ের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এমন শ্বাসরুদ্ধকর ইতিহাস গিরিশবাবুর মুখেই সাত্যকি শুনল

বইটি সম্পর্কে কিছু কথা। এইরকম মারাত্মক বই সারা পৃথিবীতে নাকি মোটে এক কপি আছে। আর সেটা রয়েছে এই ভারতবর্ষেই।

সেই দুর্লভ বইটি আজ খলিলের দোকানে পাওয়া গেল। ব্যোমকেশ শীলের আত্মকথা নামের বইটা নিয়ে সাত্যকি গিরিশবাবুর কাছে ছুটে এসেছে। আজ আবহাওয়া খুব খারাপ। এখনও টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকালে মন আরও খারাপ হয়ে যায়। কেননা রাত্রির অন্ধকারকে পাল্লা দিয়েছে আর-এক অন্ধকার। সে অন্ধকার মেঘের। আকাশে সারাদিন মেঘ। মেঘ বাড়ছে বই কমছে না। চাঁদ-তারা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এই দুর্যোগ, এই বিরক্তিকর আবহাওয়া কোনও কিছুই আজ সাত্যকিকে উত্যক্ত করছে না, এই আবহাওয়া গিরিশবাবুকে পীড়িত করেছে। তাঁর হাঁপের টান বেড়েছে। তাই বৃদ্ধকে এই ছোট ঘরটির ভিতর বসে থাকতে হয়েছে। কবিরাজি ওষুধের মাত্রা বাড়িয়ে শরীরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে। তাঁর মনে হয়েছে পারিপার্শ্বে বাতাস নেই। অক্সিজেন নেই। ওষুধ খাওয়ার পর আস্তে-আস্তে টানটা কমে আসছিল। তারপর তিনি যখন সাত্যকির মুখে ওই কথা শুনলেন তখন নিজেকে আরও সুস্থ মনে হচ্ছিল।

সাত্যকি হাত বাড়িয়ে গিরিশবাবুর দিকে বইটা এগিয়ে দিল। গিরিশ চক্রবর্তীও বালকের মতো হাত বাড়িয়ে বইটা নিলেন। বইটা উলটে-পালটে দেখতে-দেখতে তাঁর মুখের চেহারা ক্রমশ পালটে যাচ্ছিল। বৃদ্ধের যে মুখ এতক্ষণ কষ্ট আর পীড়ার ভারে আক্রান্ত ছিল, সে মুখ এখন আনন্দে, প্রসন্নতায় উদ্ভাসিত। গিরিশবাবু যতক্ষণ বইটা দেখছিলেন সাত্যকি ততক্ষণ চুপ করে বসে ছিল। তারও মনের ভিতর আনন্দ আর প্রশান্তির জন্ম হচ্ছিল। বইটা দেখে ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকালেন। ঘরের ম্লান আলোয় সাত্যকি স্পষ্ট দেখতে পেল, গিরিশবাবুর চোখের কোণে অশ্রু চিকচিক করছে। ভদ্রলোকের ঠোঁট তিরতির করে কাঁপছে। উনি তার ডান হাতটি তুলে বললেন, "আমার মুখে কোনও ভাষা আসছে না। তোমাকে আশীর্বাদ করে বলি, তুমি আরও বড় হও সাত্যকি।"

রাত্রে সাত্যকি বাড়ি ফিরল। সদর-দরজার মুখে খলিলের সঙ্গে দেখা। সাত্যকি অবাক।

"কী ব্যাপার খলিল, তুমি ?"

"বাবু, অনেকক্ষণ ধরে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।"

"কেন ? কোনও দরকার আছে নাকি ?"

"আপনার কাছ থেকে সেই বইটা ফেরত নিতে এসেছি।"

"কোন বইটা ?"

"সেই যে ব্যোমকেশ শীলের আত্মকথা।"

"কেন ?"

খলিল এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, "আপনার টাকাটাও এনেছি। এই নিন একশো টাকা।"

সাত্যকি উত্তেজিতকণ্ঠে বলল, "সে বই ফেরত দেব কেন ?"

খলিল জবাব দিল না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। সাত্যকি এবার কিঞ্চিৎ নরম হয়। তারপর বলল, "আর তা ছাড়া ওই বই আমার কাছে নেই।" কথাটা শুনে খলিল যেন চমকে উঠল। হয়তো আহতও হল। সাত্যকির দিকে মুখ তুলে করুণ দৃষ্টিতে তাকাল।

"কিন্তু ওই বইটা আমাকে ফেরত দিতে হবে বাবু।"

সাত্যকি হেসে ফেলল, "কী ব্যাপার বলো তো।"

খলিল কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধীরে-ধীরে বলল, "সে-কথা আমায় জিজ্ঞেস করবেন না।"

সাত্যকি কয়েক সেকেন্ড চুপ করে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, "রাত হয়েছে, তুমি এখন বাড়ি যাও। কাল সকালে তোমার দোকানে যাব।"

৩

রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে সাত্যকি বইটার কথা ভাবছিল। ব্যোমকেশ শীলের আত্মকথা বইটার নাম হলেও ভিতরে অন্য ব্যাপার। ব্যোমকেশ শীল যাঁর ছদ্মনাম তিনি মোটেই বাঙালি নন। সখারাম গণেশ দেউস্করের মতন ইনি একজন মারাঠি ব্রাহ্মণ। তবে তাঁর আসল নাম যে কী ছিল, তা আজও জানা যায়নি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনে তিনি মুষ্টিমেয় মানুষের কাছে 'মাস্টারজি' বলে পরিচিত। সূর্য সেন ভূগোলের শিক্ষক ছিলেন। সেই হিসেবে তিনি 'মাস্টারদা'। কিন্তু মাস্টারজি কোথাও কখনও শিক্ষকতা করেননি। হয়তো তাঁর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্যে তাঁকে মাস্টারজি বলা হত। চরমপন্থী দলের বাইরেও যদি উগ্র চরমপন্থী কোনও সম্প্রদায় থেকে থাকে তবে তার মূলে মাস্টারজি। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার দায়িত্ব যাঁরা নিয়েছিলেন, তাঁদের সহযোগিতা করার দায়িত্ব ছিল মাস্টারজির। গোপনে তিনি একটি বই লেখেন। ব্যোমকেশ শীলের আত্মকথা। আত্মকথার ছলে তিনি বিপ্লবের কথা বলেছেন। বিপ্লবের প্রস্তুতির ইতিহাস এখানে লেখা আছে। বিপ্লবীর আদর্শ কীরকম হওয়া উচিত, তা এই বইতে যত্নের সঙ্গে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু এর থেকেও বড় কথা, এই বইতে যা আছে তা অভাবনীয়। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মাস্টারজি এতে যা লিপিবদ্ধ করেছেন, তা মারাত্মক। আত্মকথার ভিতরে তিনি সন্তর্পণে ভয়ঙ্কর-ভয়ঙ্কর পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেছেন। দুর্ধর্ষ সব মরণাস্ত্র নির্মাণের কৌশল, বোমা তৈরির ফর্মুলা এবং কীভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিদেশী শাসন-যন্ত্রকে ধ্বংস করা যায়, তার রাস্তাও দেখিয়েছেন। কিন্তু বইটি হাতে নিয়ে উলটে-পালটে সহজ চোখে এর অন্তর্নিহিত সত্যটি ধরা যাবে না। কর্মবীর ব্যোমকেশ শীলের প্রিয় বিষয় গণিত। তিনি যখনই অবসর পেতেন তখনই অঙ্ক নিয়ে মশগুল হতেন। কীরকম অঙ্ক তিনি সচরাচর করতেন, তার দৃষ্টান্ত এই বইতে আছে। আসলে সেগুলি অঙ্কের ছদ্মবেশে বোমা তৈরির ফর্মুলা।

গিরিশবাবু মাস্টারজির কথা বলতে বলতে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "মাস্টারজির কথা আমাদের ইতিহাসে নেই। এঁর কথা সেকালে কয়েকজন উগ্রপন্থী বিপ্লবীই কেবল জানতেন। মাস্টারজির ইচ্ছে ছিল গোপনে এই বই ছাপিয়ে ফরাসি ও জার্মান দেশে পাচার করা। কিন্তু সাত্যকি, সে সাধ তাঁর মেটেনি।" এই পর্যন্ত বলে গিরিশবাবু চুপ করেছিলেন। সাত্যকি লক্ষ করেছিল, বৃদ্ধের মুখে অদ্ভুত এক কারুণ্য। গিরিশবাবুর চোখ ছলছল করছিল। তিনি শান্ত হয়ে বসে ছিলেন। হয়তো দূর অতীতের কথা ভাবছিলেন। সাত্যকি আর ধৈর্য ধরতে পারেনি। ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করেছিল, "মাস্টারজির সাধ মিটল না কেন ?"

গিরিশবাবু দূর অতীত থেকে আবার বর্তমানে ফিরে এসেছিলেন, "চিৎপুরের যে প্রেসে এ-বই ছাপা হয়েছিল, এমনকী, ওই প্রেসেই বইটা বাঁধাই হয়েছিল, তা রাতারাতি এক আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে যায়। শোনা যায়, দুর্ঘটনার সময় স্বয়ং মাস্টারজি ওই ছাপাখানায় ছিলেন। প্রবল অগ্নিকাণ্ডে তিনিও নিশ্চিহ্ন হন। অবশ্য বিদেশী শাসকদের মত অন্যরকম। তাঁরা বলেন, মাস্টারজি ফেরার হয়েছিলেন। তাঁর হদিস পাওয়া যায়নি। মাত্র একটি বই যে কীভাবে আগুন আর ইংরেজদের চোখে ধুলো দিয়ে রক্ষা পেয়ে গেল, সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার।"

সাত্যকি মন্ত্রমুগ্ধের মতো গিরিশবাবুর কথা শুনছিল। গিরিশবাবু এবার থেমেছিলেন। সাত্যকি জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনি এতসব জানলেন কেমন করে ?"

গিরিশবাবু বলেছিলেন, "এ আমার ছোটকাকার মুখে শোনা। ছোটকাকা মাস্টারজির শাগরেদ ছিলেন।"

সাত্যকি কৌতূহল দমন করতে পারেনি। তাই সে আবার জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনি হন্যে হয়ে বছরের পর বছর সে বই খুঁজছেন কেন ?"

গিরিশবাবু এবার ম্লান হাসি হেসে বলেছিলেন, "সেটা তোমাকে বোঝাতে পারব না। ছোটকাকা মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আমার হাত ধরে একটি অনুরোধ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'দ্যাখো, সারাটা জীবন দেশ দেশ করে কেটে গেল। সংসার করলুম না। তোমার কাছে আমার অনুরোধ ও বই তুমি উদ্ধার করো, তা হলে পরলোকে আমার আত্মা শান্তি পাবে।' বুঝলে সাত্যকি।"

সাত্যকির ঘুম আসছে না। তার মাথায় কেবলই ওই একটি বইয়ের কথা ঘুরছে। ব্যোমকেশ শীলের আত্মকথা। সাত্যকি বিছানা ছেড়ে উঠে বইয়ের র‍্যাকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। র‍্যাক-ভর্তি কেবল বই। অজস্র বই। বইয়ের ভিতর থেকে খুঁজে-খুঁজে সখারাম গণেশ দেউস্করের দেশের কথা বইটা বার করল। বইটা নিয়ে কিছুক্ষণ উলটে-পালটে দেখল। দেখতে-দেখতে তার কেবলই মাস্টারজির কথা মনে পড়ছিল। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে 'দেশের কথা' ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। কিন্তু ব্যোমকেশ শীলের আত্মকথা ? সে-বইটি বাজেয়াপ্ত করা হয়নি। সে-বই এবং তার লেখককে ব্রিটিশ সরকার একেবারে ধ্বংস করে ফেলে।

পরের দিন সকালে সাত্যকি খলিলের দোকানে গেল। তখনও খলিলের দোকান খোলেনি।

সাত্যকি ভাবল, একটু অপেক্ষা করা যাক। খলিল নিশ্চয়ই এগারোটার মধ্যে দোকান খুলবে। ট্রাম-রাস্তা পেরিয়ে সে কফি হাউসে চলে এল।

দোতলায় ডান দিকের জানলার ধারে বসে সে সিগারেট ধরাল। হাতছানি দিয়ে ওয়েটারকে ডেকে কফির অর্ডার দিল। কফিহাউসে সাত্যকির একটা স্থায়ী আড্ডা আছে। আজ সে চেনাশোনা তেমন কাউকে দেখতে পেল না। একদিক দিয়ে এটা তার পক্ষে ভাল হয়েছে। সাত্যকি আজ একটু একা থাকতে চায়। খলিল ও গিরিশবাবু ছাড়া সে অন্য কোনও সঙ্গ কামনা করছে না।

কফি এসে গেল। কফিতে চুমুক দিয়ে সাত্যকি ঠিক করে নিল খলিলের সঙ্গে দেখা করে একবার গিরিশবাবুর কাছে যাবে।

কফি খেতে-খেতে সে দরজার দিকে তাকাচ্ছিল। একসময় দেখতে পেল খলিল ঢুকছে। কফিহাউসে ঢুকে খলিল এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছিল। সাত্যকির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হাসতে-হাসতে এগিয়ে এল।

"শুনলুম একটু আগে আপনি দোকানে গিয়েছিলেন।"

"কার কাছে শুনলে?"

"মহাদেব বলল।"

"হ্যাঁ, তখন মহাদেব দোকান খুলেছিল বটে।"

চেয়ার টেনে খলিল বসল। খলিলের চেহারা আজ একেবারে অন্যরকম। কাল রাতে সে যখন সাত্যকির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল তখন তাকে চিন্তিত উদ্‌ভ্রান্ত মনে হয়েছিল। আজ ঠিক উলটো।

সাত্যকি বলল, "দাঁড়াও, আগে তোমার জন্যে কফি বলি।" সাত্যকি আবার ওয়েটারকে ডাকল। কফির অর্ডার দিল।

কফি এসে গেল। কফিতে পরম পরিতৃপ্তিতে চুমুক দিয়ে খলিল বলল, "আপনার টাকাটা এনেছি।"

সাত্যকি অবাক হল, "আমার টাকা?"

"হ্যাঁ, আপনার কালকের সেই একশোটা টাকা।"

"কিন্তু বই তো এখনও পাইনি। সে বই গিরিশবাবুর কাছে। আর সে-বই তুমি ফেরত পাবে না খলিল।"

খলিল মুচকি-মুচকি হাসছিল। হাসতে হাসতে বলল, "সে বই যার পাওয়ার কথা বোধহয় সে পেয়ে গেছে দত্তবাবু।"

সাত্যকি অবাক হয়ে খলিলের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি তো তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।" খলিল বিজ্ঞের মতো হাসল। তারপর বলল, "ব্যাপারটা তা হলে গোড়া থেকেই বলি।" সাত্যকি আবার একটা সিগারেট ধরাল।

খলিল বলল, "একটা সামান্য বই কেন যে একশো টাকা দিয়ে শেষ পর্যন্ত আপনি কিনে

নিলেন, তা মাথায় ঢোকেনি। আপনি চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে একটা কালো রঙের বিরাট গাড়ি এসে আমার দোকানের সামনে থামল। গাড়ি থেকে কে নামলেন জানেন? সেই ভদ্রলোক। যিনি এক ডজন বই বেচবার জন্যে আমায় দিয়ে গিয়েছিলেন। ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে গাড়ি থেকে নেমে আমার কাছে ছুটে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার বইগুলো বিক্রি করেছ নাকি?' আমি বললাম, 'ওগুলোর মধ্যে কেবল ব্যোমকেশ শীলের আত্মকথাটাই শুধু বিক্রি হয়েছে।' ওমা, আমার কথা শুনে ভদ্রলোক কপাল চাপড়াতে লাগলেন! আর বলতে লাগলেন, ইস্, ইস্। ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হল বাবু। কোনও দোষ করলাম নাকি?' উনি হায় হায় করে উঠলেন। বললেন, ওই বইটা নাকি উনি অনেক কষ্ট করে যোগাড় করেছেন। মোটে দু' দিন হল বইটা ওঁর হাতে এসেছে। ওটা নাকি ভারী দামি বই। ও বই বিক্রি করার কথা নাকি উনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। সত্যি কথা বলতে কী, ভদ্রলোককে দেখে ভারী মায়া হচ্ছিল। উনি একটা বাচ্চা ছেলের মতন নিজের মাথার চুল ধরে নিজেই টানছিলেন। বিশ্বাস করুন দত্তবাবু, অতবড় মানুষটার চোখ জলে ভরে গেছে দেখলাম।" খলিল থামল।

সাত্যকি জিজ্ঞেস করল, "তারপর?"

"তারপর ভদ্রলোক একটু সামলে নিয়ে আমার দিকে তাকালেন। দেখলাম ভদ্রলোকের চোখ জবা ফুলের মতন লাল। তখন উনি জিজ্ঞেস করলেন, বইটা যিনি কিনেছেন তাঁকে আমি চিনি কি না। আমি বললাম, ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার অনেকদিনের কারবার। দত্তবাবু ভারী ভাল লোক। তাঁর বাড়িও আমি চিনি। উনি তক্ষুনি আমাকে ওঁর গাড়িতে তুলে নিলেন। পাশের দোকানের মহাদেবকে বলে আমি ওঁর গাড়িতে করে আপনার বাড়িতে গেলাম। আপনি তখন বাড়িতে ছিলেন না। আপনাদের বাড়িতে যে লোকটা কাজ করে সে বলল, আপনি নাকি বাড়িতে বলে গেছেন পটলডাঙায় গিরিশ চক্রবর্তীর বাড়ি যাচ্ছেন।" খলিল থামল।

সাত্যকি বলল, "হ্যাঁ, তোমার দোকান থেকে আমি কিছুক্ষণের জন্যে বাড়ি গিয়েছিলাম। আচ্ছা, তারপর?"

"তারপর আর কী বাবু। আপনার কাজের লোকের মুখে এই কথা শুনে ভদ্রলোক আমাকে বললেন, 'তুমি এখানে অপেক্ষা করো। দত্তবাবু এলে বইটা নিয়ে ফিরবে। কাল সকালে তোমার বাড়িতে যাব।' উনি আমার ঠিকানা নিলেন। তখন বললাম, 'স্যার, আমাদের বস্তির ভেতরে আপনার অত বড় গাড়ি ঢুকবে না।"

খলিল থামল। একটু থেমে আবার কথা শুরু করল, "আজ সকালবেলায় ভদ্রলোক আমার বাসায় এসেছিলেন। আমি তখন বেরোচ্ছি। ওয়েলিংটনে গোপালবাবুর কাছে কিছু বই এসেছে সেখানে যাচ্ছিলাম। ভদ্রলোককে দেখে মনে পড়ল উনি সকালে আসবেন বলেছিলেন। তবে এত সকালে আসবেন ভাবতে পারিনি। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ভদ্রলোক এসে প্রথমেই আমার হাতে একশোটা টাকা দিলেন। বললাম, কী ব্যাপার? উনি মুচকি হাসলেন। আমি বললাম, সে বই এখনও জোগাড় করতে পারিনি। উনি আবার মুচকি হাসলেন। চলে গেলেন। বড় রাস্তায় ওঁর

গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। আমিও ওয়েলিংটন চলে গেলাম। গোপালবাবুর সঙ্গে কথাটথা বলে সোজা এই দোকানে আসছি।"

সাত্যকি লাফ দিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠল। খলিল অবাক।

"কী হল দত্তবাবু?"

"আমায় এক্ষুনি গিরিশবাবুর কাছে যেতে হবে।"

"আপনার টাকাটা?"

"সে পরে হবে। তুমি বরং কফির দামটা দিয়ে দিও।"

৪

সাত্যকিকে দেখে গিরিশবাবু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। গিরিশবাবুর পাশে বসে সাত্যকি বলল, "জানি, বইটা চুরি গিয়েছে তো।" গিরিশবাবু মাথা নিচু করে বললেন, "হ্যাঁ সাত্যকি। বইটা একরকম ডাকাতি করে নিয়ে গেল।"

"কীরকম?"

"কাল রাত্তিরে তুমি চলে যাবার মিনিট-দশেক বাদেই ঘটনাটি ঘটে। তুমি তো জানো একতলায় আমি একা থাকি। সদর দরজাটা সারাদিন খোলা থাকে। রাত্তিরবেলায় বাড়িঅলা সদরে তালা দেন। বইটা হাতে পেয়ে এত অভিভূত হয়ে গিয়েছিলুম যে, কী বলব। বইটা নিয়ে মগ্ন ছিলুম, হঠাৎ শুনলুম একটা রাশভারী গলা। গিরিশবাবু, বইটা আমার। ওটা ফেরত দিন। চোখ তুলে চমকে তাকালুম। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক। হাতে রিভলভার। আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। ভদ্রলোক এগিয়ে এসে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। বাঁ হাতে বন্দুক। বুড়ো মানুষ তায় আবার হাঁপানি রুগি। বইটা এগিয়ে দিতে হল। ভদ্রলোক বইটি হাতে নিয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন।"

গিরিশ চক্রবর্তী থামলেন।

সাত্যকি বলল, "আপনার জন্যে কষ্ট হচ্ছে। যাক, আপনি আর এ নিয়ে দুঃখ করবেন না। ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন। মাস্টারজির ওই মারাত্মক বই এখন কোন কাজে লাগবে? এখন ভাবছি ওই বই যাদের হাতে পড়ল তাদের কথা।"

গিরিশবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, "লোকটা কে?"

সাত্যকি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "সেটাই রহস্যে থেকে গেল।"

বৃদ্ধ গিরিশ চক্রবর্তী এবার বিড়বিড় করে বললেন, 'ছোটকাকার অনুরোধ আর রক্ষা করা হল না।"

সাত্যকি গিরিশবাবুর মুখের দিকে তাকাল। আজও তাঁর চোখের কোণে অশ্রু চিকচিক করছে। কালকের অশ্রু ছিল আনন্দের। বই পাওয়ার। আজ দুঃখের। বই হারানোর।

সাত্যকি বলল, "পঞ্চাশ বছর ধরে বইটি খুঁজতে আপনি কম চেষ্টা করেননি। আর শেষ পর্যন্ত সে-বই আপনার হাতেও এসেছিল। এখন অবশ্য হাতছাড়া হয়ে গেল। সে-দোষ তো আপনার নয়।"

দুপুরবেলায় আবার খলিল এসে হাজির। সেই সময় সাত্যকি বাড়িতেই ছিল। খলিল জিজ্ঞেস করল, "সব শুনেছেন তো ?"

সাত্যকি মাথা নেড়ে বলল, "না। সব বলতে ?"

খলিল সাত্যকির দিকে মুখ তুলে বলল, "বেরোচ্ছিলেন বুঝি ?"

সাত্যকি বলল, "হ্যাঁ, কলেজ স্ট্রিটেই যাচ্ছি। চলো, হাঁটতে হাঁটতে তোমার কথা শোনা যাবে।"

"এত কাণ্ড, সব শেষ হয়ে গেল দত্তবাবু। আহা, অমন শক্ত-সমর্থ মানুষটা একেবারে শেষ। শেষ বলে শেষ ?"

সাত্যকি খলিলের পাশাপাশি হাঁটছিল। এবার দাঁড়িয়ে পড়ল, "তুমি কার কথা বলছ ?"

"আজ্ঞে, সেই বাবুর কথা। আজ সকাল বেলায় আমার বাড়ি বয়ে যিনি একশোটা টাকা দিয়ে গেলেন। আপনি মনুকে চেনেন না আমার পাশের ঘরে থাকে। চৌধুরী গ্যারেজে কাজ করে। মনু তো গাড়িটা দেখেছিল। গাড়িটা নাকি খুব পুরনো দিনের। কলকাতায় ওরকম স্টুডিবেকার বেশি নেই। হ্যাঁ বাবু, মনু গাড়ির নম্বরও মুখস্থ রেখেছিল। একটু আগে মনু দোকানে এসে বলে গেল, খলিল, তোমার সেই রাজাবাবু জন্মের মতো চলে গেল। অ্যাক্সিডেণ্ট বলে অ্যাক্সিডেণ্ট ! আমাকে টাকা দিয়ে চলে তো গেলেন। যাওয়ার সময়ই স্ট্র্যাণ্ড রোডে একেবারে ট্রাকের মুখোমুখি। গাড়িটায় আগুন ধরে গিয়েছিল।"

খলিল থামল।

সাত্যকি বলল, "এই খবরটা দিতেই ছুটে এসেছ ?"

খলিল হেসে বলল, "ঠিক তা নয়। আপনার টাকাটা দিতে এসেছি।" খলিল সাত্যকির দিকে একটা একশো টাকার নোট এগিয়ে দিল।

সাত্যকি বলল, "একশো নয়, সাতানব্বই টাকা কুড়ি পয়সা। দু'টাকা আশি কফির দাম।"

খরেশবাবুর ইচ্ছে ছিল তাঁর চৌত্রিশ বছরের ফ্রিজটাকে তিনশো পঞ্চান্ন টাকায় বিক্রি করে দেওয়ার। দিব্যি ফ্রিজটা ছিল। বড়-বড় ট্রেতে বরফ জমে যেত আধ ঘণ্টায়, আর বহুক্ষণ লোডশেডিং-এর পরও টাটকা থাকত ভেতরের জিনিসপত্র। তবে হ্যাঁ, ফ্রিজটার একটু-আধটু দোষও ছিল। এমনিতে চুপচাপই চলত, কোনও আওয়াজ দূর থেকে শোনা যেত না, কেবল কাছে গেলে মনে হত ফ্রিজের ভেতর দুটো বেড়াল আরামে ঘর্-র-র ঘর্-র-র করছে! এটা ত্রুটি বোধ হয় না। তবে খরেশবাবুর মনে পড়ে, তাঁর ছোটবেলায় যখন এই ফ্রিজটা সবে কেনা হয়েছিল এক সাহেবের কাছ থেকে, তখন ফ্রিজের ভেতর থেকে মাত্র একটা বেড়ালের ঘর্-র-র ঘর্-র-র শোনা যেত। সাহেবও ফ্রিজটাকে বেশ কয়েকবছর রীতিমত ব্যবহার করেছিলেন বিক্রি করে দেওয়ার আগে। বিক্রিও তাঁর করার ইচ্ছে ছিল না। বেশ বয়স হয়ে গেলেও দেশে ফেরার ইচ্ছে তাঁর ছিল না। এই দেশটাকে তিনি ভালবেসে ছিলেন, কিন্তু তাঁর মেমসাহেবের আর সহ্য হচ্ছিল না এ-দেশ। তিনি বলেছিলেন, গরম তো সহ্য করা যায়, কিন্তু এত মশা, ছারপোকা, আরশোলা, উই, ইঁদুর, পিঁপড়ে, এসব সাপ, কিছু আর সহ্য হয় না। ক্রমশ তাঁদের মেশবার মতো লোকজনও কমে যেতে লাগল। তখন সাহেব কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তাঁর বাড়ির যাবতীয় জিনিসপত্র বিক্রি করে দিলেন। এই সাহেবের সঙ্গে খরেশবাবুর বাবার খুব হৃদ্যতা ছিল, সেজন্য ফ্রিজটা তিনি তাঁকে প্রায় উপহারই দিয়ে দিয়েছিলেন, নইলে সে-সময়ে ফ্রিজ কেনার সামর্থ্য ছিল না খরেশবাবুর বাবার।

কিন্তু সেসব কথা এখন বিশদ করে বলার দরকার নেই। আসল কথা হল, গত চৌত্রিশ বছর ধরে একনাগাড়ে চলছে এই ফ্রিজটি। কত হাজার-হাজার কেজি মাছ, কত মাখন, কত মাংস, কত সবজি এর মধ্যে ঢুকেছে, বেরিয়েছে। কত টন বরফই না তৈরি হয়েছে। কত শরবত তারা খেয়েছেন, কত শরবত কত লোককে খাইয়েছেন। সত্যি, এমন ফ্রিজের কথা এক কলমে লেখা যায় না।

অথচ এমন ফ্রিজটাকেই কিনা শেষ পর্যন্ত বিক্রিই করে দিতে হল, তাও কিনা মাত্র তিনশো পঞ্চান্ন টাকায়। খরেশবাবু যে ফ্রিজটিকে রাখতে পারবেন না বেশীদিন, সেটা তিনি মনে-মনে যেন বুঝতে পারছিলেন। প্রথমে তাঁর স্ত্রী, এমনিতে বেশ ভালমানুষ, কিন্তু বছর দুয়েক আগে তিনি হঠাৎ সকালে টোস্ট করতে-করতে বললেন "কাল দুপুরে একটা কাণ্ড হয়েছিল জানো ?"

"কী কাণ্ড ?" খরেশবাবু প্রশ্ন করেছিলেন।

"অদ্ভুত কাণ্ড। দুপুরে ঘরে শুয়ে পাখা চালিয়ে ঘুমোচ্ছি, হঠাৎ মনে হল কে যেন পাশের ঘর থেকে চিৎকার করে উঠল। তা সে কুকুরও হতে পারে, মানুষও হতে পারে। হঠাৎ আওয়াজ হল, হুঁ-উঁ-উঁ। হুঁ-উঁ-উঁ। আমি তো চমকে উঠলাম। কী ব্যাপার বুঝতে পারলাম না পাশের ঘরে গিয়ে সব জায়গা দেখলাম, কিন্তু কোথাও কিছু নেই। তখন আমার মনে হল, হয়তো বাইরে রাস্তায় কোনও কুকুর ডেকে উঠেছিল। এ ছাড়া আর কিছুই তখন মনে হল না। যাই হোক মনটায় কীরকম যেন হতে লাগল, কেননা, আমি স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলাম যেন পাশের ঘরেই ব্যাপারটা ঘটেছে।

খরেশবাবু টোস্টে এক কামড় দিয়ে বললেন, "ওরকম হয়। হতেই পারে। মনের গতি-প্রকৃতি অতি বিচিত্র। একবার আমাদের আপিসের বটুকের কি হয়েছিল, শোনো। একদিন সে ঘুমিয়ে ছিল, তার মনে হল তার বড়মামা, যেন কাছে এসে বসে-বসে তার মাথার হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আর বলছেন, এতো ঘুমোনো কি ভাল বটুক ? ধড়মড় করে সে উঠে বসল, চারদিকে তাকিয়ে দেখল বিকট অন্ধকার কোনও আর আওয়াজ নেই, কেবল তাঁর পাশে-রাখা হাতঘড়ি থেকে টিকটিক আওয়াজ হচ্ছে! এই ঘড়ির আওয়াজ কখনওই কানের পাশে না নিলে শোনা যায় না, অথচ প্রায় পৌনে এক মিটার দূর থেকে আওয়াজ আসছে! তাড়াতাড়ি বটুক করল কী জানো ? সুইচ টিপে আলো জ্বালল। দেখল ঘড়িতে তখন তিনটে বেজে কুড়ি মিনিট হয়ে তেত্রিশ সেকেণ্ড। বটুকের মনে পড়ল তার বড়মামার সাঙ্ঘাতিক অসুখ তখন, বাঁচেন কি মরেন ঠিক নেই। পেটের কী একটা অস্ত্রোপচারের পর তিনি নার্সিং হোমে রয়েছেন। বটুক হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তার স্ত্রী তখন বটুকের মামাবাড়িতে রয়েছে বড়মামাকে দেখাশোনার সুবিধের জন্য। তখন বটুক টেলিফোন করল নার্সিংহোমে। সেখান থেকে জানা গেল··· ।"

বাধা দিয়ে খরেশবাবুর স্ত্রী বললেন, "বটুকের বড়মামা রাত তিনটে বেজে কুড়ি মিনিট হয়ে তেত্রিশ সেকেণ্ডের কাছাকাছি সময়ে মারা গেছেন ?"

"না।" খরেশবাবু বললেন, "বটুক টেলিফোন করে জানতে পারল তার বড়মামা খুবই ভাল আছেন। যে মারাত্মক বিপদের আশঙ্কা ছিল সেটা কেটে গেছে! পরদিনই বটুকের স্ত্রী ফিরে এল বাড়িতে।"

একটু বোধ হয় হতাশই হলের খরেশবাবুর স্ত্রী। তিনি বললেন, "অনেক গল্পে এরকম ঘটনা দেখা যায়··· ।"

খরেশবাবু বললেন, "এই গল্পে তোমার পছন্দমতো ঘটনা ঘটেনি, তার কারণ এটি গল্প নয়,

সত্যি ঘটনা। আসলে মনের যে কতরকম ভুল হতে পারে এ নিয়ে অনেক গবেষণাও হয়েছে, বইটইও কম লেখা হয়নি, বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা করে দেখেছেন মনের মধ্যে অর্থহীন মনে হয়, মনে হয়, এমন নানারকম ঘটনা ঘটে···যাই হোক, তোমার হয়েছিল কী জানো, আমার মনে হয় কোনও স্বপ্ন-টপ্ন হয়তো দেখেছিলে, কোনও কুকুর হয়তো ছুটছিল, কেউ কুকুরকে ঢিল মারছিল, কিম্বা অন্য কোনও কারণে চিৎকার করে উঠেছিল হুঁ-উঁ-উঁ, হুঁ-উঁ-উঁ করে!

খরেশবাবু বললেন, "কুকুর হুঁ-উঁ-উঁ করে চিৎকার করে নাকি?"

খরেশবাবু বললেন, "তবে যে তুমি বললে কুকুর ডেকেছিল ওইরকমভাবে?"

খরেশবাবুর স্ত্রী বললেন, "বাঃ, আমি তো প্রথমেই বলেছিলাম কুকুরও হতে পারে, মানুষও হতে পারে, কী, বলিনি?"

খরেশবাবু এর উত্তর কী দেবেন, চট করে বুঝতে পারলেন না। তাঁর স্ত্রীই তো বলেছেন কুকুরও হতে পারে, মানুষও হতে পারে। তা কুকুর হলে তো সবটাই কুকুরের কাজই তো হবে? তা সে-কথা বলে তিনি তো অন্যায় কিছু করেননি। তা ছাড়া কুকুরই তো হওয়া সম্ভব। পাশের ঘরে মানুষ ঘোরদুপুরে আসবে কোত্থেকে? তখন ছেলে-মেয়েরা কেউ কলেজে, কেউ ইস্কুলে, তবে? আবার তক্ষুনি তাঁর মনে হল, কুকুরই-বা পাশের ঘরে ঢুকবে কোত্থেকে, এই দোতলার ফ্ল্যাটে? তিনি তখন বললেন, "দ্যাখো বিনু, (ওঁর স্ত্রীর নাম বিনতা) কুকুরও নয়, মানুষও নয় —কেন না পাশের ঘরে বাইরের মানুষ কিংবা কুকুর কেউই আসতে পারে না। অতএব ওটা তোমার মনের ভুলের ব্যাপার।"

বিনতা কী উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঠিক সেইসময় পাশের ঘর থেকে আওয়াজ এল হ্যাঁ-উঁ-মু! হ্যাঁ-উঁ-মু! ঘ্র্যাঁক্ ঘ্র্যাঁক্! ওঁরা দুজনেই পাশের ঘরে গেলেন, কিন্তু কোনও জন্তু-জানোয়ার কিংবা মানুষ কিছুই দেখতে পেলেন না।

ওঁরা অবাক হয়ে ভাবছেন কী হতে পারে। হঠাৎ এবার একেবারে যেন কানের পাশ থেকে আওয়াজ এল।

"ওঁমা!" বিনতা বললেন, "আওয়াজ হচ্ছে ফ্রিজের ভেতর থেকে! কী সাঙ্ঘাতিক আওয়াজ!"

আওয়াজ কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে থেমে গেল। আর আওয়াজ নেই। খরেশবাবু বললেন, "বুঝলে বিনু, ফ্রিজের বারোটা বেজে আসছে। আর ওরই বা দোষ কী, বোধ হয় পঞ্চাশ বছর প্রায় এক নাগাড়ে সার্ভিস দিয়েছে। কয়েকবার অবশ্য ছুটিতে বেড়াতে যাওয়ার সময় ফ্রিজ বন্ধ রাখা হয়েছে, তাও চৌত্রিশ বছরে পাঁচশো দিনের বেশি নয়। আর দু'বার তো রং করাতে নিয়ে গিয়েছিল। এতদিন কোনও ফ্রিজ টিকে থাকার তো কথাই নয়। নেহাত পুরনো দিনের তৈরি, তখনকার দিনে খেলো মাল দিয়ে জিনিস করত না বিশেষ কেউ, সেইজন্যই এতদিন গেল। এবারে একটা ভালমতো ফ্রিজ কিনে ফেলতে হবে দেখেশুনে।

কিন্তু কথাটা তাঁরা ভুলে গেলেন, কেননা ফ্রিজ থেকে মাসখানেক কোনও অমানুষিক

আওয়াজই হল না। তবে খরেশবাবুর একদিন মনে হল, ফ্রিজের মধ্যে এখন আর দুটো নয়, গোটাচারেক বেড়াল ঘর্-র-র ঘর্-র-র করছে। তবে তাও সর্বদা নয়, মাঝে-মাঝে। তিনি ভাবলেন, থাকগে, কী আর করা যাবে। যতদিন চলে চলুক। এর আসল কাজ তো করে চলেছে। দুম করে বন্ধ-টন্ধ হয়ে গেলে তখন দেখা যাবে।

এইভাবে চলছে। একদিন বাড়িতে অতিথি-সমাগম হয়েছে। খরেশবাবুর বড়মামা ভবেশ তাঁদের বাড়িতে এসেছেন, খরেশবাবুর ছেলে বিনয়ের জন্মদিনে কী একটা কাজে আসতে পারেননি। ওঁর সঙ্গে এসেছেন বড়মামি, মামাতো ভাই দু'জন, আর তাদের স্ত্রী। বেশ ভাল-ভাল রান্না হয়েছে। সকলে খেতে বসেছেন, রাত তখন সাড়ে-আটটা। হঠাৎ ফ্রিজ থেকে আওয়াজ হল, ভুঁ-কুঁকুঁ-ঘ্যাঁ-ঘ্যাঁ, ঘ্যাং-ঘ্যাং-ঘঙাস !! আর সে কী আওয়াজ। মনে হল যেন হঠাৎ ভূমিকম্প শুরু হয়েছে এবং চতুর্দিকে বাড়িঘর সব ভেঙে পড়ছে। ভবেশ তো ওই আওয়াজ শুনেই চোখ উলটে একেবারে অজ্ঞান। তাঁকে সব ধরাধরি করে পাশের ঘরের খাটে শুইয়ে দেওয়া হল। আধঘণ্টা খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠল। তারপর ডাক্তার, ইনজেকশন ইত্যাদির পর ভবেশ সুস্থ হলেন। এরপরে খাওয়া-দাওয়া সবই হল, কিন্তু কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে গেল। শচীনদেব বর্মনের গান শোনাবে বলে বিনয় একটা ক্যাসেট কিনে এনেছিল, সেটা বাজানোই হল না। তা ছাড়া, একটা উপহার এনেছিলেন ভবেশ, সেটা না-খোলা অবস্থাতেই পড়ে রইল।

অতিথিরা চলে গেলে খরেশবাবু বললেন, "নাঃ, এই ফ্রিজটাকে বিদেয় করতেই হবে। আর সহ্য করা যাচ্ছে না। দিন-দিন এর নানা ইয়ার্কির শখ হচ্ছে। দেখাব মজাখানা।"

বিনতা বললেন, "তোমার যেমন কথা—এত ভাল ফ্রিজ, একে বিদেয় করার কোনও দরকার নেই। বোধ হয় কিছু যন্ত্রের ত্রুটি হচ্ছে, তা মেরামত করে আনলেই তো হয়ে যায়।"

কথাটা আগে মনে হয়নি। সত্যি তো মেরামত করে নেওয়াই তো ভাল। সামান্য ত্রুটি, মেরামত করতে বা কতই-লাগবে। একটা বড় ফ্রিজ-মেরামতি কারখানা থেকে ছোকরা এক মেকানিক এসে ওই ফ্রিজ দেখে তো ভিরমি খাবার জোগাড়! তারপর আস্তে-আস্তে ভিরমির ভাবটা কেটে গেলে, তার হাসি শুরু হল। সে ফ্রিজের সামনে বসে-বসে কেবলই বলতে লাগল, "এ ফ্রিজ এখনও চলে?" তারপরই হাসতে লাগল হা-হা-হা-হা-হ্যা-হ্যা করে। প্রায় সাত-আট মিনিট ধরে সে হাসল, তারপর গম্ভীর হয়ে ফ্রিজের কলকব্জা পরীক্ষা করে বলল, "এর নানা ত্রুটি। দশটা অংশ ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হয়ে গেছে প্রায়। এগুলিকে বদলাতে হবে।"

"বেশ তো।" খরেশবাবু বললেন, "বদলে দাও তা হলে।"

এবার আবার হাসতে শুরু করল মেকানিক। হা-হা, হি-হি, হ্যা-হ্যা। তারপর হাসিটা জোর করে থামিয়ে বলল, "বুঝলেন দাদা, হল্যাণ্ডে তৈরি ফ্রিজের যন্ত্রাংশ এদেশে পাওয়া যাবে না।"

"তা হলে হল্যাণ্ড থেকে আনার জন্য অর্ডার দিয়ে দেওয়া যাবে তো?"

"না।"

খরেশবাবু বললেন, "কেন?"

মেকানিক বলল, ‘‘এসব যন্ত্রাংশ এ-দেশেও নেই, ও-দেশেও নেই। এরকম ফ্রিজ ওদের দেশে রাস্তায় ফেলে দেয়। ত্রিশ বছর আগেই এই মডেল তৈরি ওরা বন্ধ করেছে। তবে হ্যাঁ, একবার চেষ্টা করা যেতে পারে। যদি এ-দেশে কারও বাড়িতে ফেলে দেওয়ার মতো এই মডেলের ফ্রিজ থাকে সেটা থেকে যন্ত্রাংশ খুলে নিয়ে একটা-কিছু হয়তো করা যায়। তবে ওসবের দরকার কী, আজকাল চমৎকার-চমৎকার সব ফ্রিজ বেরিয়েছে; সেগুলিতে কত সুবিধে। এ-ফ্রিজে দশটা ডিম রাখার জায়গা আছে, নতুন একটা ফ্রিজ বেরিয়েছে সেটাতে রাখা যায় ত্রিশটা ডিম।

‘‘ত্রিশটা ডিম?’’ একটু দূরে দাঁড়িয়ে বিনতা কথাটা শুনে ফেলেছিলেন। তিনি আবারও বললেন, ‘‘ত্রিশটা ডিম?’’

মেকানিক বলল, ‘‘হ্যাঁ, ম্যাডাম, ত্রিশটা ডিম সুন্দর করে রাখার সুবন্দোবস্ত আছে।’’

মেকানিক কেবল বাড়িতে আসার জন্য এবং তার হিতোপদেশ দেওয়ার জন্য পঞ্চাশ টাকা পকেটে পুরে শেয়ালের মতো হাসতে-হাসতে চলে গেল। সে চলে যেতেই বিনতা বললেন, ‘‘এ-ফ্রিজ বেচে দিতেই হবে, সত্যি একটা ফ্রিজে ত্রিশটা ডিম রাখার জায়গা, সেটাই কিনতে হবে।’’ খরেশবাবু বললেন, ‘‘দেখা যাক দাম-টাম কত। একটা ফ্রিজ কেনা তো সোজা কথা নয়, অনেক টাকার ধাক্কা।’’

ছেলে বিনয় কলেজে পড়ে, তার মাথায় অনেক বুদ্ধি গজগজ করে। সে বলল, ‘‘যে জিনিস ঘরে-ঘরে আছে, তার দাম খুব বেশি হতেই পারে না।’’

ইস্কুলে নীচের ক্লাসে পড়ে নমিতা। সে বলল, ‘‘নতুন ফ্রিজের গোলাপি রং হলে তবে বেশ মানাবে তার শাড়ির সঙ্গে।’’ বিনয় বলল, ‘‘কী বোকা রে তুই। ফ্রিজের রং কক্ষনো সাদা ছাড়া হতে নেই, জানিস? সমস্ত ফার্নিচার আর দেওয়ালের সঙ্গে একটি রং-ই মানায়।’’

বিনতা বললেন, ‘‘বোম্বাইয়ের এক সিনেমা অভিনেত্রীর বাড়িতে একটা ফ্রিজ আছে ‘সেটার রং রামধনুর মতো, আঃ, সে যে কী চমৎকার। আর কত বড়!’’

‘‘তুমি দেখেছ নাকি ওই ফ্রিজ?’’ খরেশবাবু প্রশ্ন করলেন।

‘‘দেখেছি।’’ বিনতা বললেন, ‘‘সেদিন মাধুরীদের বাড়িতে একটা সিনেমা পত্রিকায় দেখেছি।’’

‘‘ক’টা ডিম রাখবার জায়গা আছে ওটায়?’’ নমিতা প্রশ্ন করল।

‘‘তা তো পড়িনি।’’ বিনতা বললেন, ‘‘বোধ হয় সেটা লিখতে ভুলে গেছে।’’

খরেশবাবু বললেন, ‘‘তা হলে আর কী লাভ হল, ক’টা ডিম রাখবার জায়গা আছে সেটা জানা ছিল খুব জরুরি। খুবই জরুরি।’’

॥ ২ ॥

এইভাবে দিন কাটে। কিন্তু ফ্রিজ আর কেনা হয় না। এর মধ্যে একদিন বিনয় কোনও এক দোকানে গিয়ে দেখে এসেছে নতুন ফ্রিজটি, যেটাতে ত্রিশটা ডিম রাখার জায়গা আছে। কেবল দেখে এসেছে তা নয়, দামদরও জেনে এসেছে। প্রথমে দু’ হাজার টাকা দিতে হবে, তারপর দশ মাস

ধরে দিতে হবে প্রতিমাসে ছ'শো টাকা। ব্যস, তারপর আর টাকা দিতে হবে না। সে হিসেব করে করে জানাল, বাড়িতে ফ্রি ডেলিভারি আর সঙ্গে একটা দু' লিটারের প্রেশার কুকার ফ্রি! সেটা অবশ্য দেবে এই মাসের মধ্যে কিনলে, তবেই।

খরেশবাবু বললেন, "তা না হয় হল, কিন্তু নতুন ফ্রিজ আনবার আগে এই পুরনো ফ্রিজটাকে তো বিদায় করতে হবে।"

"না!" নমিতা বলল, "এ-ফ্রিজ বিদায় নেবে না। কিছুতেই না। এটাও থাকবে।" তারপর দৃঢ়ভাবে বলল, "এটা থাকবেই।"

"তার তো কোনও মানে হয় না।" বিনতা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, "আসলে এই ফ্রিজটাকে চাই না বলেই তো আমরা নতুন ফ্রিজ কেনার কথা ভাবছি। এটা যদি রাখতেই হয় তা হলে তো নতুন ফ্রিজের দরকারই ছিল না।"

"না। দুটোই রাখব আমরা।" বলল নমিতা দৃঢ়ভাবে।

"কিন্তু জায়গাই তো হবে না।" খরেশবাবু বললেন, "এইটুকু বাড়ি, জিনিসে-জিনিসে ছয়লাপ। এই ফ্রিজটাকে সরালে তবেই না নতুনের জায়গা হবে?"

নমিতা এর উত্তরে কেবল কাঁদতে লাগল। চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

"কী আর করা যায়। থাক তা হলে এখন।" খরেশবাবু বললেন।

"তা হলে প্রেশার কুকারের কী হবে? এই মাসের মধ্যে যদি নতুন ফ্রিজ না কেনা হয়, তা হলে…।" বিনতা বলল।

খরেশবাবু বললেন, "সেটাও একটা কথা বটে। তবে গুরুতর ব্যাপার নয়। ফ্রিজের আওয়াজ ছাড়া আর তো কোনও গোলমাল নেই। থাক ওটা, যতদিন না একেবারে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। একটু সাবধানে থাকতে হবে। বড়মামার মতো ব্যাপার যাতে না ঘটে সেজন্য নতুন কেউ এলে সুইচটা অফ করে দিলেই হবে। তা ছাড়া রাত্তিরে বিদঘুটে আওয়াজ যাতে না হয় সেজন্য রাত্তিবেলা রোজই অফ করে রাখা যাবে। দেখা যাক কী হয়।

এইভাবে চলল প্রায় এক বছর। কোনওদিন আর বিকট আওয়াজ হল না। প্রাণ আছে বটে ফ্রিজটার। তবে একটা ব্যাপার মনে হতে লাগল, ফ্রিজের ভেতরের বেড়ালের ঘর্-র-র-ঘর্-র-র আওয়াজ বেশ বেড়েছে। মনে হয় অন্তত বারোটা বেড়াল আরামে ঘর্-র-র ঘর্-র-র করছে। একটু মনোযোগ দিয়ে শুনলে দিনের বেলাতেও পাশের ঘর থেকেও শোনা যায়। যাই হোক, এতদিন বিকট আওয়াজ না হওয়ার কারণ কী হতে পারে এ-নিয়ে খরেশবাবু ভাবলেন, ব্যাপারটা খুব সহজেই বোঝা যায়। এতদিন বেচারা ফ্রিজ বলতে গেলে বিশ্রামই পায়নি। চব্বিশ ঘণ্টাই চালু রাখা হয়েছে ফ্রিজ। এতে মোটর এবং অন্যান্য সব যন্ত্র ক্লান্ত হয়ে পড়ত। এখন রোজ কয়েক ঘণ্টা করে বিশ্রাম দেওয়ায় ফ্রিজটা বেশ সুস্থ আছে। মনে মনে ভাবলেন, ওর বিশ্রামের সময় আরও কিছু বাড়িয়ে দেবেন।

কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম ঘটে গেল। একদিন রাত আটটা থেকে বিদ্যুৎ ঘাটতির ফলে ওই অঞ্চলের বিদ্যুৎ গেল নিভে। এরকম চলল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। রাত দশটার পরে শুতে যাওয়ার সময় সব সুইচ অফ করা হলেও ফ্রিজের সুইচ অফ করতে ভুল হয়ে গেল। কেবল তাই নয়, খাওয়ার ঘরের দরজাটাতেও ছিটকিনি দিতে ভুল হয়ে গেল। তবে ওই ভুলটা প্রায়ই হয়। দোতলা বেয়ে আর চুরি করা সম্ভব নয়। এটাই ধারণা ছিল খরেশবাবুদের।

অথচ সে-দিনই চোর এল। পাশে কোথায় একটা বিরাট মই ছিল, সেটার সাহায্যে এক চোর বিদ্যুৎ বন্ধের সুযোগ নিয়ে রাত প্রায় একটার সময় নিঃশব্দে উঠে এল খরেশবাবুদের বাড়ির দোতলায়। এবং চোর খুশি হয়ে দেখল, খাওয়ার ঘরের দরজা খোলাই আছে! সে সন্তর্পণে ঢুকল ঘরটিতে। সে টর্চের সাহায্যে দেখতে চেষ্টা করল কী-কী নেওয়া যায়। কিন্তু তার ভাগ্য খারাপ ছিল—দুম করে সমস্ত পাড়ায় বিদ্যুৎ এসে গেল। আর ফ্রিজটা এতক্ষণ বিশ্রাম করেও অকস্মাৎ বলে উঠল, কুঁ-হুঁ-হোঁয়াক্, কুঁ-হুঁ-হোঁয়াক্! আর সে কী বিকট আওয়াজ! এর সঙ্গে আবার গোটা পনেরো বেড়ালের ঘর্-র-র ঘর্-র-র! চোর দিশেহারা হয়ে মনে-মনে ভাবল বুঝি চিড়িয়াখানা ভেঙে কুড়িটা বাঘ তাকে খেতে আসছে! ভয়ে বারান্দায় বেরোতে গিয়ে কিসে যেন ধাক্কা খেয়ে গিয়ে ফিজটার উপর দড়াম করে পড়ে কপালে চোট পেয়ে একেবারে অজ্ঞান।

॥ ৩ ॥

কপালে দারুণ চোট লেগেছিল চোরের। সে অজ্ঞান হয়েও ব্যথায় গোঙাতে লাগল। খরেশবাবু ভেতরে চোর ঢুকেছে বুঝতে পেরে প্রথমেই ফ্রিজের ঘরের দরজা সেঁটে বন্ধ এরে দিলেন। তারপর পড়শিদের সাহায্যে বিশাল মইটাকে সরানোর ব্যবস্থা হল। কে যেন পুলিশকে ফোনও করে দিয়েছিলেন। পড়শিরা পরামর্শ দিলেন পুলিশ এসে দরজা খুলবে, তার আগে নয়। চোরের হাতে আজকাল বোমা-পিস্তল থাকে, কী হয় বলা যায় না। গুলি-টুলি যদি খেতেই হয় তা হলে পুলিশই যাক, ওরা গুলি খাওয়ার জন্য টাকা পায়। তা ছাড়া, ওরা জানে কেমন করে সশস্ত্র লোকেদের মোলাকাত করতে হয়, কিংবা কেমন করে কাত করতে হয়!

কয়েক মিনিটের মধ্যে পুলিশ এসে পড়ল। একজন অফিসার সমেত ছ'জন পুলিশ, তার মধ্যে দু'জনের হাতে রাইফেল, আর পুলিশ অফিসারের কোমরে একটা বিদঘুটে রকম বড় আকারের রিভলভার। পুলিশ-অফিসার ফ্রিজের ঘরের দরজার সামনে এসে হুঙ্কার দিলেন, "যে আছ ভেতরে বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো! মাথার উপরে দু' হাত তুলে দরজা খুলে বেরিয়ে এসো!"

চোর বেরিয়ে আসতে পারে দু' হাতে পিস্তল, রিভলভার নিয়ে কিংবা বোমা ছুঁড়তে-ছুঁড়তে এ-কথা ভেবে খরেশবাবু পুলিশ-অফিসারের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বিনতাকে বললেন, "তোমার এখানে থাকার দরকার নেই, ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে থাকো, কী হয় বলা যায় না।" বলতে বলতে তাঁর গলার স্বরও কেঁপে গেল। নীচের ফ্ল্যাটের গুঁইমশাই এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন,

এবারে তিনি গাঁইগুঁই করে হাত নেড়ে কী একটা অজুহাত দেখিয়ে দ্রুত বেগে পা চালিয়ে নীচে চলে গেলেন। আশপাশের বাড়ির জনাদশেক প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার আশায় এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু পুলিশ অফিসারের হুঙ্কার—মাথার উপর দু'হাত তুলে দরজা খুলে বেরিয়ে এসো। এই অসাধারণ একটা দৃশ্য দেখার সুযোগ পেয়েও কী মনে করে এক-একজন এক-একরকম কথা বলতে-বলতে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করলেন। রাস্তার ওপারে থাকেন রোগা টিংটিঙে খটখটে চেহারার এবং খিটখিটে মেজাজের ভবনাথবাবু। তাঁর হাতে ছিল ইয়া মোটা একটা বিরাট লাঠি। সেই লাঠি তিনি কেন এনেছিলেন বলা যায় না, সুন্দরবন অঞ্চলে ওইরকম লাঠি দিয়ে মোটামুটি হিংস্র একটা বাঘকে এক ঘায়ে মারার ক্ষমতা সে লাঠির ছিল, কিন্তু সে লাঠি মাথার উপর তোলার ক্ষমতা ভবনাথবাবুর ছিল বলে মনে হয় না। যাই হোক, তিনি বললেন এই চোরের অ্যারেস্ট হওয়ার খুব একটা সদিচ্ছা আছে বলে মনে হয় না। নিন, লাঠিটা কাছে রাখুন আমার আবার কাল সকালে একটা ইয়ে আছে, আজ আর থাকা সম্ভব নয় বলে লাঠিটাকে খরেশবাবুর হাতে ধরিয়ে দিলেন। খরেশবাবু লাঠিটাকে তুলতে গিয়ে দেখলেন বেজায় ভারী—আকার অনেকটা গদার মতো, বোধ হয় পুরনো আমলের খাটের পায়াকে মিস্ত্রি দিয়ে মসৃণ করা হয়েছে এই পর্যন্ত। তিনি লাঠিটা পেয়ে খুব একটা সাহস পেলেন বলে মনে হল না। যাই হোক, তিনি লাঠিটাকে কাছে রাখলেন। অন্যেরা সবাই নীচে দাঁড়িয়ে রইলেন মজা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য।

বিনয় এদিকে তার আলমারি খুলে ক্যামেরায় ফ্ল্যাশগান লাগিয়ে রেখেছে আর প্রস্তুত হয়ে আছে, চোর বেরোলেই খচাখচ ছবি তুলবে। আর সেই ছবি খবরের কাগজে ছাপবার কথাও তার মনে হল। নমিতা বলল, "দাদা, আমার একটা ঘুম-ঘুম চোখের ছবি তুলে দিবি?" বিনয় খ্যাঁক করে উঠে নমিতাকে তার ঘরের মধ্যে রেখে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। পুলিশ-অফিসারের এবার কড়া গলায় ধমক শোনা গেল, "এক দুই তিন বলার সঙ্গে-সঙ্গে দু' হাত তুলে দরজা খুলে বাইরে না এলে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকব।"

তারপর পুলিশ-অফিসার রিভলভার হাতে করে বললেন, "এক!"

কেউ দরজা খুলল না। খুলবে কোত্থেকে, আর কী করেই বা খুলবে, চোর তখন অজ্ঞান হয়ে নানারকম বিভীষিকাপূর্ণ দুঃস্বপ্ন দেখছে। মাঝে-মাঝে গোঁ-গোঁও করছে, কিন্তু আওয়াজ খুবই মৃদু। তার কপাল ফুলে থেঁতলে গেছে, বিন্দু-বিন্দু রক্তও পড়ছে।

তা ছাড়া, দরজা খোলার দরকারই ছিল না, কেননা দরজাটা খোলাই ছিল! কেবল ভেজানো ছিল বলে বাইরে থেকে মনে হচ্ছিল দরজা ভেতর থেকে বন্ধ!

"তিন!"

এবারেও কেউ দরজা খুলল না। পুলিশ-অফিসার আদেশ দিলেন, "দরজা ভাঙো!" দু'জন পুলিশ দরজায় কাঁধ দিয়ে একসঙ্গে ধাক্কা দিতে গিয়ে দরজা খুলে টাল সামলাতে না পেরে দুজনেই ধপাস করে পড়ে গেল মেঝের উপর। সে এক দৃশ্য, আর ঠিক সেই সময় ফ্রিজ থেকে

অমানুষিক আওয়াজ বেরোল ঘঁকোয়া, ঘঁকোয়া, ঘঁকোয়া, ঘ্র্যাং, ঘ্র্যাং! এই অপরূপ আওয়াজে পুলিশ-অফিসার এবং বাকি তিনজন পুলিশ এগিয়ে যেতে গিয়েও পিছিয়ে এলেন। অফিসার অন্যমনস্ক ছিলেন বলে পিছিয়ে যাওয়ার সময় কেমন করে আঙুলে চাপ পড়ে রিভলভারের ট্রিগারটি গেল টিপে, আর আওয়াজ হল দুম! ভাগ্যিস, প্রথম দুটো গুলি কেবল আওয়াজ করার গুলি ছিল, তাই কিছু হল না, নইলে এক অঘটন ঘটে যেতে পারত। এই সময়ে বিনয়ের ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বলে উঠল। কিন্তু চোর বা অন্য কেউ ঘর থেকে দু' হাত তুলে বেরিয়ে এল না। ফ্রিজের আওয়াজ তখন অবশ্য বন্ধ হয়ে গেছে।

॥ ৪ ॥

ঘরে ঢুকে দেখা গেল, একজন ফ্রিজের সামনে চিত হয়ে শুয়ে আছে। দু'জন পুলিশ গিয়ে তাকে ধরে ফেলল, তারপর তাকে বসিয়ে দিল। সে বসল বটে, কিন্তু তার মাথা কাঁধের উপর ঝুলে পড়ল। এবার তার মুখ দেখা গেল। বেশ খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, উসকোখুসকো চুল, কপালে কাটা দাগ। পুলিশ-অফিসার বললেন, "এই যে বাহাদুর! তিন-তিনটে খুন আর অন্তত আটটা চুরি আর তিনটে ডাকাতির জন্য একে আমরা অনেকদিন ধরে খুঁজছি। এর মাথার দাম দশ হাজার টাকা!"

মানে? এবারে দু-চারজন প্রতিবেশী যাঁরা মজা দেখার জন্য এতক্ষণ নীচে জটলা করছিলেন উঠে এসেছেন। পাড়ার বিনায়কবাবু বললেন, "যাক, এতদিনে একটা কাজের কাজ হল। ব্যাটাকে ধরার জন্য পুরস্কারটা নিশ্চয় খরেশবাবুই পাবেন, কেননা, উনিই বুদ্ধি করে দরজায় শেকলটা টেনে দিয়েছিলেন। তা খরেশবাবু, আপনার ওই পুরস্কার প্রাপ্তির পর ইতরজনদের কথা মনে রাখবেন তো।" তখন একজন কোত্থেকে ঘোঁত করে উঠে বললেন, "খরেশবাবু কী করেছেন, কেবল শেকল তুলে দিয়েছেন, ওটা একটা দুগ্ধপোষ্য বালকও পারে করতে। এই শর্মা না থাকলে টেলিফোন করত কে পুলিশকে!"

দেখা গেল যিনি বলছেন তিনি হচ্ছেন প্রকৃতিবাবু। বিনতা বললেন, "বাঃ, আমি তো চিৎকারটা শুনলাম, আর আমি আমার স্বামীকে জাগিয়ে দিলাম। আমি না জাগলে ওই চোর ধরা পড়ত নাকি? বিনতার কথায় প্রকৃতিবাবু কোথায় প্রকৃতিস্থ হবেন তা নয়, তিনি হুম হাম করে কতরকম কথাই না বলতে লাগলেন। যেসব কথার মধ্যে আবার অকৃতজ্ঞতা, বিশ্বাসঘাতকতা, কারও ভাল করতে নেই ইত্যাদি সব কারুকার্যখচিত বিশেষণ এবং অন্যরকম বাক্যসমূহ শোনা গেল। পুলিশ অফিসার বললেন, "আমাদেরও কৃতিত্ব কম নয়—আমরা যদি ঠিক সময় ঠিকমতো ব্যবস্থা না নিতাম তা হলে এই বাহাদুরকে ধরাই যেত না।"

বাহাদুরকে ধরার ব্যাপারে পুলিশ নিজের কাজের জন্য বাহাদুরি নেওয়াতে কেউ শক্ত কোন আপত্তি করলেন না। একজন কী আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন, অন্য একজন তাঁকে বললেন, 'ছেড়ে দিন মশাই, ছেড়ে দিন, জানেনই তো বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা! এর মধ্যে গোলমাল কমেছে, বিনয় নমিতার ঘরের দরজা খুলে দিয়েছে। সে বাইরে বেরিয়েই ওই কথাবার্তা শুনে বলছে, "আমি বাঘ দেখব, বাঘ দেখব, বাঘের ছোঁয়ার আঠারো ঘা দেখব।" কিন্তু তার কথায় কেউ বিশেষ পাত্তা দিলো না দেখে নমিতার ভারী অভিমান হল। সে ফোঁসফোঁস করে কাঁদতে লাগল, আর তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল, আর দুষ্টু দাদা ক্লিক করে তার সেই চেহারার ছবি খুব কাছে থেকে তুলে ফেল্ল। নমিতা আরও রেগে গিয়ে দাদাকে জিভ ভেঙচাল, কিন্তু বিনয় সেরকমও একটা ছবি তুলে বলল, "থ্যাঙ্কস মিস!"

নমিতা মুখ ঘুরিয়ে নিল তৎক্ষণাৎ, যাতে দাদা আর তার মুখের ছবি তুলতে না পারে!

পুলিশদল বাহাদুরকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেল নীচে। তারপরই জিপের আওয়াজ শোনা গেল।

পড়শিরা আবার এলেন। এবার অনেক বেশি সংখ্যায়। কী আর করা যায়, বিনতা দেবী খুশি হয়ে বরফ দিয়ে প্রচুর শরবত খাওয়ালেন অতিথিদের। অতিথিরা সব নানারকম উপদেশ দিতে দিতে চলে গেলেন যখন, তখন ভোর হয়ে গেছে।

॥ ৫ ॥

এরপর বেশ কিছুদিন ফ্রিজটা ঠিকই রইল, কিন্তু আওয়াজ—ভয়ঙ্কর সব আওয়াজ বেড়ে যেতে লাগল। কোনও-কোনওদিন একবার, আবার কোনওদিন দশবার পর্যন্ত আওয়াজ হতে লাগল। আর এক-একবার এক-একরকম। নানারকম জন্তু-জানোয়ারের মতো আওয়াজ তো বটেই, এমনকী, একদিন নাকি পিয়ানোর মতোও বেজেছিল প্রায় আধ ঘণ্টা। বিনতার মনে হয়েছিল তাতে একটা ইংরেজি সুরও বাজছিল। খরেশবাবু পরে শুনে বললেন, "তা হতেও পারে—সায়েবি যন্ত্র তো, খোদ হল্যান্ডে তৈরি—তার উপর সায়েববাড়িতে কত বছর ছিল তারই কিছু-কিছু স্মৃতি হয়তো এখনও রয়ে গেছে।"

কিন্তু এত গুণ থাকা সত্ত্বেও পাড়ার এক মিষ্টিওয়ালাকে ওই ফ্রিজটা বিক্রি করে দিলেন খরেশবাবু। প্রথমে ভেবেছিলেন, হাজার টাকার কমে বেচবেন না, কিন্তু মিষ্টিওয়ালা দিতে চেয়েছিলেন দুশো। চারদিন ধরে দরদস্তুর করে শেষে তিনশো পঞ্চাশ টাকায় রফা হল। ফ্রিজটা নিয়ে যাওয়ার পর বাড়িতে যেন শোকের ছায়া নেমে এল। খরেশবাবু মনখারাপ করে, খিদে নেই বলে দু' গেলাস ঘোল খেয়ে শুয়ে পড়লেন। বিনতা কাঁদতে শুরু করলেন। বললেন, "এতদিনের একটা সঙ্গী চলে গেল।" বাড়িটা ফাঁকা-ফাঁকা লাগতে লাগল। বিকেলে নমিতা এসে সত্যি-সত্যি অসুস্থ হয়ে পড়ল। কী কান্না তার। কেবলই বলতে লাগল, "ফ্রিজ ফিরিয়ে নিয়ে এসো। নতুন

ফ্রিজ চাই না।" সন্ধ্যেবেলা বিনয় ফিরে এসে কেবল দশ মিনিট গম্ভীর হয়েছিল। তারপর বলল, "যাক্, এবারে ত্রিশটা ডিম রাখা যায় এমন ফ্রিজ আসবে!"

ফ্রিজ এল। কী চমৎকার উজ্জ্বল সাদা রং। আর কী অসাধারণ তার হ্যান্ডেল। বন্ধ করবার সময় কেবল দরজাটা একটু ঠেলতে হয়, তারপর শক্তিশালী চুম্বক দরজাটাকে টেনে নেয়। আর আওয়াজ? একটু আওয়াজও শোনা যায় না। আর সত্যিই—ত্রিশটা ডিম রাখবার জায়গাও আছে। ভেতরে আবার দু-একটা আলো, দরজা খুললেই জ্বলে ওঠে। পুরনো ফ্রিজের ভেতরে আলোই ছিল না, কিংবা থাকলেও বোধহয় সে ভাল্ব এ-দেশে পাওয়া যেত না বলে লাগানোই হয়নি গত চৌত্রিশ বছর। উৎসাহে সেদিনই বিনয় ত্রিশটা ডিম কিনে এনে ফ্রিজে সাজিয়ে রাখল। আর খরেশবাবু কোত্থেকে কম দামে পেয়ে তিন কেজি কাটা পোনা এনে ডিপ-ফ্রিজে রেখে দিলেন। বিনতা কিনে আনলেন একগাদা সবজি, নমিতা অবাক হয়ে দেখল তার তিনটে বড় চকোলেট রাখবার বেশ চমৎকার জায়গা আছে। সেও পুরনো ফ্রিজের দুঃখ ভুলে গেল। বাড়িটা হঠাৎ বেশ আনন্দময় হয়ে উঠল। এরকম অবশ্য বেশিদিন নয়। ষোলো-সতেরো দিন পর হঠাৎ ফ্রিজে একটা আওয়াজ হল, খট্। বেশ স্পষ্ট শোনা গেল, তবে খুব জোরালো নয় শব্দটা। দরজা খুলে দেখা গেল আলো দুটোই জ্বলছে। খরেশবাবু বললেন, "ওটা কিছু নয়। ফ্রিজের কিছু হয়নি।" কিন্তু তিন ঘণ্টা পর কী একটা বার করতে গিয়ে বিনতা দেখলেন, ট্রেতে বরফ গলে ফোঁটা-ফোঁটা জল পড়ছে, আর ট্রে'র মধ্যে এক গাদা জল। বুঝলেন ফ্রিজ খারাপ হয়েছে। তাড়াতাড়ি প্রায় এক কেজি মাছ বার করে ভেজে ফেললেন। সন্ধ্যে নাগাদ সকলে বাড়িতে ফিরে সব বিমর্ষ হয়ে রইল। খরেশবাবু বললেন, "কালই কম্পানিতে জানাতে হবে।"

খুব মাছ খাওয়া হল সেদিন। উপায় কী। রেখে তো দেওয়া যাবে না। পরদিন খরেশবাবু পাড়ার ডাক্তারখানা থেকে ফোন করে দিলেন ফ্রিজ কম্পানিকে। তাঁরা ওঁকে একটা নম্বর নিলেন। বললেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁরা মেকানিক পাঠাবেন। মেকানিক এলেন, কিন্তু প্রায় দশদিন পর। ওঁদের অফিসে নাকি সব গো-স্লো আন্দোলন চলছে। যাই হোক, মেকানিক বললেন, "শিগগিরই একটা নতুন ফ্রিজ দিয়ে এটাকে নিয়ে যাবেন, কারণ এটার মোটরটাই নষ্ট হয়ে গেছে।" আরও প্রায় পনেরো দিন পর একটা লরি এল তাঁদের রাস্তায়। পুরনো ফ্রিজটা নিয়ে আবার একটা আনকোরা ফ্রিজ রেখে গেল কম্পানির লোক, আর কুড়ি টাকা বকশিশ নিয়ে গেল। বকশিশ ঠিক নয়, চা খাওয়ার পয়সা। খরেশবাবু ভাবলেন, বাপ রে, এরা কোত্থেকে চা খায়? এক-এক কাপের দাম পাঁচ টাকা।

নতুন ফ্রিজটা ঠিকই ছিল, কিন্তু কবজাটা ঢিলে ছিল বলে দরজা ভাল করে বন্ধ হত না। এর ফলে জিনিসপত্র ঠাণ্ডা হতে দেরি হতে লাগল। মোটরের উপর চাপ পড়তে পড়তে মাসখানেকের মধ্যে এই ফ্রিজটাও নষ্ট হয়ে গেল। আবার সেই একই কথা বলতে হয়, কম্পানিতে টেলিফোন, মেকানিকের আগমন, গ্যারাণ্টি অনুযায়ী ফ্রিজ-বদল, চায়ের জন্য কুড়ি টাকা এবং সবসমেত বেশ কয়েক দিন ফ্রিজহীন অবস্থায় কাটানো। তৃতীয় ফ্রিজটা অবশ্য প্রথম দু'মাস কোনও গোলমাল

করল না। সকলে ভাবলেন, যাক্, এবারে তা হলে ঠিক মতো ফ্রিজ একটা পাওয়া গেল। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখা গেল তৃতীয় ফ্রিজটাও চলছে না। আবার কম্পানিতে ফোন করা হল। এবারে এলেন কম্পানির একজন বড় ইঞ্জিনিয়ার! তিনি বললেন, বাড়িতে বিদ্যুতের সরবরাহের ত্রুটি আছে। এর সব তার পালটাতে হবে। অন্তত মেইন থেকে ফ্রিজ পর্যন্ত একটা নতুন তার বসানো দরকার। কথামতো তাই করা হল বেশ কিছু টাকা খরচ করে। কিন্তু চতুর্থ ফ্রিজ দু'দিন চলার পর ঠাণ্ডা করার যন্ত্রটা আস্তে-আস্তে চলতে লাগল। ভেতরে আর বরফ জমে না, কেবল অল্প ঠাণ্ডায় ডিম আর মাখন ঠিক থাকে।

খরেশবাবু রেগে বললেন, "ঘোড়ার ডিম, আমি ওই পুরনো ফ্রিজই আবার নিয়ে আসব, দরকার নেই নতুন ফ্রিজে!" কম্পানিতে লিখে দিলেন একটা কড়া চিঠি। জানালেন, আর তাঁর ফ্রিজ ফেরত নিয়ে যান, জমা দু' হাজার আর একদিন যত ইনস্টলমেণ্টের টাকা দিয়েছেন সব ফেরত দিয়ে যান। ফ্রিজ তাঁর চাই না।

কম্পানির লোক মুখ কাচুমাচু করে এসে ফ্রিজ নিয়ে গেল। দুঃখ প্রকাশ তো করলই, তার উপর চেকও দিয়ে গেল। যা টাকা দিয়েছিলেন সবই ফেরত পেলেন খরেশবাবু। তবে এবারে আর চায়ের দামটা দিতে হল না। খরেশবাবু ভাবলেন তাঁর পুরনো ফ্রিজটাকেই আবার আনতে হবে— কিন্তু একবার বেচে দেওয়ার পর মিষ্টিওলা তো নাও দিতে পারে, এটা ভেবে তাঁর মনখারাপ হয়ে গেল। তিনি তবু একবার চেষ্টা করবেন বলে ঠিক করলেন। তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গুটিগুটি চললেন মিষ্টির দোকানের দিকে। বেশি দূর যেতে হল না অবশ্য। তিনি দেখলেন মিষ্টিওলা নগেন তাঁর দিকেই আসছে। তিনি কিছু বলার আগেই নগেন বলল, "বাবু ও-ফ্রিজ আপনি নিয়ে যান, পরশু থেকে সারাদিন ওর ভেতর থেকে বাঘের আওয়াজ আসছে। ডজন ডজন বাঘ! আর তাদের কী ঝগড়া মারামারি! উঃ মশাই, আমার দোকানে বসে লোকেরা খেতে-খেতে চমকে চমকে উঠছে। খদ্দেরদের হেঁচকি উঠছে ওই আওয়াজ শুনে। আমার পোষা তিন-তিনটে বেড়াল কাল থেকে কোথায় বিবাগী হয়ে চলে গেছে! একজন বলছে ওই তিনটের একটাকে নাকি বিবাদি বাগের কাছে দেখা গেছে, দেখুন দিকি, আমার শখের বেড়াল, আমার গিন্নির শখের বেড়াল। আপনার ওই ফ্রিজ ফেরত নিন মশাই। একজন ভদ্রলোককে ওটা বিনি পয়সায় দিতে গিয়েছিলাম, তা তিনি বললেন কী জানেন? তিনি বললেন, বাপ রে, ওই খরেশবাবুর ফ্রিজ, আমাকে হাজার টাকা ফাউ দিলেও নেব না! তা আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, দাদা ফ্রিজটাকে ফেরত নিন। পয়সা-ফয়সা চাই না—আমারই লোক আপনার বাড়িতে কাল সকালে পেঁছে দিয়ে আসবে। আমাকে দয়া করুন। ফ্রিজের খুরে খুরে পেন্নাম, বাবা। আর ফ্রিজ নয়।"

এর পর বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে, কিন্তু খরেশবাবুর ফ্রিজটা মাঝে মাঝে একটু-আধটু উলটো-পালটা আওয়াজ করলেও আসল কলটা ঠিকই চলছে। একদিন নাকি ফ্রিজ থেকে জন-গণ-মন সুর বেরিয়েছিল কিন্তু তা কেবল নমিতাই শুনেছিল বলে কেউ তার কথা বিশ্বাস করেনি। ফ্রিজের ভেতরকার বেড়াল সংখ্যাও এখন অনেক কমে গেছে। দুটোর বেশি বেড়াল নাকি ওর মধ্যে আর

ঘর্‌ঘর্‌ করে না। বোধ হয় নতুন করে তার লাগানোতেই ফ্রিজটা ঠিক হয়ে গেছে, কে জানে।

পরবর্তী আর একটি কথাই বাকি আছে। সেটা বললেই গল্পের শেষ হয়। একদিন পুলিশ-অফিস থেকে একজন পিয়ন এসে একটা চিঠি দিয়ে গেলেন খরেশবাবুকে। চিঠিতে যা লেখা ছিল তার সারাংশ হল এই ঃ সরকারবাহাদুরের পুলিশ-বিভাগ অসম প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সঙ্গে দাগী খুনে এবং ডাকাতকে গ্রেফতারে সাহায্য করায় আপনাদের ফ্রিজকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন! দু'মাস পর এই টাকা একটি অনুষ্ঠানে দেওয়া হবে। আপনার ফ্রিজের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।

খরেশবাবুর বাড়িতে সেদিন খুব হইহই আনন্দের বান যে ডেকেছিল, সেটা অবশ্যই আন্দাজ করা যায়।

সব খুন-খারাপির সুরাহা হয় না। কিন্তু তার মানে ঠাণ্ডা মাথার হিসেবি ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান খুনিরাই শুধু রেহাই পায় তা নয়। অত্যন্ত সুপরিকল্পিত অপকর্মের 'নায়কও' অনেক সময় অবিশ্বাস্যভাবে ধরা পড়ে। হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি বা টায়ার পাংচারের এক-আধটা অপ্রত্যাশিত ঘটনাও সব ছক ভেস্তে দিতে পারে। কিংবা ঠিক সময়মতো মিহির ঘটকের আবির্ভাব।

সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফেরার পর ঘরের দরজা-জানালা আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধ করেও রেহাই পায়নি। শেষ পর্যন্ত টেপরেকর্ডারের শরণাপন্ন হয়েছে। বাইরের কোলাহলের চেয়ে এক পরদা জোরে সরোদ আর সেতারের যুগলবন্দী। দেবতারা মেয়ে ও পুরুষ নির্বিচারে নানা গুণের অধিকারী হয়েও সবাই কালা হয়ে গেলেন কীভাবে তাই নিয়ে একটা গবেষণা শুরু করা যায় কি না ভাবছিল মিহির। বিশ্বকর্মার মতো ডাকসাইটে যন্ত্রবিশারদ তো অন্তত নিজের জন্যে একটা হিয়ারিং এড্ তৈরী করতে পারতেন! তা হলে নিশ্চয় আজ স্পিকার ফাটিয়ে রেকর্ডগুলো বাজত না।

লোডশেডিংয়ের একমাত্র উপকারিতার কথা ঠিক সাড়ে আটটায় টের পেল মিহির। অন্ধকারে যে এত শান্তি কে জানত। তিনটে বাড়ি পেরিয়ে চার তলার ফ্ল্যাটে একটা চামচ খসে পড়লেও এখন শুনতে পারে সে।

ভ্যাপসা গরম না থাকলে হয়তো ইজিচেয়ারে ঘুমিয়েই রাত কেটে যেত। এখনও কারেন্ট আসেনি। এতক্ষণে খেয়াল হয় জানলাগুলো বন্ধ। তৃতীয় জানালাটা খুলে পেছন ফেরার আগেই গায়ের রক্ত হিম করা ভয়ঙ্কর একটা আর্তনাদ তাকে শিউরে দিল। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সেই শব্দ। শুরু না হতেই যেন শেষ। একেবারে আশপাশের ব্যাপার নয়। পাড়ার প্যান্ডেলে মাইক চললে শুনতেও পেত না। কিন্তু দূর থেকে ভেসে এলেও ভয়াবহতা একটুও কমেনি। আতঙ্কে ভরা যেন

একটা প্রতিবাদ। নিশ্চয় ব্যর্থ প্রতিবাদ। মুহূর্তের ব্যবধানে পর পর জোরালো হুইসেলের আওয়াজ পরিস্থিতিটাকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলল।

টর্চের আলোর রিস্টওয়াচে দেখল দশটা পঁচিশ। চটিতে পা গলিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল মিহির। একফালি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাববার চেষ্টা করছে শব্দটা কোত্থেকে এল। ওদের রাস্তা থেকে নিশ্চয় নয়। লোডশেডিং হলেও অন্ধকারে চোখ সয়ে গেছে। কোনও জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই পথটায়।

ঘরে ঢুকে চাবিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে দরজায় তালা দিচ্ছে, ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ কানে এল। ছেঁড়া-ছেঁড়া কয়েকটা কথাও।

মিহির পেছন ফিরে তাকাবার আগেই তার নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু হয়ে গেছে। দুটো গলা শুনেই চিনেছে। ক্লাবের ছেলে। দলে অবশ্য পাঁচ-ছ'জন আছে।

"মিহিরদা, শিগগির!"

"জগুবাবু..."

"এক্কেবারে শেষ!"

সকলে মিলে ছুটতে শুরু করেছে। মিহির ভাবে, হুইসেলের শব্দ শুনেই বোঝা উচিত ছিল যে, পাড়ার ভলান্টিয়াররা টহল দিচ্ছিল। কিছুদিন ধরে বেজায় চুরি শুরু হয়েছে এ-পাড়ায়। নাইট গার্ডের ব্যবস্থা চালু করেছে ক্লাবের ছেলেরাই। তাও প্রায় দিন দশেক হল। নাইট গার্ডরা রাস্তায় ছিল বলেই সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়েছে ঘটনাটা। তিন তলার ওপর থেকে জগুবাবু ছিটকে পড়েছেন রাস্তার ওপরে।

মিহিরের বাড়ির ঠিক পেছনের রাস্তায় জগবন্ধু রায়ের বাড়ির সামনে পৌঁছবার আগেই আলো এসে গেল। একটা স্ট্রিটল্যাম্পের আলো পড়েছে জগবন্ধুর লণ্ডভণ্ড দেহের ওপর। খালি গা, ধুতিটা ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে। শরীরটা ডান পাশে কিছুটা কাত হয়ে আছে, একটা পা দুমড়ে রয়েছে আর একটার নীচে। বেশ কয়েকজন গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে ডাক্তার হালদার নিচু হয়ে বসে পরীক্ষা করছেন।

দেখেই বোঝা যায়, করতে হয় তাই করা। জগুবাবুকে আর বাঁচাবার কোনও উপায় নেই।

হালদার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "মিহিরবাবু! সরি..."

"পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে?" মিহির জিজ্ঞেস করল।

হালদার বললেন, "আমার বাড়ি থেকেই ওরা খবর দিয়েছে। পুলিশ ও অ্যাম্বুলেন্স। স্পট ডেড। আমি তো মিনিট তিনেকের মধ্যে এসেছি। কিছু করার নেই।"

সমীর মিহিরের হাত টেনে বলল, "ওই দেখুন, তিনতলার দরজাটা খোলা, এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে!"

দু'পা পিছিয়ে এসে ওপর দিকে মুখ তুলে তাকাল মিহির।

দোতলা বাড়ি। তিনতলায় শুধু একটা ঘর। মোটর গ্যারাজের মালিক জগবন্ধু রায় বছর ছয়েক হল বাড়ি তৈরি করে এখানে বাস করছেন। কিন্তু বাড়ির কাজ শেষ করতে পারেননি। বাইরের দেওয়ালে কোথাও প্লাস্টার নেই। দোতলা ও তিনতলার কয়েকটা দরজার সামনে লোহার শিকগুলো শুঁড় বার করেই জানান দিচ্ছে যে, এসব জায়গায় বারান্দা হওয়ার কথা ছিল। জগবন্ধু কোথা থেকে মরণঝাঁপ দিয়েছেন সেটার হদিশ পাওয়ার জন্য গোয়েন্দার চোখের প্রয়োজন নেই। তিনতলার ঘরটার দরজা খোলা, আর তার সামনেই একটা লোহার শিক থেকে ঝুলছে একফালি সাদা কাপড়। জগবন্ধুর পড়ার সময় ধুতিটা আটকে গিয়েছিল।

ভিড় ক্রমেই বাড়ছে। মিহির বলল, "দীপক, ডেডবডি যেন কেউ টার্চ না করে!"

"আমরা কর্ডন করেই রেখেছি।"

অরুণ বলল, "বাড়িতে বোধ হয় কেউ নেই। প্রচুর কলিং বেল টিপেছি। সাড়া পাইনি।"

"তা ছাড়া পুরো বাড়ি তো ঘুটঘুট করছে।" সমীর জানাল।

"ইন ফ্যাক্ট, আমিই আজ এই রাস্তায় তখন টহল দিচ্ছিলাম। বলতে গেলে দুশো গজের মধ্যে এই কাণ্ড ঘটেছে। অবশ্য আমার চোখের সামনে নয়, পেছনে।" কথাগুলো বলতে-বলতেই যেন গা শিরশির করে দীপকের।

মিহির বলল, "আচ্ছা! তারপর কী করলি তুই?"

"পেছন ফিরেই হুইসল দিয়ে ছুটে এলাম। না না, টাচ করিনি। তারপর অবস্থা দেখে বরাবর হুইসল দিতে লাগলাম। তখনও একবার বাড়ির দিকে ভাল করে দেখেছি। কোনও ঘরেই কোনও আলো ছিল না।"

হাতের ইঙ্গিতে দীপক, অরুণ ও সমীরকে নিয়ে রাস্তার অপর পারে অপেক্ষাকৃত নির্জন অংশে সরে এল মিহির।

"তুই তা হলে জগুবাবুর পড়ার পরমুহূর্ত থেকেই বলতে গেলে বাড়ির সামনেই রয়েছিল?"

"হ্যাঁ মিহিরদা।"

"কাউকে বেরোতে দেখিসনি বাড়ি থেকে?"

'কেউ না। তা ছাড়া মিনিটখানেকের মধ্যেই আমাদের পুরো পার্টি এসে পড়েছে। তারপর আলোও এসে গেছে। তা ছাড়া অন্ধকার থাকলেই বা কী। ওই তো সদর দরজা। আর পাঁচ হাতের মধ্যে…"

"বাড়ি থেকে বেরোবার জন্য অন্য কোনও পথ নেই?"

অরুণ ও সমীর সমস্বরে জানিয়ে দেয়, "নেই।"

খানিকটা যেন আপন মনেই বলে মিহির, "এক, যদি কোনও জানলা-টানলা খুলে কোনও জায়গা দিয়ে…"

সমীর বলে, "মিহিরদা, মনে হচ্ছে তোমার যেন একটা কিছু সন্দেহ হয়েছে। সুইসাইড নয়?"

মিহিরের হয়েই দীপক যেন উত্তর দিল, "জগুবাবুর চিৎকারটা...প্রচণ্ড একটা ভয়..."

ঠিক এই কথাটাই ঘুরছিল মিহিরের মনে আত্মহত্যা করার সময়েও মানুষ শেষ মুহূর্তে বাঁচার চেষ্টা করে ঠিকই কিন্তু জগুবাবুর আর্তনাদটাকে সে কিছুতেই মেলাতে পারছে না। কাউকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার সময়েই বরং এমন একটা আর্তরব গলা চিরে বেরিয়ে আসাটা স্বাভাবিক। আবার অন্যদিকে শরীরটা যেভাবে পড়ে রয়েছে, ঠিক পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলার মতো ভঙ্গি নয়। সেক্ষেত্রে মুখ থুবড়ে পড়াটাই প্রত্যাশিত। অবশ্য ধুতিটা ফেঁসে গিয়েছিল শিকের সঙ্গে, তার জন্য যদি এক...

একটা সিগারেট ধরিয়ে মিহির বলল, "পুলিশ আসার আগে আর মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। বাড়ির ভেতর যতক্ষন না ঢোকা যাচ্ছে..."

"না মিহিরদা, পুলিশ আসার আগেই বোধ হয় ঢুকতে পারা যাবে। শিউশরন জগুবাবুর ভাগনেদের ডাকতে গেছে। এক্ষুনি এসে পড়বে।"

মিহির ঠোঁট থেকে সিগারেটটা সরিয়ে ভুরু উঁচু করে তাকাল অরুণের দিকে।

"চার ভাগনে মিলে আজ যাত্রা দেখতে গেছে। ওই মহাপুজো সমিতির ওখানে। শিউশরন পাশের রায়দের বাড়ির ড্রাইভার। ও জানত। সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ি নিয়ে ছুটেছে খবর দিতে।

অরুণের কথা শেষ হওয়ার আগেই মোড়ের মাথায় গাড়ির হেডলাইট বাঁক নিল। পর পর দুটো গাড়ি আসছে। পুলিশের জিপ নয়।

গাড়ি থামার আগেই মিহির এক ঝটকায় সিগারেটটা ফেলে অভ্যাসবশত পা দিয়ে সেটা পিষতে-পিষতেই যেন চাঙ্গা হয়ে উঠল, তাপপর বলল, "দীপক, অরুণ—আগে আমি ওই বাড়িতে ঢুকব। তোরা দুজন শুধু আমার সঙ্গে থাকবি। তোরা ওদের চিনিস বলেই বলছি। আর সমীর, তুই বাইরের দরজায় থাকবি। পুলিশ এলে বলে দিস।"

সবাই ক্লাবের ছেলে। না হলে এত সহজে তাদের হুকুম উপস্থিত লোকে মানত না। দীপক ও অরুণ প্রায় টেনে এনেছে অমলকে। তারই কাছে বাড়ির চাবি। বাকি তিন ভাই বাইরে রয়েছে? মিহির বলেছে, একজন সঙ্গে থাকলেই যথেষ্ট।

অমলের মুখে কোনও কথা নেই।

এখনও সে হতচকিত। পুরো ব্যাপারটা যেন উপলব্ধি করতে পারছে না। যন্ত্রের মতো নির্দেশ পালন করে যাচ্ছে।

ইয়েল লকে চাবি ঢুকিয়ে দরজার পাল্লা ঠেলামাত্র খুলে গেল। ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। অমল হাত বাড়িয়ে বাঁ দিকের সুইচ বোর্ডে দুটে সুইচ টিপছে।

একফালি প্যাসেজের সামনে একটা ঘর আর এই প্যাসেজের ডান ধার দিয়েই উঠে গেছে দোতলার সিঁড়ি।

চারধারে চোখ বুলিয়ে মিহির জিজ্ঞেস করল, "একতলা ও দোতলায় কি আপনারা চার ভাই থাকেন?"

অমল বলল, "না, আমরা সবাই দোতলায় থাকি। একতলায় শুধু একটা বসার ঘর ব্যবহার করা হয়। বাকি সব বন্ধ আছে।"

"বন্ধ মানে কি চাবি দেওয়া ?"

"না, ছিটকিনি।"

"দোতলায় আপনারা কি নিজেদের ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়েছিলেন ?"

"না, না, তালা দেওয়া নেই। শুধু বাইরে থেকে বন্ধ। বাড়িতে আছে কে! কাজের লোকও তো নেই।"

"বেশ!" সদর দরজাটা টেনে বন্ধ করতে-করতেই মিহির বলল, "শোন অরুণ, তুই একতলা, আর দীপক তুই দোতলাটা ইন্সপেক্ট করে আয়। প্রত্যেকটা ঘর, বাথরুম, সব দেখবি। কোথাও কোনও জানলা বা দরজা খোলা আছে কি না।"

অরুণ তড়বড় করে বলল, "যেখান দিয়ে বাড়ির ভেতর থেকে কেউ পালাতে পারে…"

"হ্যাঁ। সেইটাই উদ্দেশ্য। চলুন, অমলবাবু, আমরা সোজা তিনতলায় যাই।"

অমলকে অনুসরণ করে সিঁড়িতে উঠতেই মিহির শুনল আপন মনে বিড়বিড় করছে অমল, "ভাবা যায় না! ভাবা যায় না! অসম্ভব।"

মিহির জিজ্ঞেস করল, "জগুবাবু কি তিনতলাতে থাকতেন ?"

"হ্যাঁ!" সংক্ষিপ্ত উত্তর।

মিহির বুঝল এ সেই জাতের একজন যাকে খুঁচিয়ে প্রশ্ন না করলে কিছু জানা সম্ভব নয়।

"আপনার মামার আত্মহত্যা করার কী কারণ থাকতে পারে।"

"ব্যবসাটা কিছুদিন তেমন ভাল যাচ্ছিল না।"

"আর কিচ্ছু নয় ?"

"আমি তো জানি না।"

"কিন্তু আপনি তো আজ বেশ অবাক হয়েছেন দেখলাম!"

"হ্যাঁ, হয়েছি। উইলসন কম্পানি আমাদের বহুদিনের বড় কাস্টমার। তারা অন্য গ্যারাজে চলে যাওয়ায় মামা একটু মুষড়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তা বলে…"

তিনতলায় পৌঁছে ছাতের দরজার ছিটকিনি খুলল অমল। একফালি ছাত পেরিয়ে একপাশে জগুবাবুর ঘর।

মিহির বলল, 'মামাকে একেবারে তিন তলায় আটকে রেখে সবাই মিলে যাত্রা শুনতে বেরিয়ে গেলেন ?"

"মামাকে খাবার দিয়ে রোজই রাত্তিরে আমরা ছাতের দরজা বন্ধ করে নীচে নেমে যাই।"

জগুবাবুর ঘরের সামনে পৌঁছে মিহির দেখল, দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ।

"বন্ধ!" বলল মিহির।

অমল এগিয়ে এসে চাবির তোড়া থেকে একটা ঢুকিয়ে দিল ইয়েল লকে। একটা আধপ্যাঁচ,

তারপরে একটু ঠেলা- দরজা খুলে গেল।

অমলকে বাধা দিয়ে মিহির নিজে প্রথম ঢুকল ঘরের মধ্যে। এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল। উলটো দিকের দেওয়ালে সেই ভয়ংকর দরজাটা যেন আবছা একটা আলোর আয়তক্ষেত্র। রাস্তার আলো সরাসরি ঘরে ঢোকার কোনও সুযোগ নেই। ঘরের দুটো জানলা খোলা কিন্তু তাতে দুর্ভেদ্য লোহার গ্রিল্।

"আলোটা জ্বেলে দিন।" বলল মিহির।

আলো জ্বালার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দীপক আর অরুণ ধুপধাপ করে ঘরে এসে ঢুকল। একতলা-দোতলা মিলিয়ে পাঁচটা জানলা খোলা ছিল কিন্তু প্রত্যেকটাতেই পদ্মফুলওলা এমন লোহার গ্রিল যে সেখান দিয়ে কারও ঢোকা বা বেরনো সম্ভব নয়।

ঘরের বাঁ দিক চেপে একটা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেছে ওরা। তারই ঠিক বিপরীতে পশ্চিমের দেওয়ালে দরজা দিয়ে পড়ে গেছেন জগবন্ধু। ঘরটা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। সেই ভাবেই লম্বা করে পাতা রয়েছে খাটটা। খাট না বলে পালঙ্ক বলাই ভাল। প্রাচীন কালের কারুকার্যওলা বিশাল চেহারার বাংলা খাট। ঘরের জানলাগুলো শুধু উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়ালে। পূব এবং পশ্চিমে দুটো করে দরজা। যে দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেছে তার ডান পাশের দরজাটি বাথরুমের। পশ্চিমের দেওয়ালের দ্বিতীয় দরজাটি বন্ধ রয়েছে। তার সামনে এলোমেলো ও ময়লা জামাকাপড় ভরা একটা আলনা। একটা কাঠের আলমারি, ছোট্ট তেপায়া একটা টেবিল আর খাটের নীচে কয়েকটা স্টিল ট্রাঙ্ক। আর আছে দরজার পাশেই কয়েক জোড়া জুতো। ঘরের শ্রীহীন দশাটা বেশ চোখে পড়ে।

খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে মিহির লক্ষ্য করল, মশারির ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় কোন দিক দিয়ে জগুবাবু নেমেছিলেন। মশারির ওই একটা পাশই শুধু গোঁজা নেই, ঝুলে পড়েছে।

খাটের পাশ ঘুরে আলনাটার সামনে এসে দাঁড়াল মিহির। জামা-কাপড়ের স্তূপের পেছনে দরজাটা শুধু ছিটকিনি তুলেই বন্ধ নয়, আড়াআড়িভাবে ইংরেজি এক্সের একটা শুধু রেখার ভঙ্গিতে কাঠ আঁটা। ভুলক্রমেও যাতে এই দরজা কেউ না খোলে। পশ্চিমের দুটো দরজা—তার কোনওটার সামনেই বারান্দা তৈরি হয়নি।

অভিশপ্ত দরজাটাকেও একইভাবে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু জগবন্ধু আজ নিজের হাতে সেটিকে মুক্ত করেছেন। তার প্রমাণও চোখের সামনে। দরজা-আঁটা কাঠটা এক পাশে দাঁড় করানো আর মেঝের ওপর গড়াচ্ছে একটা স্ক্রু ড্রাইভার।

চার হাত-পায়ে প্রায় হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে একটু চোখ বোলাতেই মিহির চারটে মরচে ধরা স্ক্রুয়েরও সন্ধান পেয়েছে। দরজার ফ্রেমের ওপর দু' পাশে দুটো করে লাগানো ছিল। স্ক্রুয়ের চেহারা দেখে মনে হয় বয়সে তারা এই বাড়ির চেয়ে ছোট নয়।

দীপক আর অরুণ নিঃশব্দে অনুসরণ করছে মিহিরকে। অমল দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে আছে।

মিহির স্ক্যাগুলো মেঝের ওপর যথাস্থানে নামিয়ে রেখে বলল, "কেউ কোনও জিনিস ভুলেও যেন টাচ করবেন না, তা হলে পুলিশে অকারণে হইচই বাধাবার একটা সুযোগ পাবে।"

মিহিরের পেছনে ছায়ার মতো রয়েছে তার দুই চেলা। কোন দিকে তাকাচেছ, কী দেখছে—সবটাই নীরবে অনুধাবনের চেষ্টা।

মিহির তেপায়া টেবিলটার সামনে এসে দাঁড়াল। ছোট-বড় নতুন ও ধুলো-মলিন শিশি-বোতলের স্তূপ। হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিকের অরণ্যে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ রসভঙ্গ করছে। লাল পলিথিনের ঢাকনার নীচে গেলাস ভর্তি জল। তার পাশেই জগুবাবু স্টিল-ফ্রেমের চশমা।

বাথরুমের দরজার ছিটকিনি খুলে ভেতরে ঢুকল মিহির। আলোর সুইচটা বাথরুমের ভেতরে ডান দিকে। ছোট্ট বাথরুম কিন্তু খুব পরিষ্কার। দেখে মনে হওয়ার কথা, জগুবাবু নিজের ঘরের চেয়ে বাথরুমের বেশি যত্ন নিতেন।

বাড়ির সামনে গাড়ি এসে থামার শব্দ পাওয়া গেল। তারপরেই কলিং বেলের ডাক। মিহির বলল, "অমলবাবু, আপনি নীচে গিয়ে দরজা খুলে দিন। মনে হচ্ছে পুলিশ এসে গেছে।"

অমল পেছন ফিরতেই মিহির বলল, "আপনার ভায়েদেরও এবার ডেকে আনুন ওপরে।"

চোখের ইঙ্গিতে দীপক ও অরুণকে অপেক্ষা করতে বলেছে মিহির। এবার অমলের কান এড়িয়ে চাপা গলায় বলল, "দ্যাখ তো, ঘরের কোথাও টর্চ বা মোমবাতিটাতি আছে কি না! কোনও জিনিসে কিন্তু হাত নয়!"

বোঝা গেল পুলিশ আসার আগেই কাজ সারতে চাইছে। মিহির নিজেও উঁকিঝুঁকি মারতে-মারতে হঠাৎ খাটের পায়ের কাছে এসে যেন নিশ্চল হয়ে গেল। দীপক জিজ্ঞেস করল, "কী হল মিহিরদা?"

"নাঃ, তেমন কিছু নয়। খাটের পায়াটা দেখছি নড়ে গেছে। পুরনো দাগ বেরিয়ে পড়েছে পাশ দিয়ে।"

"এই যে, একটা হ্যারিকেন এখানে!" অরুণের গলায় আবিষ্কারের আনন্দ। "কিন্তু চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে না—না, তেল নেই। একেবারে খটখটে। কেরোসিনের গন্ধ পর্যন্ত নেই।" অরুণ চার হাত-পায়ে ঝুঁকে পড়ে নাক বাড়িয়েছে কিন্তু হাত দেয়নি।

মিনিট দুয়েক সময় পেয়েছিল ওরা যথেষ্ট। ঘরে বা বাথরুমে কোনও টর্চ বা মোমবাতি নেই। দীপক বলল, "আচ্ছা, বিছানাটা তো দেখা হয়নি? বালিশের নীচে..."

মিহির ঘাড় বাঁকিয়ে দীপকের মুখের দিকে তাকাল। কী যেন একটু ভেবে নিয়ে বলল, "যাক গে, থাকলেও কিছু যায় আসে না। টর্চের কাজ সেরে বালিশের তলায় রেখে তারপর জগুবাবু লাফ মারলেন..."

"আপনারা এখানে কী করছেন, অ্যাঁ?" দু'জন সেপাই সমেত থানার বড়বাবু ঘরের দরজার কাছ থেকেই ধমকে উঠলেন। রুক্ষ বিরক্ত স্বর। সদুত্তর না পেলেই চালান করে দেবেন এক্ষুনি, এরকম একটা ভাব।

মিহির ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বলল, "আসুন, আসুন মিস্টার বোস। আমরা মন দিয়ে আত্মহত্যার বিবরণ সংগ্রহের চেষ্টা করছি।"

"আরে মিস্টার ঘটক! আপনি এসেছেন সেটা তো জানতাম না। ভাবলাম পাড়ার ছেলেরা আবার এসব ব্যাপারে কেন মাথা গলাচ্ছে!" মিস্টার বোস এখন নিশ্চিন্ত।

মিস্টার বোসের হাসিভরা হ্যান্ডশেক থেকে ছাড়া পাওয়ার আগেই ইলেকট্রিক শক খাওয়া লোকের মতো চেঁচিয়ে উঠল মিহির, "না! একেবারে না।"

সবাই তটস্থ। মিহির ধমক লাগাল, "একদম ছোঁবে না!"

একটি অতি উৎসাহী সেপাই মাটির ওপর পড়ে থাকা স্ক্রু ড্রাইভারটাকে কুড়িয়ে নেওয়ার জন্য সবে নিচু হয়েছিল।

মিস্টার বোস বললেন, "মনে হচ্ছে, অল রেডি আপনি একটা সন্দেহজনক গন্ধ পেয়েছেন?"

মিহির বলল, "দুর্গন্ধ!"

"আপনি কি মশাই এর মধ্যেও খুন-খারাপি সাস্‌পেক্ট করছেন নাকি! এ তো সিম্পল কেস অব সুইসাইড।"

"সুইসাইড? হ্যাঁ, তা ঠিক—আত্মহত্যা। তবে খুব কি সরল ব্যাপারটা?"

মিস্টার বোস কী উত্তর দেবেন ভেবে পান না। "কই অমল-বিমলদের তো দেখছি না? কোথায় গেল?" মিহির জিজ্ঞেস করল।

"আপনি ওদের তলব করেছিলেন বুঝতে পারিনি। আমিই উঠতে দিইনি। বাড়ির বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি।"

"ভালই হয়েছে। চলুন, আমরাও নীচে যাই। এই ঘরটা আপাতত পাহারাদারের জিম্মায় থাকুক। আমি শুধু আপনার পারমিশন নিয়ে একটা জিনিস নিচ্ছি।" মিহির কয়েক পা এগিয়ে এসে নিচু হয়ে স্ক্রু ড্রাইভারের ডগাটা ধরে সেটাকে সন্তর্পণে তুলে নিল।

মিহিরের নির্দেশে একতলার বসার ঘরেই ঢুকেছে সকলে। অরুণ ও দীপকের সঙ্গে এখন সমীরও যোগ দিয়েছে।

"মিস্টার বোস, আপনার উপস্থিতিতেই আমি কয়েকজনকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।"

"সার্টেনলি! চার ভাইকে কি একসঙ্গে ডাকব, না, আলাদা করে?"

"না, সকলের আগে শিউশরনকে ডেকে পাঠান। পাশের বাড়ির ড্রাইভার। ওদের চার ভাইকে যে বেরোতে দেখেছিল আজ।"

শিউশরন পেল্লাই কুর্নিশ ঠুকে ঘরে ঢুকল।

"বোসো শিউশরন।" বলল মিহির, "তুমিই তো অমলবাবুদের একটু আগে যাত্রার আসর থেকে ডেকে এনেছ? কী করে জানলে ওরা ওখানে রয়েছে?"

শিউশরন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই ভাঙা বাংলায় জানাল যে, চার ভাই ওর চোখের সামনেই গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করে। তারপর ওর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ গাড়ি দাঁড় করায়।

কমল জিজ্ঞেস করে, "কী শিউশরন, যাত্রা শুনতে যাবে নাকি ? চলো আমাদের সঙ্গে। মহাজাতি সমিতিতে জমাটি পালা।"

মিস্টার বোস প্রশ্ন করেন, "চার ভাই গাড়িতে ছিল, তুমি দেখেছ ?"

"জি সাহাব !"

"হয়তো চারজন লোক ছিল কিন্তু তার মধ্যে একজন···"

শিউশরনের ভঙ্গি বিনীত হলেও বক্তব্যে অটল।

"ঠিক ক'টায় ওরা বেরিয়েছিল ?" মিহিরের পরবর্তী প্রশ্ন।

"আট বাজকর পঁচ্চিশ।"

"বাবা, তুমি যে একেবারে স্টেশনের ঘড়ির মতো হিসেব দিচ্ছ।" মিস্টার বোসের রসিকতায় কান না দিয়ে মিহির বলে, "তোমাকে কি বাবুরা কেউ জিজ্ঞেস করেছিল, ক'টা বাজে ?"

এবারে শিউশরন অবাক হয়, "লেকিন আপ কেইসে···"

"সেই জন্যই তোমার স্পষ্ট মনে আছে। ঠিক আছে শিউশরন। ধন্যবাদ।"

শিউশরনের বেরনো আর বিমলের প্রবেশের ফাঁকে মিস্টার বোস মন্তব্য করলেন, "মনে হচ্ছে অ্যালিবাই একটা তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সত্যিই ওরা চারজন যাত্রার ওখানে এতক্ষণ ছিল কি না···"

বাধা দিয়ে সমীর বলল, "ওটা নিয়ে আর অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। কম-সে-কম জনা-চারেকের সঙ্গে এরই মধ্যে কথা হয়েছে যারা প্রত্যেকে বলেছে, ওরা যাত্রা দেখছিল। আটটা পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশ থেকে শিউশরন ডাকতে না যাওয়া অবধি সারাক্ষণই···"

মিহির হঠাৎ প্রশ্ন করল, "আমাদের এখানে তো লোডশেডিং ছিল, ওখানে যাত্রা হচ্ছিল কী করে ?"

"পাশের পাড়া হলেও ওটা বোধ হয় অন্য ফেজে।"

দরজায় টোকা দিয়ে বিমল ঘরে ঢুকল। বেশ আদবকায়দা রপ্ত করেছে। চুলের বাহার ও পোশাকের পরিবর্তন সত্ত্বেও ভাইয়ে-ভাইয়ে মুখের মিল ধরা যায়। বয়সের ফারাকও বেশি নয়। ছাব্বিশ কি আঠাশ।

"জগুবাবুর মৃত্যুতে আপনারা চার ভাই-ই শুধু লাভবান হবেন, তাই না ?" মারকুটে ব্যাটসম্যানের মতো শুরু করল মিহির।

বিমল ম্লান হেসে বলল, "আমরা ছাড়া তো মামার আর কেউ নেই।

প্রথম প্রশ্নের খেই ধরে জগুবাবুর ব্যক্তিগত জীবনের কথাও কিছু কিছু জানা গেল। রীতিমত স্ট্রাগ্ল করেছেন জীবনে। ট্রাক ড্রাইভার থেকে মেকানিক, তারপর নিজের গাড়ি ও গ্যারাজ। বিয়ে করার আর সুযোগ হয়নি। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, এই চার ভাইকে নিয়ে এসেছিলেন নিজের গাঁ থেকে। নিজের ভাগনেও নয়। কোন দূর সম্পর্কে পিসতুতো দিদির ছেলে।

কথার মোড় ঘুরিয়ে মিহির বলল, "আপনারা তো সাড়ে আটটা নাগাদ আজ বেরিয়েছেন।

জগ্‌বাবুর সঙ্গে শেষ কখন দেখা হয় ?"

"এই ধরুন, বেরোবার মিনিট পাঁচেক আগেই। ওঁর খাওয়ার থালাটা আনতে গেছলাম। মামা সাড়ে সাতটার মধ্যেই রোজ খাওয়া সেরে নেন।"

"আপনাদের বাড়িতে তো কাজের লোক নেই। রান্নার…"

"না, না—রান্নার লোক সব খাবারদাবার বেড়ে ওই সাতটা নাগাদ চলে যায়। আমাদের মধ্যেই কেউ পরে গিয়ে থালা-বাসন নিয়ে আসে। মামা নীচে খেতে নামেন না।"

"আচ্ছা, আপনি যখন আজ থালাটা আনতে যান, জগ্‌বাবুর কথাবার্তায় অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েছিল ? উনি নিশ্চয় জেগেই ছিলেন তখনও ?"

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপার চেষ্টা করল বিমল, নিচু গলায় চোখ নামিয়ে বলল, "তখন তো আর বুঝিনি, এখন মনে হচ্ছে।" একটু থেমে যোগ করল, "মামা বলছিল, ব্যবসাটার দিকে আর-একটু মন দে, বুঝলি ? সবাই মিলে…"

মিহিরের গলাটাও এবার ব্যথিত শোনাল, "সত্যিই বোঝা দুষ্কর। লোকে কী অর্থে কখন কোন কথাটা বলে! আচ্ছা, রাস্তার দিকের ওই সাঙ্ঘাতিক দরজাটা নিশ্চয়ই বন্ধই ছিল তখন ? না হলে তো ঘরে ঢোকা মাত্রই আপনার চোখ পড়ত, তাই না ?"

"বন্ধ ছিল বইকী। বাড়ি তৈরি হওয়ার পর থেকে যেটা কখনও খোলা হয়নি, হঠাৎ…"

"না, ধরুন, শুধু কাঠের টুকরোটা খোলা রয়েছে কিন্তু পাল্লা দুটো বন্ধ। ভাল করে ভেবে বলুন।"

একটু সময় নিল বিমল, তারপর দু-তিনবার জোরে ঘাড় নেড়ে বলল, "না, আমার স্পষ্ট মনে আছে পুরো বন্ধ ছিল। হ্যাঁ, বন্ধ।"

বিমলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে অপেক্ষা করতে বলল মিহির। মিস্টার বোসের দিকে তাকিয়ে বলল, "আর ইণ্টারভিউয়ের দরকার নেই। তবে ওই অধিকন্তু ন দোষায় না কী যেন বলে, তারই খাতিরে নিয়মরক্ষা করব।"

বিমলকে যে-প্রশ্ন দিয়ে প্রথম আঘাত করেছিল, বাকি তিন ভাইকেও তাই করেছে মিহির। অবশ্য উত্তরদাতাদের প্রতিক্রিয়া এক হয়নি। একজন রেগেছে, একজন বিস্মিত হয়েছে আর শেষজন ব্যথিত। মিহির জনে-জনে বাকি তিন ভাইকে আর-একটি শুধু প্রশ্ন করেছে, "রাস্তার দিকের দরজাটা কি খোলা ছিল ?" সকলেই বলেছে, না, তবে তারা মামার ঘরে শেষবারের মতো ঢুকেছে বিভিন্ন সময়ে। বিমল থালা নিয়ে আসার পরে নির্মল ঢুকেছিল যাত্রা দেখতে বেরোবার ঠিক আগের মুহূর্তে। সেও জোর দিয়েই বলেছে যে, দরজায় কাঠ সাঁটা ছিল। না হলে, ঠিকই চোখ পড়ত তার।

চতুর্থ ভাইকে বিদায় করার পর মিহির বলল, "মিস্টার বোস, আসল কাজ খতম। তবে অদূর ভবিষ্যতে বিচারকদের তুষ্ট করার জন্য দুটি দায়িত্ব আপনি হয়তো পালন করতে পারেন। এক, এই স্ক্রু ড্রাইভারের হাতলের ছাপটা পরীক্ষা। দুই, কমলকে লক-আপে ভরে আপনাদের

একটু ব্যবস্থা করা। স্বীকারোক্তি।"

মিস্টার বোস একটু অবাক হয়েও প্রশ্ন করলেন, "হাতের ছাপের ব্যাপারটা না হয় বুঝলাম, কিন্তু সবাইকে ছেড়ে কমল কেন ?"

"এই চার ভাইয়ের মধ্যে ওইটাই সবচেয়ে ভিতু-দুর্বল প্রকৃতির। ইন্টারোগেশনের মধ্যেই সেটা···"

মিহিরের প্রথম কটু প্রশ্নবানের তাৎপর্য এবার সকলেই বুঝেছে।

দীপক জিজ্ঞেস করে, "কিন্তু মিহিরদা, ওরা তো সবাই যাত্রা দেখছিল। জগুবাবুকে কে ঠেলে ফেলল তা হলে ?"

"কেউই ঠেলে ফেলেনি। জগুবাবু স্বয়ং ওই দরজা দিয়ে নীচে···না, লাফ মেরেছেন বলব না, বলব, পড়ে গেছেন।"

মিহিরের নির্দেশে চার ভাইকেই এবার একসঙ্গে ডেকে আনা হয়েছে ঘরে। অমল সবচেয়ে সপ্রতিভ। চেয়ার টেনে বসতে যাচ্ছিল। লাফিয়ে উঠল মিহির, "বসছিস কী ? দাঁড়িয়ে থাক ! ওই দেওয়ালে পিঠ রেখে ! যা !"

মিহিরের রুদ্রমূর্তি দেখে প্রতিবাদ করতে গিয়েও সামলে নিল অমল। চারভাই যেন ফায়ারিং স্কোয়াডের সম্মুখীন। মিহির তাদের সামনে দিয়ে ঘরের এ-মাথা ও-মাথা টহল দিতে-দিতে ছেঁড়া-ছেঁড়া বাক্যে একের-পর-এক রহস্যের দরজা খুলে চলেছে।

"প্রথম সন্দেহ ওই আর্তরব। যা আত্মঘাতী মানুষের পক্ষে বেমানান। দ্বিতীয় সন্দেহ, লোহার শিকে কাপড়ের ফালি। শুধু তাই নয়, জগুবাবু পড়ার সময় ওই শিকে ধাক্কা খেয়েছেন। তা না হলে ওইভাবে তিনি পড়তেন না। যে আত্মহত্যা করবে, সে ওটা বাঁচিয়েই করবে। তৃতীয় সন্দেহ, অমল আমাদের নিয়ে জগুবাবুর ঘরের সামনে পৌঁছে নির্দ্বিধায় চাবি ঢুকিয়ে ঘরের দরজা খুলে দিল। দরজায় ইয়েল লক। ভেতর থেকেও তো জগুবাবু বন্ধ করে রাখতে পারতেন। তা হলে চাবি ঘুরিয়েও খুলত না। এতটা নিশ্চিত হল কী করে ? বিশেষ করে এরকম দুর্ঘটনার পর ? নেক্সট, এবার আর সন্দেহ নয়, প্রমাণ। যে-দরজা জগুবাবুর মৃত্যুর কারণ, সেটা আঁটা ছিল একটা কাঠের ফালি দিয়ে। স্ক্রু লাগিয়ে। মরচে ধরা চারটে স্ক্রুও রয়েছে, রয়েছে একটা স্ক্রু ড্রাইভারও। কিন্তু—"

হঠাৎ চার ভাইয়ের দিকে ফিরে তাকাল মিহির। না, কোনও বিকার নেই তাদের। মিহির আবার শুরু করল, "কিন্তু এতদিনের পুরনো স্ক্রু, অন্ধকারের মধ্যে খুললেন জগুবাবু, তবু তাতে কোনও আঁচড়ের চিহ্নটি নেই। একবারও হাত ফসকে স্ক্রু ড্রাইভার স্লিপ করেনি বা স্ক্রুয়ের মাথায় স্ক্রু ড্রাইভার বসাবার চেরা ঘাটটার বাইরে পড়েনি।"

"মামাবাবুর মতো মেকানিক···"

অমলের ঔদ্ধত্যকে এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিল মিহির, "কিন্তু বিশ্বকর্মাও অন্ধ হলে হাতড়াতে বাধ্য। সাড়ে আটটা থেকে লোডশেডিং। ঘরে কোনও মোমবাতি বা টর্চ নেই। চশমাটা রয়েছে

টেবিলে। আত্মহত্যার সব ব্যবস্থা করার পর কেউ নিশ্চয় চশমাটা ঘরের আর-এক প্রান্তে টেবিলের ওপর খুলে রেখে আসে না !"

আবার অমলের অচঞ্চল গলা শোনা গেল, "মনে হচ্ছে ঘরে একটা হ্যারিকেন···"

"আছে, কিন্তু একফোঁটা তেল নেই। বহুদিন হাত পড়েনি। এর থেকে কী দাঁড়াচ্ছে তা হলে ব্যাপারটা ? এই চার মক্কেলই আজ যাত্রা দেখতে বেরোবার আগে সব ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। হয় ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়েছিলেন মামাকে, তারপর ওই দরজাটি খোলা কিংবা জগুবাবু সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ার পর—বাই দ্য বাই, ওই দরজার ছিটকিনিটাতেও দেখবেন তেল দেওয়া হয়েছে। এটা নিশ্চয় আত্মহত্যাকারীর···"

মিস্টার বোস উঠে দাঁড়ান, "ঘটক ! মিহির !" উত্তেজনায় সম্বোধনটাও ঠিকভাবে করতে পারেন না। "সবই মানছি কিন্তু সাড়ে দশটার সময় জগুবাবু যখন···"

মিস্টার বোসের দিকে পেছন ফিরে মিহির চার ভাইয়ের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে একমুখ হাসি নিয়ে বলল, "সত্যি, বাংলা খাটের বেজায় ওজন। ও জিনিস আপনারা একসঙ্গে চার জনে হাত না লাগালে ঘোরাতে পারতেন না।"

একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে কমল মেঝের ওপর পড়ে গেল !

"কি বলেছি ? হত্যাকারীদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল চরিত্র।"

মন্তব্যের সঙ্গে একটা সিগনিফিকেন্ট ইঙ্গিত পাঠিয়ে দিল মিহির থানার বড়বাবুর কাছে।

"প্লিজ, মিহির, শেষ করুন।" মিস্টার বোসের অনুরোধ।

"জগুবাবু ঘুমিয়ে পড়ার পর তার খাটটাকে এই চার খুনে মিলে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। আপনি ওপরে গিয়ে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, যে ঘুরিয়ে বসাবার পর খাটের চারটে পায়া ঠিক দাগে-দাগে মেলেনি—মেঝেতে পুরনো দাগের সঙ্গে একটু ছুট হয়ে গেছে। ব্যাপারটা কি বুঝেছেন এবারে ? জগুবাবু হোমিওপ্যাথির ভক্ত হলেও ডায়েবিনিজ খান, তার মানে তিনি ডায়েবিটিক। চশমা খুলে শোন। রাত্তিরে নেচারস কলে তাঁকে উঠতেই হয়। আজও উঠেছিলেন, এবং অভ্যাস-বশত, খাটের বাঁ দিক দিয়ে নেমে, সামনেই বাথরুমের দরজায় ছিটকিনি খুলে···কিন্তু আজ তিনি তাঁর হিসেবে সব ঠিক করলেও যে-দরজাটা খুলেছিলেন সেটা বাথরুমের নয়, মৃত্যুর···"

"মাই গড্ ! মাই গড্ !" কুড়ি বছরের পুলিশ জীবনের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও মিস্টার বোস বিচলিত। দীপক, অরুণ ও সমীরের কথা না বলাই ভাল।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় মিস্টার বোসের ফোন পেল মিহির। স্ক্রু ড্রাইভারে জগুবাবুর হাতের স্পষ্ট ছাপ পাওয়া গেছে। অর্থ জলবৎ। পাঁচ-ছ' বছরের পুরনো স্ক্রু খোলার জন্য যেরকম হাতের মোচড় ও চাপ লাগে তাতে হাতের ছাপ সব ঘষটে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে যাওয়ার কথা। জগুবাবু ঘুমিয়ে পড়ার পর তাঁর হাতের ছাপ বসিয়ে নিয়েছিল খুনিরা স্ক্রু ড্রাইভারের হাতলে।

লোকটার হাবভাবে কেমন যেন খটকা লাগে টুবলুর। আগে কখনও দেখেনি ও লোকটাকে। গায়ের রঙ শ্যামলা, একমুখ দাড়ি, চোখে কালো চশমা। একটা চিত্তির-বিচিত্তির জামা চাপিয়েছে গায়ে, পরনে চাপা প্যান্ট আর পায়ে হাওয়াই চপ্পল। ডান হাতে শিখদের মতো একটা বালাও আছে। দু-তিন দিন ধরে ঘুর-ঘুর করছে পাড়ায়।

টুবলুর সন্দেহ করার আরও একটা কারণ আছে। হেমেন রায়ের গোয়েন্দা-গল্পের ভীষণ ভক্ত ও, মনে মনে ইচ্ছে, বড় হয়ে ও একজন শখের গোয়েন্দা হবে। তাই ওর বয়সী ছেলেদের চাইতে ওর চিন্তা-ভাবনা আলাদা। টুবলুর বয়স অবশ্য বেশি নয়, চোদ্দ, ক্লাস নাইনে পড়ে, কিন্তু ওর জ্ঞানের বহরের জন্য বন্ধুরা ওকে রীতিমত সমীহ করে চলে।

সদ্য টাইফয়েড থেকে উঠেছে টুবলু, তাই এখন কিছু দিনের জন্য ইস্কুল যাওয়া বন্ধ। দোতলার বারান্দায় বসলে পাড়ার এ মাথা থেকে ও মাথা দেখা যায়। তাই দেখে আর গল্পের বই পড়ে সময়টা ওর মন্দ কাটছে না। সেই সূত্রেই লোকটির ওপর নজর পড়েছে ওর। একটা ব্যাপার কিন্তু সত্যিই সন্দেহজনক, লোকটা বেলা এগারোটার আগে আসে না। বাড়ির বাবুরা আপিসে আর ছেলেমেয়েরা ইস্কুল-কলেজে চলে যাওয়ার পর পাড়াটা যখন খাঁ-খাঁ করে, তখন আসে লোকটা। বার দু-তিন রাস্তার এ মোড় থেকে ও মোড় টহল দেয়, দু'পাশের বাড়ি-গুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, তারপর চলে যায়। কী মতলব লোকটার!

মায়ের কাছে কথাটা বলি-বলি করেও শেষ পর্যন্ত বলতে পারে না টুবলু। মা হয়ত বিশ্বাসই করবে না, বলবে, ডিটেকটিভ বই পড়ে পড়ে ওর মাথায় পোকা ঢুকেছে। তা ছাড়া মা একটু ভিতু প্রকৃতির, কী দরকার মাকে মিছিমিছি বিব্রত করার। কিন্তু মনটা খুঁত খুঁত করে ওর।

ঠিক চতুর্থ দিন ঘটল ঘটনাটা। টুবলু বারান্দায় ইজিচেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় একটা বই খুলে বসে ছিল, কিন্তু ওর চোখ দুটো ছিল রাস্তার ওপর। আজ লোকটা আসতে দেরি করছে।

তারপরই চমকে উঠল ও। লোকটা আসছে, তবে একা নয়, ওর সঙ্গে আরো দুজন। তাদের চেহারাও সুবিধের নয়, কেমন যেন একটা বেপরোয়া ভাব। টুবলুর বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠল।

ওরা গট-গট করে এগিয়ে আসছে, একজনের হাতে একটা থলি।

লোক তিনজন ওদের বাড়ির দিকেই এগিয়ে আসছে। বুকের ভেতরটা শুকিয়ে গেল টুবলুর, একটা বিপদের আশঙ্কায় খাড়া হয়ে উঠল গায়ের লোম।

না, ওদের বাড়ি নয়। ওদের ঠিক উলটো দিকের বাড়ির সামনে এসে থামল ওরা, সন্দেহ-জনকভাবে তাকাতে লাগল এপাশ-ওপাশ। তারপরই ওদের বারান্দার দিকে। ভাগ্যিস টুবলু বুদ্ধি করে বই দিয়ে মুখটা আড়াল করেছিল, যেন ওদের দেখতে পায়নি, বইয়ের পাতায় ডুবে আছে। আসলে বইয়ের ঠিক ওপর দিয়ে সব কিছুই ও লক্ষ্য করছিল।

টুবলুদের সামনের বাড়িটা তেতলা। একতলায় থাকেন অনিমেষবাবু। তাঁর ছোট ছেলে গদাই টুবলুর বন্ধু। দোতলায় থাকেন এক মাদ্রাজী পরিবার। নতুন এসেছেন এই পাড়ায়, শুধু স্বামী স্ত্রী। দুজনেরই বয়স কম, বোধহয় নতুন বিয়ে হয়েছে। অনেক মালপত্তর এসেছে, দামী দামী সব জিনিস। বয়স কম হলেও ভাল চাকরি করেন নাকি ওই মাদ্রাজী ভদ্রলোক, গদাইয়ের মুখে শুনেছে টুবলু। তেতলায় বাড়িওলা, রামদাসবাবু।

একতলার ফ্ল্যাটের পাশ দিয়েই একটু সরু ঢাকা গলি মতো, তারপরই সিঁড়ি তিনতলা পর্যন্ত চলে গেছে। গলির মুখে একটা কোলাপসিবল গেট, সেটা বন্ধ হয় রাত দশটায়। একতলার ফ্ল্যাটের সঙ্গে ওই সিঁড়ির কোনো সম্পর্ক নেই।

লোক তিনজন হঠাৎ ঢুকে পড়ল ওই কোলাপসিবল গেট দিয়ে কেউ লক্ষ্যই করল না। এক মিনিট। কলিং বেলের শব্দ। কান খাড়া করল টুবলু, উত্তেজনায় ও উঠে দাঁড়িয়েছে। ওর মন বলছে, নিশ্চয়ই কিছু একটা অঘটন ঘটতে চলেছে। লোক তিন-জনকে দেখেই ওর কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল, ওদের হাব-ভাব ভাল লাগেনি।

পরপর কয়েকদিন কাগজে ডাকাতির খবর বেরিয়েছে। দুপুরে বাড়ির পুরুষরা যখন বাড়ি ছিল না, তখন হানা দিয়েছিল ডাকাতরা। একটা ঘটনায় বাড়ির গিন্নি বাধা দিতে গিয়ে ছোরার আঘাতে ভীষণ আহত হয়েছেন, তাঁকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে।

মেয়েলী গলায় একটা চাপা আওয়াজ হল না? দড়াম করে দরজা বন্ধ করার শব্দ! না, আর কোনো সন্দেহ নেই টুবলুর মনে। এক ছুটে ও ঘরে চলে এল। মা কী একটা কাজ করছিলেন, ওর অমন ভাব দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে? দৌড়চ্ছিস কেন?"

"মা···" হাঁপাতে হাঁপাতে টুবলু বলল, "তিনটে লোক···গুণ্ডার মতো···গদাইদের বাড়ির··· সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। আমার মনে হল···একটা চিৎকার শুনতে পেলাম···জোরে দরজা বন্ধ হবার শব্দ···"

ওর মায়ের মুখ শুকিয়ে গেল।

"হয়ত মিস্তিরি-টিস্তিরি," তিনি মনে সাহস এনে বললেন।

"না, মিস্তিরি নয়। ওদের একজন তিনদিন ধরে আমাদের পাড়ায় ঘোরাঘুরি করছিল, ওর বাড়ির দিকে তাকাচ্ছিল, আমি বারান্দা থেকে দেখছি...।" আবার হাঁপাতে থাকে টুবলু।

"কী হবে!" ওর মা অসহায়ের মত বললেন।

"আমি লালবাজারে ফোন করব?" টুবলুর বুদ্ধি যেন খেলতে শুরু করে দিয়েছে।

"লালবাজারের ফোন নম্বর তুই জানিস?"

"হ্যাঁ, একদিন কাগজে জরুরি সব টেলিফোনের নম্বর দিয়েছিল, তার মধ্যে লালবাজারও ছিল। আমি টুকে রেখেছি।"

"কিন্তু", এবার ওর মা একটু বাধো-বাধো গলায় বললেন, "যদি তোর ভুল হয়? পুলিস এসে দেখে, কিচ্ছু না?"

"তাতে না হয় আমাকে একটু বকাবকি করবে, কিন্তু যদি সত্যিই কিছু হয় আর আমরা জেনেশুনে চুপ করে থাকি, তবে...?"

"তোর বাবার আপিসে একটা ফোন করলে হত না?"

"এখন আর সময় নেই মা," টেলিফোনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে জবাব দিল টুবলু।

ওর ভাগ্য ভাল, একবারেই লালবাজার পেয়ে গেল। টুবলু ঝড়ের মতো সব কিছু বলে গেল। ওদের বাড়ির নম্বর, ওর নাম, রাস্তার নাম, নিশানা, কিছুই বাদ দিল না। হেমেন রায়ের জয়ন্তর মত ওর মাথা খেলতে শুরু করে দিয়েছে।

"আমরা কাছাকাছি বেতার ভ্যানকে খবর দিচ্ছি, এখুনি যাবে, আপনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকুন, বাড়িটা দেখিয়ে দিতে সাহায্য করবেন।" লালবাজার অনুরোধ করল।

টুবলুর নিজেকে বড় বলে মনে হল পুলিসের লোক ওকে আপনি করে বলেছে। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে ও রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

এদিকে সামনের বাড়িটায় সত্যিই তখন ডাকাতি হচ্ছে।

কলিং বেলটা বেজে উঠতেই মাদ্রাজী বউটি দরজা খুলে একটু ফাঁক করেছেন। কলকাতায় নতুন এসেছেন, হালচাল কিছুই জানেন না।

দরজা ফাঁক হতেই ঘরে ঢুকে পড়ল তিনজন লোক, বউটিকে ধাক্কা দিয়েই। বউটি চিৎকার করবার জন্য হাঁ করলেন, কিন্তু একটা থাবা চেপে ধরল হাঁ-করা মুখে। আরেকজন লাথি মেরে বন্ধ করে দিল দরজাটা, তারপর ছিটকিনি তুলে দিল। তৃতীয়জন একটি ছোরা ধরল বউটির নাকের ডগায়। আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল, বাড়াবাড়ি করলেই নাকটা কেটে শূর্পণখা করে দেবে। দু চোখ বড় বড় হয়ে গেল বউটির, গোল হয়ে ঘুরতে লাগল, তারপরেই মূর্ছা। চটপট একটা বড় তোয়ালে দিয়ে তাঁর মুখ বেঁধে ফেলল একজন।

প্রায় মিনিট পনেরো ধরে সারা ফ্ল্যাটটা তারা তছনছ করল। দামী জিনিসপত্তর যা পেল

ভরল বড় একটা থলিতে। ভাল জামা-কাপড় একটা বোঁচকায় বেঁধে নিল। বউটির ততক্ষণে জ্ঞান হয়েছে, ফ্যালফ্যাল করে দেখছেন ওদের কাণ্ডকারখানা।

জিনিসপত্তর নিয়ে ডাকাতরা খুশি মনে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ভাল দাঁও মারা গেছে। একজন দরজাটা একটু ফাঁক করে মাথা গলিয়ে বাইরেটা দেখে নেবে, তারপর পথ পরিষ্কার বুঝলে ভাল মানুষের মতো নেমে যাবে। বোঁচকাটা একজন মাথায় নিয়েছে, যেন বাড়ি থেকে ধোপা বেরুচ্ছে।

দরজাটা ফাঁক হতেই একটা চকচকে কালো রিভলবারের নল লোকটার বুকে চেপে বসল, চমকাবারও সময় পেল না সে। ওই অবস্থাতেই তাকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে আরও কয়েকজন ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর, সবাই সশস্ত্র। চোখের নিমেষে কাবু করে ফেলল বাকি দুজনকে। তারপর তিনজনকেই চ্যাংদোলা করে নিয়ে গিয়ে বাইরের কালো রংয়ের বড় গাড়িটায় তুলল। বাইরে ততক্ষণে ছোটখাট একটা ভিড় জমে গেছে।

পরদিন খবরের কাগজে টুবলুর ছবি বেরুল, সেই সঙ্গে ফলাও করে ওর বুদ্ধি আর সাহসের কাহিনী। ছবিসমেত কাগজের ছাপা অংশটা বাঁধিয়ে নিজের ঘরের দেয়ালে যত্ন করে টাঙিয়ে রেখেছে টুবলু।

গোয়েন্দা বরদাচরণ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

গোয়েন্দা বরদাচরণ একটা লাউ চুরির কেস নিয়ে খুবই চিন্তিত ছিলেন। কে বা কারা পরশু দিন ন'পাড়ার মোক্ষদা দিদিমার ঘরের চাল থেকে একটি নধর লাউ চুরি করে নিয়ে গেছে। মোক্ষদা দিদিমার নাতি নাড়ুগোপাল বাইরে চাকরি করে, সে বড় লাউয়ের ডাল ভালবাসে। নাতির জন্য লাউটা খুব যত্নে রেখেছিল দিদিমা। আজকালের মধ্যে নাড়ুগোপালের আসার কথা। কিন্তু এর মধ্যেই পরশুদিন লাউটা চুরি গেছে। দিদিমা কেঁদে কেটে এসে পড়লেন বরদাচরণের কাছে, "ও বাবা বরদা, আমার লাউ উদ্ধার করে এনে দাও।"

সেই থেকে বরদাচরণের ঘুম নেই, খাওয়া নেই। সঙ্গে অ্যাসিস্ট্যান্ট আর কুকুর নিয়ে সারাদিন আতসকাচ হাতে করে মোক্ষদা দিদিমার সারা বাড়ি, ঘরের চাল, পাড়া-প্রতিবেশীদের আনাচে কানাচে তন্নতন্ন করে ক্লু খুঁজেছেন। তারপর বাড়ি এসে সারাদিন বসে ভেবেছেন, কাগজ কলমে কী যেন লিখেছেন আর মাঝেমাঝে "হুঁ হুঁ বাবা নাঃ, হচ্ছে না! গোছের কথা বলেছেন আপনমনে।

বরদাচরণের বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হবে। বাড়িতে বুড়ী মা আছেন আর আছে তার অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাগ্নে চাক্কু, আর পোষা নেড়ী কুকুর ডঙ্কি। বরদাচরণ কিছু মোটাসোটা মানুষ, ডন-বৈঠক করা শরীর। ভাগ্নে চাক্কু রোগা হলেও জুডো জানে। ডঙ্কি খুবই ভাল ঘেউ-ঘেউ করতে পারে।

চাক্কু এসে বারবার খোঁজ করে যাচ্ছে, "মামা কিছু ভেবে পেলে?"

বরদা খুবই অন্যমনস্কভাবে বলেন, "বোটা দেখে তো মনে হয় লাউটা বেশ বড়সড়ই ছিল।"

"তা ছিল।"

"লাউটা বোঁটা কেটে নেওয়া হয়নি, মুচড়ে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে।"

"হুঁ, ঠিক ধরেছ।"

টিনের চালের ওপর একটা বড় লাউকে মুচড়ে বোঁটা ছিঁড়ে নেওয়া হল, অথচ কোনো শব্দ হয়নি। মোক্ষদা দিদিমার ছেঁড়া মশারির মধ্যে প্রচুর মশা ঢুকে পড়েছিল বলে দিদিমার সে-রাতে ভাল ঘুম হয়নি, শব্দ হলে তাঁর টের পাওয়ার কথা।

চাক্কু চিন্তিতভাবে বলে, "সে ঠিক, তবে মোক্ষদা দিদিমা আবার কানে একটু খাটো কিনা।"

এই সময় বাইরে ডঙ্কি ঘেউ-ঘেউ করে উঠল, কে একজন চেঁচিয়ে বলল, "কুকুর সামলান!"

চাক্কু ছুটে বাইরে গেল। একটু বাদে একজন বেশ ভাল চেহারার লোক ঘরে ঢুকেই বললেন, "বরদাবাবু, একটা মার্ডার কেস।"

বরদাচরণ গম্ভীরভাবে তাঁকে বসতে বলে কেস ডায়েরির খাতাটা টেনে নিয়ে কলম বাগিয়ে

বললেন, "ডিটেলস বলুন।"

"আমার পোষা কাকাতুয়াটাকে আজ সকালে তার দাঁড় থেকে মৃত অবস্থায় ঝুলে থাকতে দেখা গেছে।"

বরদাচরণ ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "এটা যে অস্বাভাবিক মৃত্যু তা কী করে বুঝলেন ?"

"খুবই স্বাভাবিকভাবে।" ভদ্রলোক উদভ্রান্ত মুখে বললেন, "পাখিটার প্রতি আমার প্রতিবেশী রামচন্দ্রের অনেকদিনের লোভ। সে প্রায়ই বলত, অম্বুজাক্ষ, তোমার কাকাতুয়াটা বড় চমৎকার হরির নাম করে হে! তখন থেকেই ওর মতলব আমার ভাল ঠেকেনি। আজ সকালে পাখিটাকে ঝুলতে দেখে আমি দাঁড়ে-রাখা জল আর পাখির খাবার পরীক্ষা করি। আমার মনে হচ্ছে, জলে বা খাবারে বিষ মেশানো আছে।"

বরদাচরণ ডায়েরি বন্ধ করে উঠলেন, পিস্তলটা ড্রয়ার থেকে বের করে পকেটে ভরলেন। আতসকাচ, দড়ি ক্যামেরা, এবং কী ভেবে টেপ-রেকর্ডারটাও সঙ্গে নিলেন। চাক্কু এবং ডঙ্কিকেও তৈরি হতে বললেন। তারপর ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বললেন, "অম্বুজাক্ষবাবু,কেসটা অত সরল নাও হতে পারে। রামচন্দ্রবাবুর যেমন মোটিভ থাকতে পারে, আবার কাকাতুয়াটা সুইসাইডও করতে পারে, কিংবা এর পেছনে হয়তো আরও অনেক গভীর চক্রান্ত হয়েছে।"

বেরোবার সময়ে বরদাচরণের মা ডেকে বললেন, "বরদা, দুটি পান্তাভাত খেয়ে যাবি না ?"

কে শোনে কার কথা! বরদাচরণ বেরিয়ে পড়লেন।

অম্বুজাক্ষবাবুর বাড়িটা বেশ বড়। পিছনে একটা ঢাকা দরদালানে অনেকগুলো খাঁচা, আর দাঁড়ে বিস্তর পাখি চেঁচামেচি করছে।

বরদাচরণ কাকাতুয়ার দাঁড়টা ভাল করে দেখলেন। পাখিটা পায়ে বাঁধা শিকলি থেকে তখনো ঝুলছে। দাঁড়ের দুদিকে দুটি বাটিতে জল আর কাবলি ছোলা। একটা ছোলা তুলে নিয়ে পিছনের উঠানে ছুঁড়ে দিলেন বরদাচরণ, একটা কাক সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসে সেটা খেয়ে ফেলল। কিছুক্ষণ বরদাচরণ কাকটাকে লক্ষ্য করলেন। না, কাকটা মরল না। তার অর্থ, ছোলায় বিষ নেই। জল থেকে খানিকটা ড্রপারে তুলে নিয়ে বরদাচরণ এদিক ওদিক তাকিয়ে অম্বুজাক্ষবাবুদের পোষা কাবলি বেড়ালটাকে একটা কাঠের বাক্সের ওপর বসে থাকতে দেখে এগিয়ে গিয়ে আচমকা চেপে ধরলেন সেটাকে। অম্বুজাক্ষ হাঁ-হাঁ করে এগিয়ে এসে বাধা দেওয়ার আগেই বরদাচরণ বেড়ালকে অদ্ভুত কৌশলে হাঁ করিয়ে ড্রপারের জল তার মুখগহ্বরে ফেলে দিলেন। বেড়ালটা বারকয় খুব আপত্তিকর শব্দ করল বটে, কিন্তু মরল না।

বরদাচরণ গম্ভীরভাবে বললেন, "হুঁ।"

ওদিকে অম্বুজাক্ষবাবু একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশি থেকে কয়েকটা বড়ি খেয়ে আপনমনেই বললেন, "গায়ে হাতে বড্ড ব্যথা।"

ওদিকে চাক্কু ডঙ্কির বকলস ধরে বাড়ির চারদিক ঘুরে ঘুরে কু খুঁজছিল। হঠাৎ সে দৌড়ে এসে বরদাচরণের কানে-কানে বলে গেল, "লাউয়ের খোসা! রামচন্দ্রবাবুর বাড়ির পিছন দিকে

লাউয়ের খোসা পড়ে আছে, মামা।"

বরদাচরণ বিদ্যুৎবেগে উঠে পড়লেন।

বুড়ো মানুষ রামচন্দ্রবাবু ঘরে বসে রামায়ণ পড়ছিলেন। বরদাচরণকে দেখে যেন একটু চমকে উঠে বললেন, "আরে, আসুন আসুন বরদাবাবু! বিখ্যাত লোকদের দেখা পাওয়া এক মস্ত সৌভাগ্য।"

বরদাচরণ বসলেন। স্থির চোখে কিছুক্ষণ রামচন্দ্রবাবুকে স্টাডি করে দেখলেন তিনি।

রামচন্দ্রবাবু রামায়ণ বন্ধ করে বললেন, "ভাবছিলাম, আজই আপনার কাছে একবার যাব। আমার উঠোনের নারকোল গাছ থেকে রাতে ছটা নারকোল কে বা কারা চুরি করে নিয়ে গেছে। খুবই রহস্যময় ব্যাপার। বাইরে থেকে কারো পক্ষে উঠোনে আসা খুবই শক্ত। তবে—"

বলে রামচন্দ্রবাবু খুবই ইংগিতপূর্ণভাবে চুপ করে গেলেন।

বরদাচরণ ডায়েরিতে কেসটা লিখে নিতে-নিতে বললেন—"কিছু গোপন করবেন না রামচন্দ্রবাবু।"

রামচন্দ্রবাবু লাজুক হাসি হেসে বললেন, "না, গোপন করে লাভ নেই। আপনার চোখকে কি ফাঁকি দেওয়া সম্ভব! বলেই ফেলি।" বলে গলাটা নিচু করে বললেন, "পাশের বাড়ির অম্বুজটা মহা নারকোল-খোর। দুবেলা নারকোল খায়। বড়া করে খাচ্ছে, নাড়ু বানিয়ে খাচ্ছে, মুড়ি দিয়ে খাচ্ছে, অমন নারকোল খেতে কাউকে দেখিনি। প্রায় সময়েই আমাকে বলে, "রামচন্দ্র-বাবু, আপনার গাছে বিস্তর নারকোল হয়েছে দেখছি! আমার সন্দেহ, কাল রাতে—"

"হুঁ।" বরদাচরণ খুবই গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটু আগেই তিনি আম্বুজাক্ষবাবুকে গায়ের ব্যথার জন্য হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেতে দেখেছেন। গায়ের ব্যথা তো হবেই। এই বয়সে যদি এত উঁচু নারকোল গাছে কেউ ওঠে তবে ব্যথা হওয়াই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু খুঁজেপেতেও অম্মুজাক্ষবাবুর বাড়িতে নারকোল বা নারকোলের ছোবড়া পাওয়া গেল না। এটাও রহস্যজনক। কারণ, নারকোল খাওয়া যার নেশা, তার বাড়িতে নারকোলের চিহ্নও খুঁজে না-পাওয়াটা খুবই অস্বাভাবিক।

কিন্তু রামচন্দ্রবাবুর বাড়ির পিছনে চাক্কুর কথামত লাউয়ের খোসা ঠিকই পাওয়া গেল। পরিষ্কার ক্লু।

কিন্তু বরদাচরণ চট করে কিছু করেন না। অপরাধীকে সময় দেন। তাকে যে সন্দেহ করা হচ্ছে, তা টেরও পেতে দেন না।

মোক্ষদা দিদিমাকে লাউয়ের ব্যাপারে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করবেন বলে বরদাচরণ ভরদুপুরে দিদিমার বাড়ি এলেন। প্রশ্নগুলো এরকম,—লাউয়ের রংটা কীরকম ছিল, গাঢ় সবুজ না সাদাটে? লাউয়ের গায়ে এক জায়গায় একটা পোকার গর্ত ছিল কিনা! বোঁটার কাছে এক জায়গায় একটা নখ বসানোর দাগও পাওয়া যাচ্ছে। রামচন্দ্রবাবুর বাড়ির পিছনের আস্তাকুঁড় থেকে সবকটা লাউয়ের খোসা কুড়িয়ে এনে বরদাচরণ তার মধ্যে এইসব অকাট্য চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন।

যখন মোক্ষদা-দিদিমাকে জেরা করছিলেন বরদাচরণ, তখনই হঠাৎ চাক্কু এসে চুপিচুপি কানে কানে খবর দিয়ে গেল, "মামা, মোক্ষদা দিদিমার ভাঁড়ার ঘরে এক বস্তা নারকোলের ছোবড়া। আর ছ'টা খোসা-ছাড়ানো নারকোল।"

মাথাটা ঘুরে গেল বরদাচরণের। কেসগুলো খুবই জড়িয়ে যাচ্ছে। অসম্ভব জটিল হয়ে উঠছে। মোক্ষদা-দিদিমার বাড়িতে নারকোল গাছ নেই, তবে ছোবড়া বা নারকোল আসে কোত্থেকে? ওদিকে রামচন্দ্রবাবুর বাড়ির চুরি-যাওয়া নারকোল অম্বুজাক্ষবাবুর বাড়িতে পাওয়া যায়নি। নারকোলের সংখ্যাটাও আশ্চর্যজনকভাবে মিলে যাচ্ছে।

ভাবতে ভাবতে বরদাচরণ উঠে পড়েন। পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে দেখে নেন ছ'টা চেম্বারেই গুলি ভর্তি আছে কিনা। আছে।

রাস্তায় পা দিতেই একটা গাড়ি সামনে ঘ্যাঁস করে থামল। গাড়ির ভিতরে এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। তিনি হাতজোড় করে বললেন, "আসুন বিখ্যাত গোয়েন্দাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ধন্য হই।"

বরদাচরণ উঠলেন। চাক্কু আর ডঙ্কিও উঠল সামনের সীটে। অচেনা ভদ্রলোক গলা নিচু করে বরদাচরণকে বললেন, একটা খুবই রহস্যময় কাণ্ড ঘটে গেছে। কাল আমার একটা বুড়ো কাকাতুয়া মারা গেছে। খুবই প্রিয় পাখি ছিল আমার। ঠিক করেছিলাম পাখিটার মৃতদেহ একটা ভাল জায়গায় কবর দিয়ে ওপরে একটা চমৎকার সমাধি তৈরী করে দেব। কিন্তু বিপদ হল, কাকাতুয়াটার মরদেহ একটা নাইলনের ব্যাগে ভরে বাইরের বারান্দায় রেখে গতকাল আমি ড্রাইভারকে গাড়ি বের করার কথা বলতে গিয়ে ফিরে এসে দেখি, ব্যাগটা নেই। কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড বলুন! কেসটা যদি আপনি নেন!"

বরদাচরণ সবই টুকে নেন ডায়েরিতে। গম্ভীরভাবে বলেন, "হুঁ, কাকাতুয়ার কেস দুটো হল তা হলে! আশ্চর্য!"

বলে চিন্তিত বরদাচরণ বাড়ির সামনে নেমে গেলেন।

দুপুরে খুবই অন্যমনস্কভাবে খেতে বসেছেন বরদাচরণ। কী খাচ্ছেন তা বুঝতেই পারছেন না। লাউ, কাকাতুয়া, নারকোল, সব জট পাকিয়ে আছে মাথায়। তাঁর মা বললেন, "ও বরদা, লাউঘণ্ট দিয়ে আর দুটো ভাত মাখ্।"

লাউঘণ্ট কথাটা বরদাচরণের মাথার মধ্যে দু-একবার টংটং শব্দ করল। প্রায়ই তিনি লাউঘণ্ট খান, কাজেই বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

হঠাৎ বরদাচরণ চমকে উঠে বললেন, "লাউঘণ্ট! লাউ এল কোথা থেকে? আমি তো আজ বাজার থেকে লাউ আনিনি!"

মা বলেন, "তুই আনবি কেন? কাল চাক্কু লাউটা হাতে করে এনেছে, ওর কোন্ বন্ধুর বাড়িতে নাকি অনেক লাউ হয়েছে, তারা দিল।"

নিজের পাতের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলেন বরদাচরণ। লাউঘণ্টের পাশে দুটো বা

পড়ে আছে। উঠে গিয়ে আতসকাচ নিয়ে এসে বড়াটা নিবিষ্টভাবে দেখেছেন, মা বললেন "দেখছিস কী! ও তো নারকোলের বড়া। ছটা নারকোল এনেছিল চাক্কু, কোন গাছ থেকে নাকি পড়ে গিয়েছিল বাতাসে। তার দুটো ভেঙে ঐ বড়া করেছি।

বরদাচরণ বাকি সময়টা ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করে উঠে পড়লেন। চাক্কু অনেক আগেই খেয়ে-দেয়ে কোন্ মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে পড়া বুঝতে গেছে।

বরদাচরণ পিস্তল আর আতসকাচ নিয়ে ডিঙ্কর শেকল ধরে ঘর থেকে বেরোলেন। তন্ন-তন্ন করে খুঁজতে লাগলেন চারদিক। অবশেষে ডিঙ্ক ইংগিত বুঝতে পেরে তাঁকে গোয়ালঘরে টেনে আনল। সেখানে একটা সদ্য-কেনা দাঁড়ে জলজ্যান্ত একটা কাকাতুয়া বসে আছে। বরদাচরণকে দেখেই বলে উঠল "হরি বল, হরি বল ভাই, হরি ছাড়া গতি নাই।"

বরদাচরণ টেপ-রেকর্ডার নিয়ে এসে পাখিটার কথা টেপ করতে লাগলেন।

তারপর সারা দুপুর আর সন্ধ্যে, আর্কিমিডিস যেমন স্নানের চৌবাচ্চায় ডুব দিয়ে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটির চিন্তা করেছিলেন, তেমনি এক চিন্তার চৌবাচ্চায় ডুবে থেকে বরদাচরণও লাউ, কাকাতুয়া আর নারকোলের রহস্যে মগ্ন রইলেন। তারপর আর্কিমিডিস যেমন 'ইউরেকা' বলে লাফিয়ে উঠেছিলেন, ঠিক তেমনি তিনিও লাফিয়ে উঠলেন। সমস্ত রহস্যটাই তাঁর কাছে জল হয়ে গেছে।

বস্তুত তিনি এখন বুঝতে পেরেছেন, যে-লোকটা মোক্ষদা দিদিমার লাউ চুরি করেছে, সেই একই লোক গতকাল গাড়িওলা ভদ্রলোকের মৃত কাকাতুয়াটা হাতসাফাই করে অম্বুজাক্ষবাবুর জ্যান্ত কাকাতুয়ার দাঁড়ে ঝুলিয়ে রেখে হরিনামপরায়ণ জ্যান্ত কাকাতুয়াটাকে সরিয়ে ফেলে। আবার সেই লোকটাই কোনো এক অজ্ঞাত কারণে রামভক্ত রামচন্দ্রবাবুর নারকোল গাছের ছটা নারকোলও গোপনে নামিয়ে নেয়। এবং ঐ একই অপরাধী প্রমাণ লোপের চেষ্টায় এবং তদন্তকে বিভ্রান্ত করার জন্য বরদাচরণকে রামচন্দ্রবাবুর বাড়ির পিছনে লাউয়ের খোসার সন্ধান দেয়, এবং মোক্ষদাদিদিমার বাড়িতে নারকোল-ছোবড়ার অস্তিত্বের কথা ফাঁস করে দেয়।

বেশ রাত হয়ে গেছে। সবাই গভীর ঘুমে। বরদাচরণ পিস্তল হাতে নিয়ে চুপিসাড়ে পাশের ঘরে এসে অন্ধকারে চেয়ে রইলেন। আবছা দেখা যাচ্ছে, দিদিমার বুক ঘেঁষে শুয়ে চাক্কু ঘুমোচ্ছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন গোয়েন্দা বরদাচরণ। না, এক্ষুনি তিনি কিছু করবেন না। অপরাধীকে তিনি সবসময়ে আরও সুযোগ দেন। তাতে অপরাধীকে যে সন্দেহ করা হচ্ছে, তা সে বুঝতে পারে না। এবং এইভাবেই সে একদিন নিজের অপরাধের জালে ধরা পড়ে যায়।

পিস্তল নামিয়ে গোয়েন্দা বরদাচরণ ফিরে এলেন নিজের ঘরে। তিনি এখন নিশ্চিন্তভাবে জেনে গেছেন, কে অপরাধী। অপরাধী আর কেউ নয়, অপরাধী হল··· ?

মিঃ লাহিড়ীর গাড়িখানা স্টার্ট দিতে-না-দিতেই থেমে গেল। অর্থাৎ ঘটনা স্থলে পেঁছে গেলাম আমরা। পথ তো বেশি নয়, আমার বাড়ি থেকে হেঁটে মিনিট-তিনেক। কো-অপারেটিভ হাউসিং এস্টেটের কম্পাউণ্ডটা তখন পুলিশ যতই কর্ডনিং করুক, কৌতূহলী জনতার মাথায় মাথায় কালো হয়ে গেছে। হর্নের আওয়াজে ভিড় যেন আপনা থেকেই পথ করে দিল আমাদের। আমরা গিয়ে নামলাম দ্বিতীয় সারির ফ্ল্যাটগুলোর ফটকের সামনে। লোকাল থানার ওসি ছিলেন ভেতরের করিডরে, মিঃ লাহিড়ীকে দেখতে পেয়েই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিলেন নিশ্চয়ই, তার আগেই মিঃ লাহিড়ী ঠোঁট থেকে পাইপটা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "স্কোয়াড থেকে সবাই এসে গেছেন ? ডাক্তার ?"

জবাবের অপেক্ষা না করেই মিঃ লাহিড়ী ভেতরে ঢুকে গেলেন। পেছন-পেছন আমরাও। অর্থাৎ ওসি, অভ্র এবং আমি।

ঘটনাটা ঘটেছে একতলায়। কোলাপসিবল গেটঅলা ডানদিকের ফ্ল্যাটখানার বাঁ-দিকের সামনের ঘরটাতেই। ভেতরে ঢুকতে প্রথমেই চোখে পড়ল, চারদিকে একটা থমথমে নিস্তব্ধতার মধ্যে মেঝের ওপর রক্তমাখা চাদরে ঢাকা একটা নিশ্চল শরীর। শুধু নিশ্চল নয়, নিস্পন্দও বটে। কালচে রক্তের একটা ধারা মেঝের ওপর গড়িয়ে শুকিয়ে গেছে। বিছানার চাদর-বালিশ দোমড়ানো, মোচড়ানো টেবিলের ড্রয়ার আধটানা অবস্থায় ঝুলছে, স্টিলের আলমারির পাল্লাদুটো হাট করে খোলা। কাপড়চোপড় অগোছালো, কিছু-বা মেঝেয় ছড়ানো। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, বড় রকমের একটা ঝোড়ো-তল্লাশি যেন সবকিছু তছনছ করে দিয়ে গেছে ঘরখানার।

ঘরের চারদিকে দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে মৃতদেহের পাশে চোখ রাখতেই নজর পড়ল বছর-তিরিশ বয়সের একটি শক্তসমর্থ যুবার দিকে। মুখখানা শুকিয়ে কাঠ, চোখজোড়ায় শূন্য, বিষণ্ণ দৃষ্টি। ডাঃ সান্যাল তার সঙ্গে মিঃ লাহিড়ীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। নাম যতীন হাজরা। সম্পর্কে

মৃতের পাড়াতুতো এক ভাগনে। ওর বাড়ি হুগলির জনাই রোডে। নিহত রণদা ঘোষালেরও বাড়ি ওখানে। রণদা ঘোষাল বড়বাজারের এক বিখ্যাত কাপড়ের ব্যবসাদার। লাখ-লাখ টাকার কারবার। ওই কারবারের দৌলতেই দেশের দিকে জমিজমা বাগান-বাগিচা যেমন করেছেন প্রচুর, তেমনি কলকাতাতেও খান-দুয়েক বাড়ি আর সম্প্রতি কো-অপারেটিভের এই ফ্ল্যাটটিও কিনেছিলেন তিনি। ইদানীং ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করাটা ঠিক ধাতে সইছে না, তাই এই ফ্ল্যাটটা কিনেছিলেন তিনি ছেলে-বউ নিয়ে বাস করবেন বলে। ছেলেটা এখনও খুব ছোট, স্কুলে পড়ে। ভাগনে যতীনকে বড় ভালবাসতেন তিনি। গরিবের ছেলে, লেখাপড়া করার সুযোগ পায়নি, অথচ মাথাটা খুব ভাল। তাই নিজের ব্যবসায় তাকে টেনে নিয়েছিলেন, ছেলের মতো স্নেহ করতেন। হয়তো এমন সম্ভাবনাও ছিল, ভবিষ্যতে একদিন তাকে ব্যবসার একজন অংশীদার করে নেবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য যতীনের, তার আগেই ঈশ্বর তাঁর সাধে বাদ সাধলেন।

মিঃ লাহিড়ী সব শুনলেন, চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর এক সময় জিজ্ঞাসা করলেন, "ঘরের কোনো জিনিস স্পর্শ করা হয়েছে কি ?"

একচোখ জল নিয়ে জবাবটা যতীন হাজরাই দিল। বলল, "না, ঘরের কোনো জিনিসই আমি ছুঁইনি। শুধু মামার এই বীভৎস মুখখানা সহ্য করতে পারিনি বলে বিছানার চাদরখানা তুলে নিয়ে ওঁর দেহটা ঢাকা দিয়ে দিয়েছি।"

মিঃ লাহিড়ীর দৃষ্টি অনুসরণ করে ডাঃ সান্যাল মৃতের দেহ থেকে আস্তে আস্তে চাদরখানা সরিয়ে নিতেই যেন চমকে উঠলেন। কী বীভৎস দৃশ্য। আধুনিক কেতায় সাজানো-গোছানো ঘরখানার মেঝের ওপর যেন আদিম একটা বর্বরতা নিষ্ঠুর উল্লাস নিয়ে হাসছে। সাধারণ দোকান-দারের পোশাক পরনে ভারী চেহারার রণদা ঘোষালের শরীরটা নিশ্চল নিথর অবস্থায় পড়ে আছে খাটের ঠিক সামনেই। ভারী কিছুর আঘাতে সারা মুখখানা থেঁতলানো কাদার মতো হয়ে গেছে। শরীরে 'রিগার মর্টিস' শুরু হয়ে গেছে অনেক আগেই।

মৃতদেহ থেকে চোখদুটো আমার সরে গেল অভ্রর দিকে। নিষ্পলক, চোখজোড়া পাথরের মতো স্থির হয়ে আছে মৃতের দেহের ওপর। কে জানে কী ভাবছে, মনের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে !

মিঃ লাহিড়ী একবার আমার দিকে তাকালেন, একবার অভ্রর দিকে। তারপর ডাক্তারের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "ঘটনাটা কখন ঘটেছে বলে আপনার মনে হয় ?"

সঙ্গে-আনা একটা পলিথিনের ব্যাগে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রক্তমাখা চাদরখানা ভরে নিতে নিতে ডাঃ সান্যাল বললেন, "ঘণ্টা সাত-আট আগে ঘটেছে বলেই মনে হয়।"

ইশারায় যতীন হাজরাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন মিঃ লাহিড়ী। সেই সঙ্গে আমাদেরও। বীভৎস-দর্শন মৃতদেহের কাছ থেকে বোধহয় আমাদের সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

পাশের ঘরে সোফার ওপর সবাই বসলে, মিঃ লাহিড়ী যতীন হাজরাকে প্রশ্ন করলেন, "মৃতদেহ প্রথম আবিষ্কার করলেন কে ? ব্যাপারটা ঠিক কী ঘটেছিল বলুন তো মিস্টার হাজরা ?"

কান্না সামলাতেই বোধহয় যতীন হাজরা একটু সময় নিল। তারপর বলল, "মৃতদেহ প্রথম আবিষ্কার করি আমিই। সকাল ন-টা নাগাদ বড়বাজারের গদিতে বেশির ভাগ দিনই আমরা দুজন—মামা আর আমি একসঙ্গে যাই। কিন্তু আজ আর তা হয়নি। সকালে মামা বসেছিলেন তাঁর হিসেবের খাতাপত্র নিয়ে। কারণ আজই বিকেলে তাঁর বাইরে যাবার কথা। সামনেই পুজো। মালপত্র বায়না করতে সাউথ ইণ্ডিয়ার অনেক জায়গায় তাঁকে যেতে হবে। মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর হয়ে হায়দরাবাদ। দিন-আষ্টেকের প্রোগ্রাম কাল রাত্রে আর আজ ভোরে এখানকার দায়দায়িত্ব সব বুঝিয়ে দিয়ে শেষে আমাকে বললেন, ওঁর গদিতে পৌঁছতে কিছু দেরি হবে। প্রথমত, ব্যাঙ্কে যাওয়া আছে তিনদিনের বিক্রির টাকা জমা দিতে; দ্বিতীয়ত, খানপাঁচেক ব্যাঙ্ক-ড্রাফট কাটাতে হবে। এই কাজগুলো সারতে তাঁর কমপক্ষে সময় নেবে ঘণ্টা-তিনেক। তার মানে তিনি গদিতে পেঁছবেন বেলা একটা নাগাদ।"

একটু থামল যতীন হাজরা। গালের ওপর গড়িয়ে-আসা চোখের জলটা মুছে নিয়ে বলল, "কিন্তু একটা ছেড়ে দুটো বাজল আড়াইটে বাজল, তিনটে বাজল—মামার দেখা নেই। কী-করি কী-করি ভাবতে ভাবতে ফ্ল্যাটে একটা ফোন করতে গিয়ে দেখি লাইন খারাপ। চারটে পঁচিশে ট্রেন, অথচ সওয়া তিনটে হয়ে গেল—"

"ফ্ল্যাটে ফোন করতে গেলেন কেন?" মাঝপথে হঠাৎ মিঃ লাহিড়ী প্রশ্ন করে বসলেন।

"ফ্ল্যাটে ফোন করতে গেলাম এই কারণে যে, কাজেকর্মে দেরি হয়ে যাওয়ার ফলে গদিতে না এসে গোছগাছ সারতে যদি ফ্ল্যাটে ফিরে গিয়ে থাকেন—"

"আচ্ছা। তারপর?" পাইপ থেকে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন মিঃ লাহিড়ী।

যতীন হাজরা বলে চলল, "কেব্‌ল সারানো হচ্ছে বলে তখন আমাদের গলির সবক'টা টেলিফোনই বিগড়েছে দেখে দৌড়লাম বাঁশগলিতে প্রসন্ন সমাদ্দারের দোকানে। সেখানে লাইন পেলাম, কিন্তু লাইনে মামাকে পেলাম না। ফোন বেজেই গেল। বারবার তিনবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু না, সেই একই হাল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কেও ফোন করলাম, কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম শুনে যে, ব্যাঙ্কে তিনি যানইনি। ভীষণ ভাবনায় পড়ে গেলাম। এমনটা তো মামার কখনো হয় না! তাহলে কি হঠাৎ অন্য কোনো জরুরি কাজে বেরিয়ে পড়েছেন? নাকি ব্যাঙ্কে যাবার পথে কোনো বিপদ ঘটল? এমনি নানান কথা ভাবতে ভাবতে গদিতে এসে বিপিনবাবুকে—মানে আমাদের সরকারমশাইকে ব্যাপারটা বললাম। শুনে সরকারমশাই বললেন, ব্যস্ত মানুষ, হয়তো নতুন কোনো কাজে জড়িয়ে পড়েছেন। হয়তো ট্রাঙ্ককল পেয়েছেন কোথাও থেকে, আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রোগ্রাম চেঞ্জ করেছেন। তুমি এক কাজ করো—সোজা একবার ফ্ল্যাটে চলে যাও। দেখো, সুটকেস-হ্যাণ্ডব্যাগ ইত্যাদি গোছগাছ হয়ে গেছে কি না, কিম্বা ইতিমধ্যেই বেরিয়ে পড়েছেন কি না। তোমার সঙ্গে রাস্তাতেও দেখা হয়ে যেতে পারে হয়তো। যাও, চটপট চলে যাও—সাড়ে-তিনটে বেজে গেছে—"

ভিজে রুমালটা পকেটে ভরবার জন্য একটু থামল যতীন হাজরা, তারপর বলল, "ফ্ল্যাটের দুটো চাবির একটা থাকে আমার কাছে। সরকারমশাইয়ের কথামতো চলে এলাম ফ্ল্যাটে।

কোলাপসিবল গেটটা টানা রয়েছে বটে, কিন্তু তালাবন্ধ নয়। কেমন সন্দেহ হল। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকেই দেখি—"

কয়েক সেকেন্ডের জন্য মাঝপথেই থেমে গেল যতীন হাজরা। চোখদুটো আবার জলে ভরে উঠল, গলার স্বরে তেমনি গভীর আর্দ্রতা, "প্রথমটা কেমন হকচকিয়ে গেলাম। তারপর লোকজন ডাকাডাকি করলাম এদিক-ওদিক থেকে। ছুটেও এলেন সবাই। এখানকারই টেলিফোনে খবর দিলেন পুলিশে। তারপর—"

মিঃ লাহিড়ী মুখ দিয়ে শুধু একটা শব্দ করলেন, "হুঁ!" তারপর ধীরে ধীরে শুরু করলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পায়চারি—ঘরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত।

এতক্ষণ যতীন হাজরার কথার মধ্যে ডুবে ছিলাম, খেয়াল করিনি ইতিমধ্যে পাশের সিট থেকে অভ্র কখন উঠে গেছল। মিঃ লাহিড়ীও লক্ষ্য করেছেন কি না জানি না। হঠাৎ দরজার গোড়ায় তার গলা পেয়ে ফিরে তাকালাম। সে বলতে বলতে ঢুকছে, "বাঁশগলির প্রসন্ন সমাদ্দারের দোকানে ফোন করা থেকে শুরু করে বিপিনবাবুর কথা পর্যন্ত যা-কিছু বললেন হাজরামশাই—সেগুলো সবই সত্যি। আমি এইমাত্র ফোন করে জেনে নিলাম সরকারমশাইয়ের কাছ থেকে।"

পুলিশের হেফাজতে লাশ চালান দেবার নির্দেশ দিলেন মিঃ লাহিড়ী। অন্যান্য অফিসাররা তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, "আগে ডেডবডি পোস্ট-মর্টেম হোক, তারপর অন্য কথা।"

একজন অফিসার আমতা-আমতা করে বললেন, "কিন্তু দেখেশুনে যা মনে হচ্ছে স্যার, এ কোনো চোরের কীর্তি। ঘরের মধ্যে ঢুকে জিনিসপত্র নিয়ে সরে পড়বার সময় ভারী কিছু-একটা দিয়ে ঘোষাল মশাইয়ের মাথায় এমন একটা মোক্ষম আঘাত দেয়, যাতে তিনি আর টুঁ শব্দটিও করতে না পারেন।"

মিঃ লাহিড়ী শুনলেন, কিন্তু কোন জবাব দিলেন না।

তাঁকে চুপ করে থাকতে দেখে অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, "হাজরামশাইকে কি এখন আমরা নিয়ে যেতে পারি? আপনার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই, স্যার?"

জবাবটা মিঃ লাহিড়ী দিলেন না। তার আগেই আগ বাড়িয়ে অভ্র বলে উঠল, হাজরা-মশাইকে আপনারা নিয়ে যেতে পারেন, তবে একটা শর্তে। উনি যাতে পালিয়ে না যান, সেদিকে একটু কড়া নজর রাখতে হবে।"

"তার মানে?" ঘরের প্রতিটি প্রাণীর বিস্ময়-বিমূঢ় গলা থেকে যেন একই সঙ্গে কথাটা বেরিয়ে এল।

"তার মানে আর কিছুই নয়, কড়া নজর না রাখলে উনি আবার পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পারেন তো!" আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তা ফুটে উঠল অভ্রর চোখে-মুখে, "পুলিশের হেফাজত থেকে আসামির পালিয়ে যাওয়ার নজির তো এর আগেও পাওয়া গেছে। তাই বলছিলাম কি—"

তাকে থামিয়ে দিয়ে মিঃ লাহিড়ী সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, "এই ঘটনায় হাজরামশাই যে আসামি, এটা অনুমান করছ কী করে?"

"ও'রই কথায়।" থেমে থেমে আস্তে আস্তে অভ্র বলতে শুরু করল, "ডাক্তার বলেছেন ঘণ্টা সাত-আট আগে খুনটা ঘটে গেছে। তাঁর অনুমান যে মিথ্যে নয়, সেটা প্রমাণিত হয় শরীরে 'রিগার মর্টি'স' শুরু হয়ে যাওয়া দেখে। আজ সকালে বাড়ি থেকে বেরোবার আগে হাজরামশাই নিজের হাতে এই খুনটা করেন এবং বিকেল চারটে নাগাদ বাড়ি ফিরে লোকডাকাডাকি করে প্রমাণ করতে চান, ঘটনাটি কোনো বাইরের লোকের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে। প্রসন্ন সমাদ্দারের দোকান থেকে ফোন করা কিংবা বিপিনবাবুর সামনে মামার জন্য চিন্তিত হয়ে ওঠা—সেগুলো সবই ও'র স্বপক্ষে অ্যালিবাই তৈরি করার জন্য।"

কৌতূহল যেন বাগ মানছিল না আমার। অভ্রকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "সবই মানছি, কিন্তু উনিই যে খুন করেছেন, তার প্রমাণ কোথায়?"

"প্রমাণ ও'র কথায়। উনি একটু আগেই বললেন, ঘরের কেনো জিনিস উনি স্পর্শ করেননি। নিহত মামার বীভৎস মুখখানা সহ্য করতে পারেননি বলে একখানা চাদর শুধু চাপা দিয়ে দিয়েছেন শরীরে। কথাটা উনি মিথ্যে বলেননি। চাদর উনি সত্যিই চাপা দিয়েছিলেন, তবে বিকেলে বাড়ি ফিরে নয়—সকালে খুন করে যাবার সময়।"

অভ্রর এই উক্তিতে ঘরসুদ্ধ সবাই কেমন থ হয়ে গেল।

বললাম, "কিন্তু সেটা তুই বুঝলি কেমন করে?"

"কঠিন কিছু তো নয়। শুধু আমি কেন, মিস্টার লাহিড়ীও সেটা বুঝে ফেলেছেন এবং বুঝে ফেলেছেন বলেই নিয়ম রক্ষার জন্য মামুলি দু-চারটে কথা শুধু জিজ্ঞেস করেছেন হাজরামশাইকে। খুনের কেসের তদন্তে আরও অনেক জেরা, অনেক তত্ত্বতালাশের দরকার হয়। মিস্টার লাহিড়ী যে সেদিক দিয়েই যাননি, খেয়াল করেছেন সেটা?"

মিঃ লাহিড়ী এগিয়ে এসে অভ্রর দিকে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বললেন, "তাহলে প্রমাণের কথাটা আমার মুখ দিয়ে নয়, তোমার মুখ দিয়েই বেরোক।"

মিঃ লাহিড়ীর কথায় অভ্র যেন আত্মশ্লাঘায় ফুলে উঠল। বলল, "খুনটা হয়েছে সকালে, বিকেলে এসে মৃতের দেহে চাদর চাপা দিলে চাদরটা পরিষ্কার থাকারই কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, চাদরটা তাজা রক্তে মাখামাখি হয়ে শুকিয়ে গেছে।"

আমার সপ্রশ্ন চোখের দিকে তাকিয়ে অভ্র বলে উঠল, "জানি, এরপর কী জিজ্ঞেস করবে আমাকে। মোটিভের কথা তো? মোটিভ একটা নিশ্চয়ই আছে; তবে সেটা খুঁজে বার করবার দায়িত্ব পুলিশের। খুনির এজাহারে একটা মিথ্যে যখন ধরা পড়ে গেছে, তখন অন্যান্য সত্যগুলোও বেরিয়ে আসতে কোনো অসুবিধে হবে না। তবে আমার মনে হয়, অবশ্য হাজরামশাইয়ের হাজার মিথ্যের ফাঁকে যদি একটা কথাও সত্যি বেরিয়ে এসে থাকে, টাকা—তিন দিনের বিক্রির নগদ টাকা—যার অঙ্কটা নেহাত কম নয়।" অভ্র আসামির দিকে ফিরল, "ঠিক বলেছি কি না হাজরামশাই?"

আসামি কোনো জবাব দিল না। জ্বলে-ওঠা চোখ দুটোই যেন বলে দিচ্ছে, অভ্রর কথাগুলো ঠিক কি বেঠিক।

টেনাগড়ে টেনশান

বুদ্ধদেব গুহ

খগা সরকার আর ভগা সরকারকে চিনত না এমন লোক টেনাগড়ে কেউ ছিল না। পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা ছোট্ট শহর এই টেনাগড়। এখানে সকলেই সকলকে চেনে।

খগাদার বয়স হয়েছে ষাট-টাট। শৌখিন লোক। যৌবনে বেহালা বাজাতেন, শিকার করতেন, ওকালতিও। পিতৃপুরুষের বহু সম্পত্তি ছিল বিহারের নানা জায়গায়। তাই "খেটে খেয়ে" তিনি জনগণের সামিল হতে চাননি। কিন্তু প্রয়োজন না থাকলেও খাটতে তিনি ভালবাসতেন এবং পরিশ্রমে বিশ্বাস করতেন।

খগাদার ভাই ভগাদার বয়স তিরিশ-টিরিশ হবে। টেনাগড়ে তিনি প্রায়ই নানা ধরনের খবরের সৃষ্টি করে থাকেন। লোকটি ভাল।

খগাদা এখন রিটায়ার্ড। ইদানীং চটের উপরে গুনছুঁচে রঙিন সুতো পরিয়ে "সদা সত্য কথা বলিবে", "ভগবান ভরসা" "যারে রাখো সেই রাখে" ইত্যাদি লিখে-লিখে বস্তির লোকেদের সেগুলো দান করেন। মাঝে-মাঝে কাহার-বস্তির লোকদের সেগুলো দান করেন। মাঝে-মাঝে কাহার-বস্তির অনিচ্ছুক শুয়োরগুলোকে ধরে এনে কুয়োতলায় তাদের জবরদস্তি সাবান মাখান। সন্ধ্যেবেলায় ওঁর বাড়িতে ভজন গান হয়। সকালে দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন। খগাদার ডিসপেনসারিতে লোম-ওঠা পথের কুকুর, কুঁজে-ঘা-হওয়া বলদ এবং হাড্ডিসার মানুষ—সকলেই চিকিৎসার জন্যে আসে এবং, আশ্চর্য, কেউ-কেউ ভালও হয়ে যায়।

ছেলেমেয়েও নেই। খগাদা অকৃতদার। ভগাদা বিয়েই করেনি। দুই ভাইয়ের সুন-সান্নাটা সংসার। থাকবার মধ্যে একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুর, তার নাম মোহিনী। চাকর-বাকর আছে, গাই-বয়েল, খেতি-খামার খিদ্‌মদ্‌গার। আর আছে বারান্দায় দাঁড়েবসা একটা কুৎসিত কাকাতুয়া। ভগাদার আদরের পাখি। কুকুরটাও আদরের। কাকাতুয়াটাকে ভগাদা আদর করে ডাকত 'কাকু' বলে। আমরা বলতাম "কাড়িয়া পিরেত"। ওদের বাড়ি ঢুকলেই কাকাতুয়াটা বলে উঠত, "ভাগো হিঁয়াসে, ভাগো হিঁয়াসে।"

খগাদা আধুনিক কবিতা, পশুপালন, বাজরা-মকাই, তাইচুং ও আই-আর-এইট ধান, ভগাদার ভবিষ্যৎ ইত্যাদি তাবৎ বিষয় নিয়েই আমাদের সঙ্গে জোর আলোচনা করতেন এবং গলার জোর বাড়ানোর জন্যে তেজপাতা-আদা-এলাচ দেওয়া গোরখ্‌পুরী কায়দায় বানানো চা ও ভৈষালোটনের জঙ্গল থেকে আনানো খাঁটি ঘিয়ে ভাজা সেওই খাওয়াতেন।

সেদিন সকালে খগাদার বসবার ঘরে ঢুকতেই দেখি খগাদার মুখ গম্ভীর, থমথমে।

গুনছুঁচ ঢুকে গেছে বুড়ো আঙুলে ?

বীরু নিজের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, ''খুব লেগেছে ?''

খগাদা বললেন, ''লেগেছে, তবে আঙুলে নয়, হৃদয়ে।'' ঢোক গিলে বললাম, ''স্ট্রোক ! মাইল্ড অ্যাটাক ?'' খগাদা বললেন, ''তার চেয়েও মারাত্মক।''

আমরা বসে পড়ে সমস্বরে বললাম, ''কী. তবে কী''

খগাদা বললেন, ''চুরি।''

কোথায়, কোথায় ? চোর কোথায় ? কী চুরি ? বলে আমরা প্রায় আমরা চিৎকার করে উঠলাম।

এমন সময় ভগাদাকে দেখা গেল একটা লাল রঙের শর্টস পরে কাবুলী জুতো পায়ে, খালি গায়ে কাকাতুয়াটাকে খাওয়াচ্ছেন নিজে হাতে বারান্দায় এসে।

খগাদা আঙুল দেখিয়ে বললেন, ''ঐ যে কালপিট, ঐ দাঁড়িয়ে আছে সশরীরে। সহোদর আমার। সাক্ষাৎ লক্ষ্মণ !

আমাদের খারাপ লাগল, বিশ্বাসও হল না। আপন ভাই কখনও চুরি করতে পারে ?

খগাদা কী বলছে বুঝতে না পেরে ভগাদা সাঁ করে বারান্দা ছেড়ে সরে গেল ভিতরে। ধরে-থাকা খাঁচাটা হঠাৎ ছেড়ে দেওয়ায় কাকাতুয়ার খাঁচাটা জোরে নড়ে উঠল। কাকাতুয়াটা বলল, ''কাঁচকলা খা ! কাঁচকলা খা !'' ভগাদাকেই বলল বোধহয়।

খগাদা আস্তে আস্তে বললেন, ''গত শনিবার রাতে এ-বাড়িতে যত কাঁসার ও রুপোর বাসন ছিল, সব চুরি করে নিয়ে গেছে চোরে, শুনেছ তোমরা ?''

বীরু বলল, ''সে কী ? বাড়িতে বন্দুক ছিল না ?''

আমি বললাম, ''অত বড় অ্যালসেশিয়ান কুকুর ছিল !''

''ছেল।'' খগাদা বললেন, ''ছেল সবই। কিন্তু বন্দুক রাখা ছেল গ্রীজ্ মাখানো অবস্থায় বেহালার বাক্সে। আর কুকুর মজাসে ঘুমোচ্ছিল।

আমরা বোকার মতো বললাম, ''কুকুর ঘুমোচ্ছিল মানে ?''

''তাহলে তার বললুম কী'' খগাদা সখেদে বললেন। তারপর বললেন, ''যে বাড়িতে কুকুর ঘুমোয়, সে-বাড়িতে চুরি হবে না ?''

এরপর গড়গড়ায় গয়ার তামাকে দুটো টান দিয়ে বললেন, ''বুঝলে ভায়ারা, রোজ রাতে পড়াশুনো করি, আর শুনতে পাই বারান্দায় মোহিনীর পায়ের পায়জোড়ের আওয়াজ। মোহিনীকে ভগা রুপোর পায়জোড় বানিয়ে দিয়েছিল। পা ফেললেই ঝুমুরঝুমুর করে বাজে। আওয়াজ শুনতে পাই, কিন্তু এগারোটা বাজলেই দেখি আওয়াজ থেমে যায়। একদিন মনে সন্দ হওয়াতে পা টিপে-টিপে ভগার ঘরের সামনে গিয়ে দেখি ভগা মশারির মধ্যে অঘোরে ঘুমোচ্ছে, আর মেঝেতে

শুয়ে মোহিনীও দিব্যি নাক ডাকাচ্ছে। আমি ডাকলুম, 'ভগা।' তাতে 'কে রে' বলেই ভগা উঠে বসে জানালার ধারে আমায় দেখতে পেয়েই ঘুমন্ত মোহিনীর পেটে মারলে ক্যাঁক্ করে এক লাথি। ঘুমঘোরে লাথি খেয়ে মোহিনী তো মারলে বডি থ্রো!''—

বীরু বলল, ''আর ভগাদা?''

''ভগাদা?'' বলে, খগাদা বিদ্রুপের হাসি হাসলেন। বললেন, ''ভগা আবার তক্ষুনি শুয়ে পড়ল।''

তারপর বললেন, ''তোমরাই বলো, এ-বাড়িতে চুরি হবে না তো কোন্ বাড়িতে হবে?''

আমরা সত্যিই বড় চিন্তায় পড়লাম খগাদার জন্যে। সরি, ভগাদার জন্যে! আসলে ভগাদা মাঝে-মাঝেই আমাদের এবং খগাদাকে ঝামেলায় ফেলতেন।

একদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরেই শুনলাম খগাদা আমাদের জরুরী তলব দিয়েছেন।

আমরা দৌড়ে গেলাম। দেখি, খগাদার অবস্থা খুব খারাপ। কোলে বার্ট্রান্ড রাসেলের 'কন্‌কোয়েস্ট অব্ হ্যাপিনেস্' বইখানা আধা-খোলা পড়ে আছে, আর খগাদার চোখের কোণে জল চিক্-চিক করছে।

বীরু বলল, ''খগাদা, কী? দুঃখ কিসের?''

খগাদা বললেন, ''আর কী, একমাত্র ভাইটাকে বুঝি হারালাম এবার!''

''কী, হয়েছে কী?'' আমি উত্তেজিত হয়ে শুধোলাম।

খগাদা বললেন, ''ভগা আর ওর বন্ধু গিদাইয়া পদ্মার রাজার বিলে হাঁস মারতে গেছে সেই ভোর চারটেয়—বাড়িতে মশলা বাটতে বলে গেছে। হাঁসের শিক্‌কাবাব বানাবে বলে শিক ঘষামাজা করে রাখতে বলেছে, টক দই, পেঁপে, গরম-মশলা, ভাঙা পিরিচ, সব-কিছুর জোগাড় রেখে গেছে। আর দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলল, এখনও তাদের দেখা নেই। নির্ঘাত কোনো অঘটন ঘটেছে। আমার পায়ের গেঁটে বাতটা বেড়েছে কয়েকদিন হল। আজ আবার অমাবস্যা। রোজ রসুন খাই, তবু ব্যথা যায় না। আমি তো চলচ্ছক্তিরহিত। তোমরা বাবা যাও একটু। আমার জীপগাড়িখানা নিয়ে যাও। ভগা গিদাইয়াকে নিয়ে মোটর সাইকেলে করে গেছে।''

বীরু বলল, ''নো-প্রবলেম। আপনি চিন্তা করবেন না খগাদা। আমরা বন্দোবস্ত করছি। তার আগে আমি চট করে পোস্ট অফিস থেকে পদ্মার রাজবাড়ির ম্যানেজারকে একটা ফোন করে খবর নিয়ে নিই। তাঁকে আমি চিনি আমার কাকার বন্ধু।''

খগাদা বললেন, ''বাস্, বাস্, তাহলে তো কথাই নেই। এই নাও, টাকা নিয়ে যাও।'' বলেই কোমরের গেঁজ থেকে একটা লাল রঙের নাইলনের মোজা বের করে তার থেকে একটা দশটাকার নোট দিলেন বীরুকে।

বীরু বলল, ''তুই থাক। খগাদা নিড্‌স কম্পানি।''

খগাদা বললেন, ''বুঝলে ভায়া, আজ কত কথাই মনে পড়ছে। ভগা যখন হাসপাতাল

থেকে মায়ের সঙ্গে বাড়ি এল, তখন ওকে দেখতে একেবারে বাচ্চা একটা খরগোশের মতো ছিল। কী গাবলু গুবলু। তার উপর আবার খিল খিল করে হাসত। আমার চেয়ে কত ছোট। কিন্তু পড়াশোনা করল না, কিছুই করল না, জীবনটাকে নষ্ট করল পাখি আর কুকুর নিয়ে। আমিই এখন ওর মা, ওর বাবা, ওর দাদা, সব। কী বিপদ হল কে জানে। বিলে কি ডুবে মরল, না কি সাপে কামড়াল?"

একটু পর ক্রিং ক্রিং করে সাইকেলের ঘণ্টি বাজিয়ে চাকায় কির্-র্-র্ শব্দ তুলে বীরু ফিরল।

খগাদা একবার দাঁড়াবার চেষ্টা করেই মুখ বিকৃতি করে 'উঃ মাগো' বলে পায়ের ব্যথায় বসে পড়লেন।

বসেই বীরুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "খবর পেলে?"

বীরু অধোবদনে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে বলল, "হুঁ।"

"কী?" খগাদা চিৎকার করে উঠলেন। তারপর বললেন "বলে ফেল সোজাসুজি। আছে, না নেই?" তারপরই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ভগা রে! আমার ভগাবাবু!"

বীরু বলল, "ভগাদা আছে। কিন্তু রাজার কয়েদখানায়।"

"হোয়াট?" বলে খগাদা আবার উঠে দাঁড়াতে গিয়েই 'গেছি গেছি গেছি' বলে বসে পড়লেন।

তারপর হাতের 'কন্‌কোয়েস্ট অব হ্যাপিনেস্'টাকে মাটিতে ছুঁড়ে বললেন, "হোয়াই? হাউ কাম?"

বীরু বলল, "বিলের ধারে রাজার পোষা হাতি চরছিল, ভগাদা তাকে গুলি করেছে।"

"হাতিকে? গুলি? পাখি-মারা ছর্‌রা দিয়ে? ইমপসিবল্! নিশ্চয়ই অ্যাকসিডেণ্ট! তা বলে কয়েদখানায়? খগা সরকারের ভাই কয়েদখানায়?"

বীরু, বীরুর কাকা ও আমি যখন খগাদার জীপ নিয়ে গিয়ে পদ্মার রাজার কয়েদখানা থেকে পঁচিশ টাকা জরিমানা দিয়ে ভগাদা, গিদাইয়া আর মোটর সাইকেলটাকে ছাড়িয়ে আনলাম, তখন রাত হয়ে গেছে।

আসবার পথে বীরু বলল, "ভগাদা, কী করে এমন হল? হাতি কি তোমাকে তেড়ে এসেছিল?"

ভগাদা বললেন, "আরে না না। এই গিদাইয়া ইডিয়ট্‌টার জন্যেই তো।"

গিদাইয়া মাথা ঘুরিয়ে টিকি নেড়ে মহা প্রতিবাদ জানাল।

ভগাদা বললেন, "বুঝলি, বিলে এক ঝাঁক পিন্‌টেইল হাঁস ছিল। একটা পুটুস্ ঝোপের পাশে শুয়ে এইম করছিলাম। ভাবছিলাম লাইনে পেলেই একেবারে গদাম করে ঝেড়ে দেব, গোটা ছয়েক উল্টে যাবে। এমন সময়..."

আমি বললাম, "এমন সময় কী?"

ভগাদা বললেন, "এমন সময় গিদাইয়া কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, ভগা! ওয়াইল্ড এলিফ্যাণ্ট! তাকিয়ে দেখি, আমাদের পাশেই একটা হাতি দাঁড়িয়ে ভোঁস-ভোঁস করে শুঁড় ঘুরিয়ে নিশ্বাস নিচ্ছে আর কান নাড়াচ্ছে। আমার মন বলল, নিশ্চয়ই পোষা হাতি রাজার! কিন্তু গিদাইয়া বলল, এক-একটা দাঁত—পাঁচ-পাঁচ হাজার টাকা। অত হাজার টাকার কথা শুনেই আমার মাথা ঘুরে গেল। দিলাম দেগে এক নম্বর ছর্‌রা।"

আমি রুদ্ধশ্বাসে শুধোলাম, "তারপরে কী হল?"

"তারপর আর কী! হাতি বলল, প্যাঁ—অ্যা-অ্যা-অ্যা-অ্যা। আর আমি ও গিদাইয়াও একসঙ্গে ভ্যাঁ—অ্যা-অ্যা-অ্যা-অ্যা।"

বীরু অবাক হয়ে বলল, "কেঁদে ফেললে? এ মা, এত বড় লোক হয়ে কেঁদে ফেললে?"

ভগাদা বলল, "হুঁ হুঁ বাবা, কান্না পেলেও না যদি কাঁদো তবে সঙ্গে সঙ্গে ইস্‌কিমিয়া, মায়াকার্ডিয়াক অ্যাটাক্‌। হার্ট এক্কেরে কিমা। জানিস না তোরা কিছুই।"

বীরু বলল, "তারপর?"

"তারপর আর কী? হাতি এসে ঘাড়ে পড়ার আগেই মাহুত আর রাজার পেয়াদা এসে ঘাড়ে পড়ল। বন্দুক কেড়ে নিল। আর কী রদ্দা, কী রদ্দা!"

"হাতিটাকে কোথায় মেরেছিলে?" আমি শুধোলাম।

ভগাদা বলল, "এইম করেছিলাম কানের পাশেই নিয়ম-মাফিক।"

গিদাইয়া এতক্ষণ পর কথা বলল। বলল, "কিন্তু কুল্লে চার দানা ছর্‌রা গিয়ে লেগেছিল হাতির সামনের পায়ের গোড়ালিতে।"

ভগাদা চটে উঠে বলল, "য়্যু শাট্‌ আপ্‌। দোস্ত তো নয়, সাক্ষাৎ দুশমন্‌।"

এই ঘটনার কিছুদিন পরই খগাদা আমাদের নেমন্তন্ন করে খুব একচোট খাওয়ালেন। ভগাদা চাকরিতে জয়েন করেছে। অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা। নিজেই চেষ্টা-চরিত্র করে যোগাড় করেছে। এতদিনে ভাইয়ের একটা গতি হল। সকলেই খুশি, আমরাও। ভগাদা রোজ সময়মত প্যাণ্ট আর হাওয়াইন শার্ট পরে অফিস যায়।

দিন পনরো বাদে খগাদা আবার আমাদের জরুরি তলব দিলেন। গেলাম। বুঝলাম, আবার কেস গড়বড়।

খগাদা বললেন, "আবার একটা উপকার করতে হবে।"

আমরা বললাম, "বলুন কী করতে পারি। ভগাদা কি আবার কোনো ঝামেলা···"

খগাদা বললেন, "শোনো আগে। চাকরি করছিল ভগা, খুশি ছিলাম কত। কিন্তু গত কয়েকদিন অফিস যাচ্ছিল না। প্রথমে বলছিল পেটে ব্যথা। নাক্স-ভমিকা থারটি দিলাম। তারপর

বলতে লাগল গায়ে ব্যথা। আর্নিকা দিলাম। তারপর বলল, রাতে ঘুম হয় না। কালি-ফস দিলাম। তাতে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোবার কথা, কিন্তু সমানে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে ভায়া আমার শুয়ে থাকে। কথাও বলে না, খায়ও না। তারপর ওআরস্ট অব অল, কাল থেকে পলাতক। কোথায় যে চলে গেল না বলে-কয়ে!"

বীরু হঠাৎ বলল, "চাকরির ব্যাপারটা একটু খোঁজ করলে হত না? সেখানে কোনো গোলমাল?"

খগাদার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, "ব্রিলিয়াণ্ট্। সাধে বলি, তোমাদের মত ছেলে হয় না।"

বীরু আমাকে বলল, "চল, এক্ষুনি ব্যাপারটা জেনে আসা যাক।"

খগাদার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে বীরু বেরিয়ে পড়ল সাইকেলে আমাকে ডাবল-ক্যারি করে।

সবজিমণ্ডির পাশে মসজিদ, মসজিদের থেকে খানিকটা দূরে কালু মিঞার কাবাবের দোকান, তার পাশে একটা ছোট্ট দোকানঘর—সবুজের উপর সাদায় লেখা সাইনবোর্ড ঝুলছে, ইণ্টারন্যাশনাল সাপ্লায়ার্স। কিন্তু সেই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কেরোসিন তেলের টিন দিয়ে তৈরি দরজাটাতে একটা মস্ত বড় তালা ঝুলছে।

আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম সাইকেল থেকে নেমে।

ইণ্টারন্যাশনাল সাপ্লায়ার্সের উল্টোদিকে একটা দর্জির দোকান। খয়েরি আর সাদা খোপ-খোপ লুঙ্গি আর বেগুনে কামিজ পরে মাথায় সাদা টুপি চড়ানো কালো চাপ-দাড়ি-ওয়ালা দর্জি আপনমনে ঝটপট করে পা-মেশিনে রজাইয়ের ওয়াড় সেলাই করে যাচ্ছিল।

আমরা গিয়ে একটু কেসে দাঁড়ালাম।

দর্জি মুখ তুলে নিকেলের ফ্রেমের চশমার কাঁচের ফাঁক দিয়ে চোখ নাচিয়ে বলল, "ফরমাইয়ে।"

বীরু বলল, "খাস কাম কুছ নেহী। এই যে উল্টোদিকের অফিসটা, সেটা বন্ধ কেন? তালা ঝুলছে কেন?"

দর্জি বলল, "দফ্তর বন্ধ হ্যায়। উঠ্ গয়া।"

"উঠে গেছে মানে?" আমরা শুধোলাম।

দর্জি বলল, "জী হাঁ।" তারপর ডান হাতের তিনখানা আঙুল বীরুর নাকের সামনে নেড়ে নেড়ে বলল, "আপিস তো ছিল দুজনের—হেডবাবু গিরধারী পাণ্ডে আর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ভগা সরকার। সেদিন কী নিয়ে কথা কাটাকাটি হতে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট গিয়ে হেডবাবুর মাথায় হঠাৎ কাঠের রুলার দিয়ে মারল এক বাড়ি। সাথে সাথ্ মাথা ফট্! হেডবাবু হাসপাতালে আর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ফেরার। আপিস আর চালাবে কে? কিওয়ারি বন্ধ্।"

আমরা ফিরলাম। খগাদা উদগ্রীব হয়ে বসে ছিলেন। বললেন, "কী খবর?"

বীরু গম্ভীরমুখে বলল, "আপিস উঠে গেছে। হেডবাবু হসপিটালে, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এবস্কণ্ডিং।"

খগাদা প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে "মার্ডারার, মার্ডারার, কোথায় গেলি, কোথায় গেলি," বলেই দৌড়ে বারান্দার দিকে গেলেন, যেন ভগাদা বারান্দাতেই বসে আছেন।

খগাদা বারান্দাতে গিয়ে পৌঁছতেই ভগাদার ঠোঁটকাকা কাকাতুয়াটা খ্যান্‌খেনে গলায় বলে উঠল, হাইপারটেন্‌শান্। হাইপারটেন্‌শান্!

টিকটিকি অতীন্দ্রিয় শক্তি ও বেদান্ত বর্ধন

আশাপূর্ণা দেবী

এত কাণ্ডের কিছুই হত না যদি না গাবদাগোবদা টিকটিকিটা আচমকা বেদান্ত বর্ধনের দেওয়ালধারে-রাখা টেবিলটার ওপর ধপাস করে এসে পড়ত, আর আর্তনাদ কয়ের টেবিল চাপড়ানোর ধাক্কার তরতরিয়ে দেওয়ালে উঠে যেত।

টিকটিকিতে বড় ভয় বেদান্তর। ওঁর স্থির বিশ্বাস ওই দেওয়ালবাসী প্রাণীগুলোর মধ্যে কোনও অতীন্দ্রিয় শক্তি আছে। ওরা ভাগ্যের ভালমন্দ অথবা ভবিষ্যতের কোনও লাভক্ষতির খবর বয়ে আনে। তবে ওদের ভাষাটা বোঝা চাই। বেদান্তর ঠাকুমা নাকি ওই টিকটিকিদের ভাষা বুঝতেন। মাঝে-মাঝেই তিনি বলে উঠতেন, "সংসারে একটা বিপদ-আপদ আসছে।" অথবা বলতেন, "সংসারে শিগগিরই একটা একটা শুভ ঘটনা ঘটবে।"

কার কাছে এইসব আগাম খবর পেতেন ঠাকুমা ?

কার কাছে আবার ? ওই অমোঘ জ্যোতিষী-টিকটিকিদের কাছে।

তখন বেদান্ত ঠাকুমার এই কথাটথাগুলো তেমন আমল দিতেন না। কেনই-বা দেবেন ? স্কুলে পড়ুয়া ছাত্ররা একমাত্র 'বন্ধুদের' কথা ছাড়া আর কারও কথাকে আমল দেয় ? বেদান্তও দেননি তখন। কাজেই টিকটিকির ভাষাটি শিখে নেবার চেষ্টামাত্র করেননি। পরে, মানে আর কি এখন তার জন্যে আফসোস হয়। তা কী আর করা ? সময় থাকতে শিখে নেননি যখন। এখন তাই টিকটিকি দেখলেই আতঙ্ক হয়, ওই বুঝি কী অমঙ্গল বার্তা বয়ে আনল। ঠাকুমা মারা যাবার পর থেকেই এই ধারণাটি জন্মে বসে আছে বেদান্তর। কারণ একদিনের মাত্র রুগি, জ্বর-জ্বর ভাব ঠাকুমা, রোদে পা জড়িয়ে বসে তেল-নুন-মাখা-মুড়ি খাচ্ছিলেন কাঁচালঙ্কা চটকে-চটকে, হঠাৎ ছড়ানো পায়ের ওপর ধপাস করে একটা টিকটিকি এসে পড়ল।

কোন পায়ে ? কোন পায়ে আবার ? যত নষ্টের গোড়া ডান পায়ে। সেই পায়ে এক ঘটি জল ঢেলে ঠাকুমা মুড়ির বাটিটা ঠেলে সরিয়ে রেখে ডেকে উঠলেন, "ওরে বেদা, তোর বাপ-কাকাকে বল খাটিয়া এনে মজুত রাখতে। আজই আমার জীবনে শেষদিন।"

বললে লোকে বিশ্বাস করুক আর না করুক, সেই রাত্রেই ঠাকুমা মারা গেলেন। লোকে বলতে পারে কাকতালীয়। কিন্তু তাই কী ? এরপর আর টিকটিকি-আতঙ্ক হবে না বেদান্তর ? কিন্তু প্রাণীগুলো এমন, ওর বাসা খুঁজে বার করে উৎখাত করে তাড়াবার কোনও উপায় নেই। ব্যাটাদের আদৌ কোনও বাসাটাসা থাকে কি না তাই-বা কে জানে।

বেদান্ত তাই এখন এই তাড়া-খাওয়া টিকটিকিটাকে নির্নিমেষে দেখতে লাগলেন, কোথায় যায়। কিন্তু আশ্চর্য, খানিকটা উঠে গিয়ে আর কোথাও গেল না। হঠাৎ নট-নড়নচড়ন হয়ে দেওয়ালের একটা জায়গায় স্থির হয়ে আটকে গেল।··· আর তখনই দেওয়ালটা ভাল করে লক্ষে পড়ল বেদন্তর।

ওটা কী ব্যাপার? ঠিক ওইখানটাই দেওয়ালে একটা চারচৌকো দাগ কিসের? ময়লা দেওয়ালে একটুকরো সাদা ছাপ। ঠিক চারচৌকো নয় দশ ইঞ্চি বাই ছ' ইঞ্চি গোছের। কিসের ছাপ? বেশ বোঝা যাচ্ছে, ওখানে দীর্ঘকাল যাবৎ কোনও-একটা ওই মাপের ছবিটবি কিছু টাঙানো ছিল, সেটা এখন আর নেই।

বেদান্ত তীক্ষ্ন দৃষ্টিক্ষেপ করে দেখতে-দেখতে ভাবতে থাকলেন, কী টাঙানো ছিল ওখানে? কী আর থাকবে ছবি ছাড়া? কিসের ছবি? কোনও নিসর্গচিত্র?

দূর! ওই ছায়া-ছায়া কোণের দিকে একটুখানি দেওয়ালে আবার তেমন ছবি! কারও ফোটোই নিশ্চয়!

কার ফোটো ছিল ওখানে? কার?

সড়াত করে টিকটিকিটা সরে গেল। আর সঙ্গে-সঙ্গে চড়াত করে পড়ে গেল, ওখানে টাঙানো ছিল বেদান্তর দাদামশাইয়ের একখানা ফোটো। কবে আর তাকিয়ে দেখতে গেছেন? ধুলোয়-ধোঁয়ায় আর মাকড়সার জালে ঢাকাই পড়ে ছিল।

মনে পড়ল কবে যেন একদিন ঘরে ঝুল হওয়া নিয়ে রাগারাগিও করেছিলেন। কিন্তু তারপর? ছবিটা কোথায়?··· অন্য কোনও দেওয়ালে টাঙানো হয়েছে। কই? সারা বাড়ি ঘুরে এলেন বেদান্ত। নাঃ, কোনও দেওয়ালেই নেই। কেনই-বা থাকবে? বেদান্তর দাদামশাইয়ের ওই ঝাপসা হয়ে যাওয়া হলদেটে ফোটোখানা নিয়ে কার মাথাব্যথা? ছবিটার আদর ছিল বেদান্তর মা বেঁচে থাকতে। তিনিই রোজ সন্ধ্যেবেলা একটা ধূপ জেলে ছবিটার সামনে বারকতক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেটা হাতে রেখেই দু' হাত জোর করে প্রণাম করে চলে যেতেন। আবার মাঝে-মাঝে একদিন পা উঁচু করে ডিঙি মেরে আঁচল দিয়ে ঘষে-ঘষে মুছতেন ওই ছবির কাচটা।

তা সে তো কোন কালের কথা!

তারপর আবার কে দেখেছে, ছবিটা আছে কি না আছে।

কিন্তু 'ছিল না' বললে তো চলবে না। ছিল তার জাজ্বল্য প্রমাণ হয় দেওয়ালে, ওই ফরসা ছাপটি।

তার মানে, ছিল। কেউ সরিয়েছে। তার মানে চুরি করেছে।

যেই-না ওই কথাটা মাথায় খেলে গেল, সঙ্গে-সঙ্গে বেদান্ত বাড়ি তোলপাড়-করা গলায় চিৎকার করে উঠলেন, "আমার ঘর থেকে জিনিসপত্র সরাচ্ছে কে? অ্যাঁ! চুরি করবার জন্যে বাড়িতে আর ঘর পায়নি? ঠিক আমার ঘর থেকেই চুরি। আমি ভালমানুষ, কিছু বলি না বলে তাই। কেমন?"

বেদান্তর উদ্দাম তড়পানিতে এপাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল দিগন্ত, তার বউ, আর ছেলে। ওপাশের ঘর থেকে সুমন্ত, তার বউ, আর মেয়ে। ভাঁড়ারঘর থেকে পিসিমা।

"ব্যাপার কী? অ্যাঁ। এত চেঁচামেচি কিসের? চেঁচানো তোমার একটা রোগ দাদা!"

"কী? চেঁচানো আমার রোগ?"

বেদান্ত তুড়িলাফ খান, "ঘর থেকে জিনিসপত্তর হাওয়া হয়ে যাবে, আর চুপ করে থাকতে হবে? তোমাদের এইরকম ভালমানুষিতেই চোরকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তা জানো?"

পিসিমা এক দাবড়ানি দিয়ে বলে ওঠেন, "তোর তো চিরকালই সর্বস্ব 'চুরি যায়। গেঞ্জিটা, তোয়ালেটা, বইটা, কলমটা একবার দেখতে না পেলেই হাঁক পাড়িস 'চুরি গেছে! চুরি গেছে!' বলি তোর ঘরে আছেটা কী যে চুরি যাবে?"

"নেই? আমার ঘরে কিছু নেই? জানো, আমার ঘরে যেসব 'রেয়ার' বই আছে, তার গোটাকতক হাতাতে পারলেই চোরের ভবিষ্যৎ সোনা দিয়ে বাঁধানো হয়ে যাবে। ওইসব বই—আমি সেই বারো বছর বয়েস থেকে ফুটপাতে ঘুরে ঘুরে!…"

দিগন্ত বলল, "বই চুরি গেছে? কী বই? কীভাবে গেল? বাড়িতে সবসময় এত লোক। তা হলে কেউ পড়তে নিয়ে গিয়ে ফেরত দেয়নি নিশ্চয়।"

বেদান্ত তাঁর টিংটিঙে শরীরটা নিয়ে প্রায় লাফ খান, "বই চুরি গেছে বলেছি এ-কথা?"

"বাঃ। তা হলে? কী চুরি গেছে?"

সুমন্ত বলে, "তা হলে কী চুরি গেল দাদা? টাকাপয়সা? তা যেতেই পারে। যেভাবে যেখানে-সেখানে ফেলে রাখো। কখনও টেবিলে, কখনও বইয়ের র‍্যাকের মাথায়, কখনও বিছানার ওপর। চাবিটাবির তো পাট নেই! তো, কত টাকা গেছে তার হিসেব আছে? নাকি তাও নেই?"

বেদান্ত দু' হাতে চুলের মুঠিটা চেপে ধরে (না, না, ভাইয়ের চুলের মুঠি নয়। নিজেরই।) আর্তনাদ করে ওঠেন, "ওঃ! বলেছি টাকা চুরি গেছে আমার? হাজার-হাজার টাকা? আশ্চর্য! ভাল করে কিছু না শুনেই রিমার্ক পাস! জ্ঞান দিতে আসা!"

দিগন্তর ছেলে টুকাই আর সুমন্তর মেয়ে মকাই দু'জনে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কী যেন ফিসফিস করছিল, হঠাৎ দুজনেই হিহি করে হেসে উঠল।

"অ্যাই! হাসলি যে? হঠাৎ হাসলি যে? বল বলছি কেন হাসলি?"

"বলছি, বলছি, হিহি, বলছিলাম রেগে গেলে জেঠুকে ঠিক টিভি-র রামায়ণের রাবণের মতন দেখায়। চোখ একদম গো-ল হয়ে যায়।"

"বটে। বটে। এইসব ফাজলামি শেখা হচ্ছে? হবেই তো। ইংলিশ মিডিয়ামের ফল।"

সুমন্তর বউ বলে উঠল, "এর মধ্যে আবার 'ইংলিশ মিডিয়াম' এল কোথা থেকে বড়দা?"

"এল কোথা থেকে? হুঁ! গুরুজনকে ঠাট্টা করতে নেই, এ শিক্ষা দেয় তোমাদের ওইসব বিলিতি ইস্কুল?" পিসিমা বলে ওঠেন, "তুই থাম তো বেদা! গুরুজন যদি উচিচংড়ির মতন

তুড়িলাফ খেতে খেতে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তোলে, ছেলেমানুষরা হেসে ফেলবে না ? বলি এতক্ষণ তো জানতে পারলুম না তোর চুরিটা গেছে কী ? তবে বুঝি গেছে তোর সেই রং-জ্বলা পচা পুরনো লুঙ্গিটা ? প্রাণ ধরে যেটাকে ন্যাতা করতে দিতে পারছিস না। পরেছিস দেখলেই গা জ্বলে যায়। হাড়কুচ্ছিত।"

বেদান্ত হঠাৎ গুম হয়ে দালানে পড়ে-থাকা একটা টুলের ওপর বসে পড়ে বলেন, "ওঃ অসহ্য! অনেকদিন ধরেই দেখছি ওইটার ওপর তোমার শ্যেনদৃষ্টি। নিও। আজই ওটাকে নিয়ে গিয়ে তোমার 'ন্যাতা' করগে। কিন্তু পিসি একটু সিরিয়াস হতে শেখো। এই তোমার স্বভাবের দোষেই বাড়ির একটা প্রাণীও সিরিয়াস হতে শিখল না। দোতলায় শোবার ঘরেব মধ্যে থেকে একটা জিনিস চুরি গেল, অথচ সেটা কেউ গায়েই মাখছ না। ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝবার ক্ষমতাই নেই কারও! আজ এ-ঘর থেকে না হয় মোটে একটা জিনিস বেমালুম বেপাত্তা হয়ে গেল। এর পর ক্রমাগতই সব ঘর থেকে সব-কিছুই বেপাত্তা হতে থাকবে না তার গ্যারাণ্টি আছে?"

দিগন্ত বলে ওঠে, "সে তো নেইই। কিন্তু কী গেছে সেটা তো বলছ না। বলো। তা হলে পুলিশে একটা ডায়েরিফায়েরি করিয়ে আসি।"

বেদান্ত বিরক্ত কণ্ঠে বলেন" "পুলিশের কথা উঠছে কেন? অ্যাঁ? খাল কেটে কুমির আনা আর থানায় গিয়ে পুলিশ ডেকে আনা সমতুল্য, তা জানিস না? আর কী গেছে জানলে পুলিশ গ্রাহ্য করবে ভাবছিস?"

পিসি এবার রেগে উঠে বলেন, "তো বলবি তো, কী গেছে? তেমনি দামি কিছু গেলে পুলিশের কাছে শরণ নেওয়া ছাড়া গতি কী?"

বেদান্ত বর্ধন গম্ভীরভাবে বলেন, "পুলিশের কাছে 'তেমন' কিছু হবে না পিসি, তবে আমাদের কাছে অনেক দামি। চুরি গেছে দাদামশাইয়ের সেই ছবিটি।"

"দাদামশাইয়ের ছবিটি!"

"দাদামশাইয়ের সেই ছবিটি!"

প্রায় সমস্বরে সকলে মিলে বলে উঠল, "কোন ছবিটি! কার দাদামশাইয়ের?"

বেদান্ত এখন আর উচিচংড়ের মতো লাফ খান না। আত্মস্থভাবে গম্ভীর গলায় বলেন, "পিসি বাদে সকলেরই দাদামশাই। আর কোন ছবি? ছবি হচ্ছে সেইটি! মা বেঁচে থাকতে রোজ সন্ধ্যেবেলা যার সামনে একটা ধূপ জ্বেলে চরকিপাক ঘোরাতেন।"

ব্যাপারটা অনেকদিনের পুরনো। বউ দুটো দেখেছে কি দেখেনি কে জানে। ভাই দুটোও তেমন মনে করতে পারল না। তবু বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। মনে পড়েছে। তো, সেই ছবিটা চুরি গেছে?"

"গেছে। আমার টেবিলের ধারের পুব দেওয়ালের কোণে বরাবর ছিল, হঠাৎ আজ দেখছি নেই। অথচ ওই ঘরেই আমি শুই। কখন কোন ফাঁকে এই ঘটনা ঘটল তাই ভেবে তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি।"

পিসিও সঙ্গে-সঙ্গে খরখরিয়ে ওঠেন, ''আরে বড়ো তাজ্জব করছিস রে বেদা !··· তোর দাদামশাইয়ের সেই মান্ধাতার আমলের রং-জ্বলা ছবিখানা চোরে চুরি করতে এল ! চোরের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই।''

বেদান্ত আরও আত্মস্থভাবে বলেন, ''রোসো, একে-একে জবাব দাও। দাদামশাই কারও মান্ধাতার আমলের ভিন্ন আধুনিক আমলের হয় না বুঝলে ? আর পুরনো হয়ে গেলেই দেওয়ালে টাঙানো ফোটোর রং জ্বলে যেতে বাধ্য। কাজেই এতে জিনিসটার দাম কমে যায় না।''

''কিন্তু, দাদা ! ওই ছবিটা চুরি করতে আসবার দায় পড়েছে কার ?''

''দিগন্ত, তুইও দেখছি ইংলিশ মিডিয়ামের দোষগুলি আহরণ করে ফেলেছিস। 'দায় পড়েছে' শব্দটা কি দাদামশাইয়ের পক্ষে বেশ সম্মানজনক ?''

মেজদাকে কোণঠাসা হতে দেখে সুমন্ত বলে ওঠে ''হ্যাঁ, কথাটা ঠিক ! ওভাবে বলা উচিত হয়নি মেজদার। তবে কথা হচ্ছে ওই সামান্য ছবিখানাকে চুরি করতে আসবে কে ?''

তুমিও সেই একই ভুল করছ সুমন্ত। ছবিটা সামান্য নয় অসামান্য। বুঝলে ? তুমি কি আর একবার দাদামশাইকে সামনে বসিয়ে তাঁর সেই সৌম্যমূর্তির একখানি ছবি তুলে নিয়ে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখতে পারবে ? বলো পারবে ?''

দুই ভাইয়ের দিকে তীব্র দৃষ্টি হানেন বেদান্ত।

পারবে এ-কথা আর কে বলবে ? তাই ভাইয়েরা চুপ। তবে ছোট ভাইয়ের বউ বলে ওঠে, ''কিন্তু বড়দা, ওই ছবিটি আমাদের কাছে যতই মূল্যবান হোক, ওর তো আর কোনও বাজারদর নেই। যে যা করবে, তার লাভ কী ? মানে কোন মোটিভে সে···''

বেদান্ত ক্রমেই গভীর থেকে গভীরে চলে যাচ্ছেন। হাত তুলে বলেন ''থামো বউমা। 'খুন' আর 'চুরি' এই দুটো ব্যাপারের 'মোটিভ' সবসময় রহস্যাবৃত। অপরাধ বিজ্ঞানের বইটইগুলো যদি একটু পড়তে-টড়তে। ওইসব দামি দামি দুর্লভ গ্রন্থ বাড়িতে পড়ে থেকে থেকে পচছে, অথচ তোমরা একবারও—যাকগে। এখন আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দাও তোমরা। দাদামশাই নিশ্চয় ছায়া থেকে কায়া হয়ে গিয়ে পায়ে হেঁটে কোথাও চলে যাননি ?''

''না তা মানে সে-কথা কে বলছে ?''

''তোমরাই বলছ। আমি তো বলছি কেউ দেওয়াল থেকে নামিয়ে নিয়ে না গেলে···'' হঠাৎ আবার আগের মতো তুড়িলাফ খেয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন বেদান্ত, ''আলবাত কেউ নিয়েছে। ছবিখানা নিজে-নিজে উড়ে চলে যেতে পারে না। চোর কে খুঁজে বার করতেই হবে।''

পিসিও এবার আবার তেড়ে ওঠেন, ''তবে, দে, এক্ষুনি পুলিশেই খবর দে। কুকুর নিয়ে এসে তাকে দিয়ে শুঁকিয়ে চোরকে খুঁজে বার করুক। সাধে বলি বিয়ে-টিয়ে না করে রাতদিন যত রাজ্যের উনচুটে-উনচুটে বই নিয়ে পড়ে থাকলেই এইরকম উনচুটে-বুদ্ধি হয়। তোর দাদামশাইয়ের ছবিখানা চুরি করে কার কী স্বর্গলাভ হবে তা একবার খেয়াল করছিস না ? আসলে ছবিটা ছিলই কি না তা কে জানে।''

"কী ? আসলে ছিলই কি না ? এসো। দেখে যাও সবাই। এসো বলছি…"

"এই এক পাগলের পাল্লায় পড়া গেল বাবা ! যেটা 'নেই', 'চুরি' গেছে, 'উড়ে' গেছে, 'হাওয়া' হয়ে গেছে, সেটা আবার দেখবে কী ?"

হ্যাঁ। আছে দেখবার। সেই দাগটি। একদা যে ছিল দীর্ঘকাল ধরে তারই স্মৃতিচিহ্ন বহন করে দাঁড়িয়ে আছে দেওয়ালখানা।

"তবে ? এখন পথে এসো সবাই !"

বেদান্ত বলে ওঠেন, "যখনই সেই গাবদাগোবদা টিকটিকিটা বিনা নোটিসে এসে টেবিলে পড়েছিল তখনই বুঝেছি বাড়িতে একটা কিছু ঘটেছে। আশঙ্কা সত্যি হল। দেখছি, চিরদিনের দাদামশাই আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।"

"টিকটিকি !" সবাই হতভম্ব।

পিসি খ্যানখেনিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন। "এর মধ্যে আবার টিকটিকি এল কোথা থেকে ?"

বেদান্ত আবার গম্ভীর হল, "টিকটিকিরা যে কোথা থেকে আসে, তা ভগবানের ঠাকুর্দাও জানে না। কেউ কখনও ওদের বাসা দেখেছে ? ইঁদুর, আরশোলার মতো ছানাপোনা নিয়ে ঘরসংসার ? দেখেছ কেউ ? কেউ না। থাকলে তো দেখবে ? ওঁরা হঠাৎ-হঠাৎ আসেন একটা কোনও খবর দিতে। হয় শুভ নয় অশুভ। যে-কোনও খবর।"

"খবর। তুই যে আমায় হাঁ করে দিচ্ছিস বেদা ! টিকটিকি কি খবরের অফিসে চাকরি করে, না ডাকপিয়ন ? তাই খবর দিতে আসে ?"

"পিসি !"

বেদান্ত জলদগম্ভীরভাবে বলেন, "আমার ঠাকুমা তোমারই নিজের মা ছিল না ? বলো ছিল কি না ?"

"তো, আমি কি বলছি সৎমা ছিল ?"

তোমার ব্যবহারটা অবশ্য সেইরকম।…বলি—"ঠাকুমা যেদিন মারা গেল ? মনে নেই ? ঠাকুমা বলে ওঠেন আজই আমার শেষদিন।"

পিসি হাত দুটো জোর করে একবার কপালে ঠেকিয়ে বলে ও-কথা বাদ দে। ওকে বলে কাকতালীয়। তারপর থেকে এই আমারই গায়ে-মাথায়, হাতে-পায়ে অন্তত বিশবার টিকটিকি পড়েছে। ভাঁড়ারঘরের দেওয়ালে তো রাতদিন টিকটিকি ঘুরছে, তো গায়ে পড়লে আমিও তো মায়ের মতো পড়েছে বলে বলে উঠি আজই আমার শেষদিন। কই ফলেছে কোনওদিন ?"

"অবিশ্বাসীদের কিছুই ফলে না।"

বেদান্ত অমোঘ স্বরে বলেন, "বিশ্বাসের জোর থাকলে হাতে-হাতেই ফলত।"

"ভাগ্যিস সে জোর নেই।"

পিসি বলে ওঠেন, "মায়ের মতন দুম করে মরে যেতে আমার দায় পড়েছে। টিভিতে কত

সব ভাল-ভাল সিরিয়াল চলছে। তা ছাড়া শুনছি আবার নাকি রামায়ণের শেষাংশ দেখাবে। তারপর আবার মহাভারত।…একটা টিকটিকির মান রাখতে মরতে যাব কেন রে?''

''মরতে বলা হয়েছে তোমায়?''

''প্রকারান্তরে তো তাই বললি। বিশ্বাস থাকলে হাতে-হাতে ফল পেতুম।''

বাজে তর্ক কোরো না পিসি! সাধে বলি, কিছুতেই সিরিয়াস হতে শিখলে না! বাড়িতে একটা অস্বাভাবিক চুরি হয়ে গেল, অথচ কে বলতে পারে ছবিখানা শুধুই ছবিমাত্র ছিল কি না! কোনওদিন তো খুলে দেখা হয়নি পিছনে কোনও গোপন দলিল, কি গোপন উইল, কিংবা পারিবারিক কোনও মূল্যবান হিরেটিরে সাঁটা ছিল কি না।…আমরা ভেবে রেখেছি ছবি না ছবি! যে নিয়েছে সে হয়তো সন্ধান-সুলুক জেনে ফেলে…''

''মাথাটার চিকিৎসা করাও দাদা।''

বলে ভাইয়েরা হাসতে-হাসতে চলে যায়। এবং তাদের বউরাও সেই কাজই করে তবে হাসি চাপতে-চাপতে। শুধু টুকাই আর মকাই, যারা এতক্ষণ জেঠুর নানা দাপট দেখছিল, তারা কাছে সরে এসে বলে, ''জেঠু, ছবির মধ্যে থাকে ওসব?''

''থাকেই তা বলছি না। থাকতে পারে। দাদামশাই ছিলেন জমিদার মানুষ! কোনও আশ্চর্য ঘটনা তো থাকতেও পারে! হয়তো-বা কোনও গুপ্তধনের সন্ধানী ম্যাপ একখানা ছবির পিঠে সেঁটে রেখে মেয়েকে দিয়েছিলেন।''

''জেঠু, আমরা খুঁজব?''

''বিশ্বাস থাকে তো খোঁজো মানিকজোড়! তো, আমি পুরস্কার ঘোষণা করছি—যদি কেউ খুঁজে বার করতে পারে নগদ দশ টাকা পুরস্কার।''

''এ মা। মোটে দশ টাকা! বললে যে ছবির মধ্যে 'গুপ্তধনের ম্যাপ', উইল না কী যেন, তা ছাড়া দামি হিরেটিরে সাঁটা আছে…''

''আছেই, তা বলেছি? বলেছি, থাকতে পারে। ঠিক আছে, কুড়ি টাকা!''

''না—আ জেঠু, পঞ্চাশ টাকা!''

বেদান্ত চশমার মধ্যে থেকে ঝিকঝিকিয়ে তাকিয়ে হেসে বলেন, ''এই বয়েসে খুব ওস্তাদ হয়েছিস দেখছি। হবেই তো—ইংলিশ মিডিয়াম বলে কথা। ঠিক আছে পঞ্চাশ টাকাই, ব্যস। আর বাড়বে না!''

''না, না! আর না। তো কোথায় খুঁজব জেঠু?''

''বাঃ। চমৎকার। সেটা আমি বলে দেব? ও পিসি শুনছ?''

পিসি বলেন, ''সবই শুনছি। তবে খুঁজে যদি পায় কেউ তোর দাদামশাইকে, তেনার পিঠের ছাল ছাড়িয়ে দেখবি তো কী আছে না আছে?''

পিঠের ছাল ছাড়িয়ে?''

''তো তাই তো বলছিস! সেই আশাতেই দুটো পুঁটকেকে পঞ্চাশ টাকা প্রাইজ কবুল! সাতজন্মে শুনিনি এমন কথা। আমাদের ছেলেবেলাতেও হারানো জিনিস খুঁজে বার করতে পারলে

বাবা প্রাইজ দিতেন। একটা চকচকে আধুলিই ছিল যথেষ্ট। তেমন দামি জিনিস হলে হয়তো আস্ত একটা টাকা। তাই পেলেই মনে হত রাজ-ঐশ্বর্য।''

বেদান্ত বললেন, ''তা সেটা মনে হতে পারে। পিসি, তোমাদের ছেলেবেলায় এক পয়সায় একখানা ভাল ঘিয়ের হিঙের কচুরি পেতে। এখন বাদাম, তেলেভাজা, একখানা হিঙের কচুরি খেতে এক টাকা লাগে। তা হলেই হিসেব করো।''

''আমার অত হিসেবের মাথা নেই। সময়ও নেই। এখন ভেবে মরছি ওই দুটো নন্দী-ভৃঙ্গিকে 'দাদামশাই' খুঁজতে লাগিয়ে দিয়ে আমার কী মুণ্ডুপাত করলি। দুটোতে মিলে এখন স্বর্গ মর্ত পাতাল তছনছ করে বেড়াবে।''

''পিসি, দুটোর মধ্যে একটা তো মেয়ে। তুমি নন্দী-ভৃঙ্গি পেলে কোথায় ?''

''মেয়ে। মেয়ে বলে কোনও কথা আছে নাকি রে এখন বেদা ? মেয়েরা তো এখন সেপাইয়ের বাবা। ওই মেয়ে নন্দীটির অসাধ্য বলে কিছু নেই।''

''বাঃ। বাঃ। তা হলে তো অতি উত্তম। জিতে রহো বেটা।''

বলে দুটোর মাথায় ঠোকাঠুকি করে ঘরে ঢুকে যান বেদান্ত।

আর নন্দী-ভৃঙ্গি দু'জন তখনই বাড়ি তছনছ শুরু করে দেয়। সিঁড়ির তলা থেকে আলমারির মাথা, কয়লার ঘর থেকে রান্নাঘর। সারা বাড়িতে অবিরতই চারখানি ছোট-ছোট পায়ের বিপুল ধুপধাপ। স্কুলে স্ট্রাইক চলছে। অগাধ সময়।

''তাই বলে তোরা বালিশ ছিঁড়ে তুলো ছড়াবি ?''

টুকাই-মকাইয়ের মায়েরা রেগে আগুন।

''দেখুন দাদা ! কী কাণ্ড করছে এরা। সারা ঘরে বালিশ-ছেঁড়া তুলো।''

বেদান্ত গম্ভীরভাবে বলেন, ''তার মানে ওরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই কাজ করে চলেছে। কিছু খুঁজতে হলে এইভাবে গোড়া থেকেই কাজ করতে হয়। গোয়েন্দা পুলিশরাও এই 'ওয়ে'তে চোরাই মাল খোঁজে। আমার তো বিশ্বাস হচ্ছে এরাব পারবে হারানো মাল উদ্ধার করতে।

অতএব ওরা বীরবিক্রমে সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে বাড়ির যত ড্রয়ার উলটে, যত গদি-তোশক উলটে, যত বইয়ের র‍্যাক বিধ্বস্ত করে। শুধু পিসি বলেছেন, খবরদার আমার ঠাকুরঘরের চৌকাঠ ডিঙোবি না। আর চিলেকোঠার দুদিন ধরে সর্বদা তালা ঝুলছে, এই যা অসুবিধে।

তালা ঝুলছে কেন ?

যারা ওই ঘরটার মালিক তারা দু'দিনের জন্যে তালা ঝুলিয়ে দেশে গেছে বলে।

অবশেষে বোধ হয় হল সাধনায় সিদ্ধি।

কাঠবিড়ালিতেই সাগর বাঁধল বোধ হয়।

উত্তেজিত দুই বীর এসে চুপিচুপি প্রশ্ন করে, ''জেঠু, তোমার দাদুর দাড়ি ছিল ?''

''দাদুর কি ছিল তা তো আর চক্ষে দেখিনি বাবা ! তিনি তো আমার জ্ঞানের আগে পটল তুলেছিলেন। তবে ছবিটার মনে হচ্ছে ছিল একটু-একটু দাড়ি।''

"জ্যেঠু, তোমার দাদু জামা পরতেন না খালি গায়ে থাকতেন ?"

"দ্যাখ, শুনেছি জমিদার মানুষ ছিলেন, জামাটামা কি আর না পরতেন ? তবে ছবিটায় বোধ হয় পুজো করতে বসার স্টাইলে ধুতি-চাদর পরে 'বাবু' গেড়ে বসে থাকা ছিল।"

টুকাই রেগে উঠে বলে, "তোমার কেবল 'বোধ হয়, বোধ হয়' ঠিক করে একটা বলবে তো ?"

"ওই তো বললাম। খালি গা, কাঁধে চাদর, ধুতি-পরা। তোরা যাকে 'চৌকো হয়ে বসা' বলিস। সেইভাবেই ছিল মনে হচ্ছে।"

"ঠিক ?"

"ঠিক।"

"হ্যাঁ রে বাবা, ঠিক, ঠিক। এখন বেশ স্পষ্ট মনে পড়ছে।"

দুই 'শিকারি' (তা শিকারি বলা যায়) এখন গভীর আত্মস্থের ভঙ্গিতে বলে ওঠে, "বাস, হয়ে গেছে। চোরাইমালের সন্ধান মিলেছে। চোরও আজ এসে যাবে।"

"চোর এসে যাবে মানে ? সে ব্যাটা কি তোদের বলেকয়ে ?..."

"অত অধৈর্য হোয়ো না তো জেঠু। গোয়েন্দারা এমন চট করে কথা ভাঙে না। আজ দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করো। হাতে হাতে ধরিয়ে দেব দেখো। ওই...ওই বোধ হয় এসে গেলেন চোর-মহারাজ ! গলার শব্দ পাচ্ছি।"

নাঃ। তোরা দেখছি একখানা ধাঁধা হয়ে উঠলি। দেখি তোদের দুপুর পর্যন্ত।" বলে বেদান্ত বর্ধন তাঁর ঘরে ঢুকে গিয়ে পড়তে পড়তে রেখে যাওয়া অপরাধ তত্ত্বের বইটা হাতে তুলে নেন। এই বইটাই আজ ক'দিন ধরে পড়ে চলেছেন।

অবশেষে এল সেই 'সন্ধিক্ষণ'। সেই দুপুর। খাওয়াদাওয়া সেরে ঘরে এসে বসে ঘনঘন ঘড়ি দেখছেন বেদান্ত। 'দুপুর' কাকে বলে ? বারোটা ? সাড়ে বারোটা ? একটা ?

হ্যাঁ। ঠিক একটার সময় উত্তেজনায় কম্পমান টুকাই আর মকাই চুপিচুপি এসে চাপা গলায় বলে, "জেঠু চলো। এই হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ ! চটপট চলো।"

"আরে বাবা, যাবটা কোথায় ?"

"ছাতে। চিলেকোঠায়। চলো না আমাদের সঙ্গে। নিঃশব্দে আসবে। সিঁড়িতে যেন পায়ের শব্দ না হয়।"

টানতে-টানতে নিয়ে আসে জেঠুকে।

"দরজার মাথার ছিটকিনিটা খোলো। দেখো যেন শব্দ না হয়।"

খোলেন বেদান্ত চিলেকোঠা, অর্থাৎ সিঁড়ির মাথার 'এল'-শেপ ঘরটার দরজাটা।

আর সঙ্গে-সঙ্গে নাকে আসে চমৎকার ধূপের গন্ধ। কী জানি কী ধূপ, ঘর যেন গন্ধে ম ম করছে।

"এখানে কী ?"

"ভেতরে এসে দ্যাখোই না।"

মকাই জেঠুর হাতটা চেপে ধরে শক্ত করে। ঢুকিয়ে নিয়ে যায় 'এল-শেপের ভিতর দিকটায়। পাশের দেওয়ালের ধারে একটা শতরঞ্চি জড়ানো আজেবাজে বিছানা, আর একটা জলের কুঁজো। আর সামনের দেওয়ালের ধারে দু' কোণে দু'খানা-চারখানা থান ইট।

কিন্তু শুধুই কি থান ইট ?

তা তো আর নয়। একজোড়া ইটের ওপর একখানি মা-কালীর পট। তার সামনে দুটো জবা ফুল। আর অন্য একজোড়ার ওপর গলায় নয়নতারা ফুলের মালা পরানো আর সামনে দুটো সাদা টগর ছড়ানো বেদান্তের দাদামশাই !

ওইখানেই একটা হাতে-গড়া মাটির ধুপদানিতে ধুপ জ্বলছে। মানে জ্বলে জ্বলে শেষ হয়ে এসেছে। সুবাস ছড়াচ্ছে।

বেদান্ত অবাক হয়ে বলেন, "এখানে কে থাকে ?"

"আহা! জানো না যেন। ন্যাকাচণ্ডী। থাকে চোরমশাই আর তার দিদিমাটি। এখন দু'জনায় আয়েস করে খেতে বসেছে রান্নাঘরের কোণে! বামুনদি আর বামুনদির নাতি বিশু।"

মকাইয়ের মুখ সাফল্যের গর্বে লাল টকটকে।...

"ওরা দু'দিন দেশে চলে গিয়েছিল দরজায় তালা লাগিয়ে, তাই ঢুকতে পারছিলাম না। তবে জানলাটা বিচ্ছিরি ফাটাচটা কাঠের, তার মধ্যে খুন্তি চালিয়ে চালিয়ে সব দেখে নিয়েছি। জানলার নাগাল পাই নাকি ? ভাগ্যিস অনেক ইট পড়ে আছে তাই। ওপর ওপর চাপিয়ে চাপিয়ে।"

বেদান্ত হতভম্ব হয়ে বলেন, "কিন্তু আমার দাদামশাইয়ের ছবি চুরি করে এনে ওই বিশু পুজো করবে কেন ?"

মকাই হাত উলটে বলে, 'আমরাও তো তাই ভেবে মরছি। কে জানে স্বপ্নাদেশটেশ পেয়েছে কি না। হয়তো উনি বিশুকে স্বপ্ন দিয়েছেন, ওরে দেওয়ালে ঝুলে থেকে থেকে আমার কোমর ব্যাথা হয়ে গেল। আমায় নিয়ে কোথাও একটু বসা। তা এইবেলা দরজা বন্ধ করে আবার পালাই চলো জেঠু। নইলে এসে পড়ে দেখে ফেলবে। আর ভাববে আমরা চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে এসেছি। সন্ধ্যেবেলা বাবা আর মেজোজেঠু অফিস থেকে ফিরলে আদালত বসিয়ে জেরা করে সব জানা হবে।

কিন্তু সন্ধ্যেবেলা কি জেরার আসর বসে ?

না। বসে পরামর্শ। ঘরের দরজা বন্ধ করে। প্রায় গোল টেবিল বৈঠক। তিন ভাই, দুই বউ আর দুই বীর।

বেদান্ত উদারস্বরে বলেন, "আমি বলি কি, কিছু বলে কাজ নেই।"

"বলে কাজ নেই !"

"হ্যাঁ। মানে বোঝাই তো যাচ্ছে ওই মকাইয়ের অনুমানটি? ঠিক। যতই হোক ইংলিশ মিডিয়ামের ব্রেন! ওই স্বপ্নাদেশই।...মা থাকতে ধুপটুপ দিতেন। সেটা বন্ধ হয়ে

যাওয়ায়…"

"তা, দাদা, স্বপ্নাদেশ দেবার আর লোক পেলেন না দাদামশাই ? বামুনদির নাতিকে ?"

বেদান্ত আরও উদার হন।

"তাতে কী ? কার ভাগ্যে কখন কী হয় কে বলতে পারে ? অবশ্যই ছেলেটা খুব সং আর ভক্তিমান।"

টুকাই বলে ওঠে, "আহা ! সৎরা বুঝি চুরি করে ?"

"ছিঃ টুকাই। চুরি চুরি কোরো না। কত ভক্তিভরে ছেলেটা আমার দাদুকে ফুল-চন্দন ধূপটুপ দিয়ে অর্চনা করছে। এর জন্যে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আমি বলি কি…বরং ওই ধূপটুপ কি মিষ্টিটিষ্টির জন্যে ওকে মাসে-মাসে কিছু টাকা দেওয়া হোক। জানতাম ! সেইদিনই বুঝেছিলাম। বাড়িতে একটা শুভ কিছু ঘটতে চলেছে। তা নইলে ওইরকম পুরুষ্ট কলার মতো একখানা টিকটিকি এসে ধপাস করে টেবিলে এসে পড়ে ? আর সরসরিয়ে সরে গিয়ে দেওয়ালে উঠে ঠিক জায়গাটিতে মার্ক করে স্থির হয়ে বসে যায় ? টিকটিকির একটা অতীন্দ্রিয় শক্তি আছে না ? সেই শক্তিতেই সে টের পেয়েছিল ওই বিশু স্বপ্নাদেশ পেয়েছে। এবং দাদামশাই পূজিত হচ্ছেন। তা বেচারি গরিবমানুষ, থানইট ছাড়া কিছু জোটেনি। পরে একটা চৌকিটৌকি করে দিতে হবে। দেখিস এই নিত্যপূজার পুণ্য ফলে ওর ক্রমশ কত উন্নতি হবে। কিন্তু স্পিকটি নট। আমরা যে জেনে ফেলেছি বলে কাজ নেই। লজ্জা পাবে।"

টুকাই এবার হতাশভাবে বলে, "ও জেঠু। তা হলে তোমার দাদামশাইয়ের পিঠের ছাল ছাড়ানোর কী হবে ?"

"কী ? কী বললি ? দাদামশাইয়ের পিঠের ছাল ছাড়ানো ? ছি ছি।"

"বাঃ তুমিই তো বলেছিলে ফটোর পেছনে গুপ্তধন আছে।"

"আছে বলিনি। বলেছি থাকতে পারে।"

"তা সেটা না দেখালে ?"

"টুকাই, আমি বলি কি, দেবধন গুপ্তধন এসবে লোভ রাখা ঠিক নয়। বরং তোমরা অনেক কষ্টে সন্ধান করে ফেলেছ বলে, দু'জনকেই পঞ্চাশ পঞ্চাশ করে দিচ্ছি। মনে রেখো স্পিকটি নট ! যেমন চলছে চলুক।"

কিন্তু টুকাই-মকাইকে সাবধান করলে কী হবে ? বাড়িতে আর একজন নেই ? তিনি টের পেয়ে যাননি চোর এবং চোরাইমালের সন্ধান মিলেছে। কেউ না বললেও তিনি কেমন করে যেন সংসারের সব খবর জেনে ফেলেন। এমনকী, কেউ কোনও কথা তাঁর কাছে চেপে যাবার চেষ্টা করলেও তিনি বাতাসে নাক বুলিয়ে সব বুঝে আর জেনে ফেলেন।

কাজেই চিলেকোঠা অভিযান তাঁর জানা হয়ে গেছে। এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে অ্যাকশান নেওয়াও হয়ে গেছে।

আর তার ফলে কী হল ?

তার ফলে এই গোলটেবিল বৈঠক চলাকালেই বন্ধ দরজায় দুমদাম ধাক্কা।

"কে? কে রে?"

কে আবার? সেই সৎ ভক্তিমান বালকটি।

"এই যে জেঠু, নাও তোমার দাদুর ফটো। এর জন্যে আমার ঘর সার্চ। 'চোর' অপবাদ! গলায় দড়ি আমার!"

"এ কী? এর মানে কী?"

"মানে আবার কী? দু'দিন দেশে গেছি তার মধ্যে এত কাণ্ড! বলি খুব তো দাদুভক্তি। তো, ছবিখানা যে মাসখানেক যাবৎ তোমার দেওয়াল ছাড়া, সে খেয়াল হয়েছিল? উঠল বাই তো কটক যাই। ছবি চুরি গেছে চোরকে ধরাই চাই। কী একখানা 'সোনার মুকুট' তাই লোকে চুরি করবে?"

মকাই বলে ওঠে, "তো নিয়েছিলে তো দেওয়াল থেকে।"

"আহা, তা আর নয়। দড়ি ছিঁড়ে মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছিল কাচ ভেঙে কুচিকুচি। তো, দেখে-টেখে মনে হল বোধ হয় রামকৃষ্ণদেবের ফোটো। আহা তেনার এত দুর্দশা। তাই তুলে নিয়ে গিয়ে দিদিমার ঠাকুরের পাশে বোস করিয়ে পুজো করেছি—কে জানত রামকৃষ্ণদেব নয়। এই রইল। এখন চুরির দায়ে জেলেই দাও আর ফাঁসিই দাও, যা মন হয়!"

তেজী ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়ায় বিশু।

কী মুশকিল।

বেদান্ত তাড়াতাড়ি বলেন, "আমি তোকে বলেছি কিছু?"

"তুমি বলো নাই, তোমার পিসি বলেছে। যার নাম জাভাচাল তার নামই মুড়ি।...তো তিনি তো বলল, দ্যাখগে, তোর কপালে কী আছে।"

"পিসির ওইরকম। না, না, ও-ছবি ফেরত দিতে হবে না বাবা; তুই যেমন পুজো-অর্চনা করেছিলি করগে। আমি বরং ধুপটুপ কিনে দেব।"

বিশু অবজ্ঞা ভরে বলে, "তোমার দাদামশাই বুড়োকে পুজো করতে আমার দায় পড়েছে। ভুলক্রমে রামকৃষ্ণ ভেবেই ওই মুখ্যুমি করেছি এতদিন! তো চোর বলে পুলিশে দেবে তো বলো?"

দিগন্ত আর সুমন্ত বলে ওঠে, "এইটুকু ছেলের কথা দ্যাখো। যা যা পালা আর রাগ বাড়াসনি।"

অতএব বিশু বীরদর্পে চলে যায়।

টুকাই বলে ওঠে, "তো, এখন ছবিটার পিঠ ছেঁড়া হোক জেঠু! দেখি।"

বেদান্ত করুণ গলায় বলেন, "ওর আর কী দেখবি বাবা। সেকালের বাজে দোকানের বাঁধাই। পেছনে একটুকরো ব্রাউন পেপার বই আর কিছু নেই। দেখতেই তো পাওয়া যাচ্ছে।... তখন বুঝেছিলাম সংসারে একটা কিছু অশুভ হতে চলেছে। নইলে আর টিকটিকির—ওরকম..."

মকাই বলে ওঠে, "এর আর অশুভ কী জেঠু?"

"বাঃ নয় ? বামুনদির নাতিনের কাছে হতমান্য হতে হল না ? ওই একখানা রং-জ্বলা, ঝাপসা হয়ে যাওয়া পচা ছবির জন্যে—ধ্যাত। ওঃ, ভাল কথা, তোমাদের টাকাটা। এসো, আমার ঘরে।"

"না জেঠু, ও আর দিতে হবে না তোমায়। তোমার মন খারাপ।"

"দিতে হবে না মানে ?"

বেদান্ত বীরবিক্রমে বলেন, "মন খারাপ, পেট খারাপ, আর মাথা খারাপ যাই হোক—মরদকা বাত, হাতিকা দাঁত বুঝলে ? দুজনে না হয়—পারো একশো করেই পাবে। খেটেছ তো বিস্তর।···তবে হ্যাঁ, ওই অতীন্দ্রিয় শক্তিতে অবিশ্বাসী পিসিকে নিচ্ছ এক হাত। কী দরকার ছিল ওঁর ছেলেটাকে শাসাতে যাবার ? দিব্যি ফোকটে পুজোটা পাচ্ছিল বুড়ো। সেটা এখন ওই কাচভাঙা ছবিটা নিয়ে কী করব আমি তাই শুনি ?

মালয়ের ইতিকথা

আনন্দ বাগচী

"গেত্ আপ! গেত্ আপ আই সে!" প্যাঁচার মতো চোখ ঘুরিয়ে সেই গোলমুখো লোকটা বন্দুকের নল দিয়ে আর একটা খোঁচা মারতে যাচ্ছিল, অমল ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। একটু তফাতে বিশুমামা আর ফ্যাঙ্‌কে ঘিরে ফেলেছে তিনটে বেঁটেখাটো লোক। তাদের একজনের হাতে রাইফেল, তার নলটা বিশুমামার পিঠে ঠেকানো।

সিনেমার ফ্ল্যাশব্যাকের মতো পুরনো ঘটনাগুলো ঝলকে-ঝলকে মনে পড়ে গেল অমলের। এশিয়ার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠার পর সিঙ্গাপুরে জাপানি আক্রমণ। দাদুর পরামর্শে অমল রেঙ্গুন হয়ে কলকাতায় ফিরে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়েছিল। সঙ্গে ছিল চিনে বন্ধু ফ্যাঙ্, সেও রেঙ্গুনে যাবে। বিশুমামা ওদের খানিকটা পথ এগিয়ে দিতে এসেছিলেন। কিন্তু রেলপথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত তিনজনই মালয়ের জঙ্গলে ঘুরপাক খেতে-খেতে জাপানি সৈন্যদের প্রায় মুখোমুখি হয়ে গিয়েছিল। দৈবক্রমে চিনে গেরিলাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় তাদের ক্যাম্পে কয়েকদিনের আশ্রয়। শেষে তাদেরই সাহায্যে এক মালাই গ্রাম থেকে বাঁশের নৌকো কিনে ওরা রাতের অন্ধকারে পেরাক নদী দিয়ে ভেসে চলছিল। মালয়ের জঙ্গল এমনিতেই দুর্গম দুর্ভেদ্য আর রহস্যময়। পদে-পদেই পথ হারাবার আশঙ্কা। তার ওপর উপরি বিভীষিকা জাপানিরা। ভয়ঙ্কর মাকড়সার মতো তারা মালয় দেশটাকে নানা দিক থেকে ঘিরে ফেলার জন্যে জাল বুনতে শুরু করেছে। কোন শহর আর কোন রাস্তা যে তাদের দখলে এখন কেউ জানে না। এই জাপানি মাকড়সার জাল ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবার একটা ক্ষীণ আশা আছে পারিত-এ পৌঁছলে। তাই সেই উড়িয়ে দেওয়া পনটুন ব্রিজের দিকেই ওরা দ্রুত গতিতে ভেসে চলছিল। কিন্তু ভোর হয়ে আসায়, জলপথ আর নিরাপদ নয় ভেবে নদীর খাঁড়ির ভেতর নৌকো লুকিয়ে ওরা ডাঙায় আশ্রয় নিয়েছিল। উদ্বেগ, উত্তেজনা আর সারারাত জাগার ক্লান্তিতে ওরা অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল ঝোপের তলায় বিছানো পাতার বিছানায়। তাই জাপানিরা কখন ওদের ঘিরে ফেলেছে ওরা কিছুই জানতে পারেনি।

"গেট আপ! অমল গেট আপ!" বন্দুকের নল নয়, কেউ ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছিল। অমল এইবার সত্যিকারের চোখ খুলে ফ্যাঙ্‌কে দেখতে পেল। ফ্যাঙ ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে ওকে ডাকছে। চোখ রগড়াতে-রগড়াতে উঠে বসে অমল চারপাশে তাকাল, কিন্তু জাপানি সোলজার-গুলোকে কোথাও দেখতে পেল না। এমনকী বিশুমামাকেও না। কী ব্যাপার কিছুই ওর মাথায়

ঢুকছিল না। তবে কি এতক্ষণ স্বপ্নের মধ্যেই আর-একটা স্বপ্ন দেখছিল? ঘুম থেকে ধড়মড়িয়ে জেগে ওঠার স্বপ্ন, বিগত ঘটনাগুলো সিনেমার মতো মনে পড়ে যাওয়ার স্বপ্ন?

ফ্যঙ্ জানাল, এখানে আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করা নাকি নিরাপদ নয়। পেরাক এখন বিপজ্জনক নদী। পেরাকের ডাউন স্ট্রিমে পেনটুন ব্রিজের চারপাশে এখন কয়েক ডিভিশন জাপানি সৈন্য ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে। সত্যি বলতে কী, তারা এখন জাপানি এলাকার মধ্যেই ঢুকে বসে আছে। যে-কোনও মুহূর্তেই পেট্রল ট্রুপ এসে হানা দিতে পারে। অমল অঘোরে ঘুমোচ্ছে দেখে তাকে না জাগিয়ে ভাগ্যিস ফ্যঙ্ আর বিশুমামা চারপাশ একটু ঘুরে দেখতে বেরিয়েছিল। তাই তো ঝোপের ওপাশে স্থানীয় গেরিলা দলের দু'টি যুবকের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেছে ওদের। নইলে কি আর এত খবর জানতে পারত! একেই বলে, রাখে কেষ্ট মারে কে? বিশুমামাকে নাকি জাপানিদের গুপ্তচর ভেবে পিস্তল তুলে গুলি করতে গিয়েছিল ওরা। কিন্তু ফ্যঙ্ সঙ্গে থাকায় কোনও বিপদ ঘটেনি। সে চিনে ভাষায় সবকিছু খুলে বলায় ওরা আশ্বস্ত হয়েছে। আপাতত ওদের ডেরায় নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিতে রাজি হয়েছে। তবে এখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। বলছে ওদের ক্যাম্পে গিয়ে কাগজপত্র দেখাতে হবে। সব দেখেশুনে ওদের লিডার যদি সন্তুষ্ট হয় তা হলে জাপানিদের নজর এড়িয়ে পারিত-এ পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা ওরাই করে দেবে।

অপরিচিত চিনে যুবক দু'জন ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। বেশ বোঝা যাচ্ছিল এই গভীর জঙ্গলের অন্ধিসন্ধি ওদের নখদর্পণে। নইলে জিলিপির মতো প্যাঁচ-খাওয়া এই শুঁড়ি পথ চিনে এগনো কোনও আনাড়ি লোকের কাজ নয়। লাইন করেই ওরা চলেছিল, ঠিক দার্জিলিং-এর পাহাড়ি ছোট রেলের মতো, সামনে পিছনে যেন দুটো ইঞ্জিন, দুই চিনে যুবক, হাতে পিস্তল। মাঝখানে তিনটে কামরার মতো ওরা তিনজন। নিজেদের মালপত্র নিয়ে। পাছে কেউ পথ ভুল করে বসে, বা পিছিয়ে পড়ে সেইজন্যই এই ব্যবস্থা। কিন্তু অমলের কেমন মনে হচ্ছিল, তারা এই চিনে গেরিলাদের বন্দী। পাহারা দিয়ে ওদের বুঝি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

হঠাৎ এক জায়গায় এসে সামনের লোকটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অমল প্রথমে দেখতে পায়নি। সরু পায়ে-চলা পথটা দশ-বারো গজ এগিয়ে যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোল থামের মতো একসার গাছ বেড়ার মতো দাঁড়িয়ে। গাছগুলোর গুঁড়িকে পিলারের মতো কাজে লাগিয়ে তৈরি হয়েছে একটা দোতলা কাঠ আর বাঁশের তৈরি বাড়ি। ছ্যাঁচা বাঁশ আর পাতায় তৈরি চাটাইয়ের বেড়া। মাথায় ছাউনি সবুজ ত্রিপলে মোড়া, জঙ্গলের সবুজ লতাপাতার সঙ্গে এমনভাবে রং-মেলানো যে ভাল করে নজর করলে তবেই দেখতে পাওয়া যায়। নইলে আধ-নজরে মনে হবে দুর্ভেদ্য ঝুপসি জঙ্গলের দেওয়াল।

শত্রুপক্ষের আস্তানা ভেবে অমল শঙ্কিত হয়েছিল। কিন্তু তা নয়, এটা এই গেরিলাদেরই গোপন ডেরা। সামনের লোকটা মুখে আঙুল পুরে অদ্ভুত কায়দায় সিটি দিল। সঙ্গে-সঙ্গে ওধার থেকেও পালটা একটা শিসের আওয়াজ ভেসে এল।

কিন্তু রাস্তা দিয়ে সোজাসুজি বাড়িটার দিকে না এগিয়ে সামনের লোকটা ওদের নিয়ে বাঁ পাশের ঝোপের মধ্যে ঢুকল। ফার্ন জাতীয় আগাছার লতাপাতা দুহাতে যেন বিলি কেটে লোকটা এগোচ্ছিল। তার দেখাদেখি ওরাও। পানাপুকুরের পানা সরানোর মতো, পায়ে-চলা সরু পথটা আবার ডালপাতায় ঢেকে যাচ্ছিল পিছনে।

অমল নিচু গলায় বিশুমামাকে শুধোল, 'আমরা তো ওই বাড়িটাতেই যাচ্ছি। তা হলে পরিষ্কার রাস্তা ছেড়ে এমন ঘুরপথে কেন?''

বিশুমামা বলল, "বুবি, ট্র্যাপ কথাটা শুনেছিস? আমার মনে হয়, ওই রাস্তায় সেইরকমই কোনও ট্র্যাপ বা ফাঁদ পাতা আছে, শত্রুকে বিপদে ফেলার জন্যে। যুদ্ধের সময় যেমন চলার পথে মাইন পেতে রাখে।"

অমলের গায়ে কাঁটা দিল কথাটা শুনে। একটু পরেই ওরা উঠোন মতো একটুকরো ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পৌঁছল। একপাশে বাড়ি, অন্য পাশ দিয়ে ফুটতিনেক চওড়া একটা নালা দিয়ে স্ফটিকের মতো ঝকঝকে জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে ঝিরঝির করে। আসলে ঝরনা। কোন পাহাড় থেকে বয়ে আসছে কে জানে। ঝরনার ওপিঠে একটা গাছের গায়ে চোখ পড়তেই চমকে উঠল অমল, একটা দড়ির মই ঝুলছে যেন। মই বরাবর চোখ তুলতেই দেখতে পেল ব্যাপারটা। উঁচু গাছের মগডালে শকুনের বাসার মতো। প্রায় তিনতলা সমান উঁচুতে একটা মাচা বাঁধা, মইটা নেমে এসেছে সেখান থেকে। কচুর পাতার মতো বড়-বড় পাতার একটা অর্কিড সাপের মতো পেঁচিয়ে আছে গাছের গুঁড়িটা। তার ফলে এমন একটা ঘেরাটোপ তৈরি হয়েছে যে, মাচাটা চট করে চোখে পড়ে না। ওই টঙে উঠে কেউ নিশ্চয় চারপাশে নজর রাখে, কিন্তু এই মুহূর্তে বোধহয় ওখানে কেউ নেই। অমল যে ব্যাপারটা দেখতে পেয়েছে, তেমন কোনও ভাবান্তর না দেখিয়েই চিনে যুবকটির পিছু-পিছু উঠোন পেরিয়ে বাড়িটার দরজার সামনে গিয়ে পৌঁছল।

বেশ নিচু দরজা, বোধহয় খিড়কি, মাথা হেঁট করে ঢুকতে হল।

ঘরের ভেতরে তিনটে লোক অনেকগুলো কাঠের প্যাকিং বাক্সর সিল খুলে কিছু দেখছিল, ওদের দেখে চমকে উঠল। সবচেয়ে ঢ্যাঙা লোকটা চোখের পলকে উঠে দাঁড়াল, তার হাতে একটা রিভলভার। অমলদের গাইড চিনে যুবকটি দ্রুত গতিতে কীসব বলে যেতে লাগল, অমল তার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারছিল না। শুধু তার নাকে আসছিল শুঁটকি মাছের ঝোল ফোটার গন্ধ। পাশের ঘরে বোধহয় রান্না চেপেছে। এতক্ষণের চাপা খিদেটা চনমন করে উঠল পেটের মধ্যে।

সব শুনে ঢ্যাঙা লোকটার মুখের ভাব বেশ নরম হল। সে রিভলভার কোমরে গুঁজে এগিয়ে এল হাসি-হাসি মুখে। তারপর হাত বাড়িয়ে বিশুমামার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বলল, "তোমরা আমাদের অতিথি, এবং বন্ধু, তোমরা যাতে নিপ্পন আর্মির হাতে না পড়ো, সে চেষ্টা নিশ্চয় করব। কিন্তু তার আগে কিছু ফর্মালিটিজ আছে। আমরা কতগুলো ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে চাই।"

বিশুমামা খুশি হয়ে বলল, ''স্বচ্ছন্দে। আমরা মিথ্যে বলিনি। আমাদের ব্যাগে কাগজপত্র

আছে, ইচ্ছে করলে দেখতে পারো।"

ঢ্যাঙা লোকটার ইশারায় তার সঙ্গী দু'জন এগিয়ে এল। তারা অমলদের দেহ তল্লাশি করল। হয়তো ভেবেছিল ওদের কাছে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র আছে। পেল না। তখন ওদের দলপতি মাপ চেয়ে নিয়ে বলল, "ঠিক আছে। তোমরা স্নানটান করে নাও। আমি ততক্ষণ তোমাদের কাগজপত্তর দেখি।"

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। শুঁটকি মাছের ঝোল দিয়ে গরম ধোঁয়া-ওঠা ভাত, মুরগির মাংস আর ব্যাঙের ছাতার তরকারি। এত ভাল রান্না অমল আশাই করেনি। তাই খুব তারিফের চেখে বুড়ো মালয়ি লোকটার দিকে তাকিয়ে হেসেছিল। খাবার পরিবেশন করে লোকটা একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ছিল। একমুখ দাড়ি, মাথায় কাকের বাসার মতো রুক্ষ চুল, চোখ দুটো কেমন ভীত-সন্ত্রস্ত জন্তুর মতো। বোধহয় লোকটা বোবা, কারণ এসে-অবধি লোকটার মুখে একটাও কথা শোনা যায়নি।

বিশুমামা হেসে ফেলে বলল, "খঞ্জব্যঞ্জন কেমন খেলি ?"

খঞ্জব্যঞ্জন ?" অমল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, "কোনটার কথা বলছ ?"

"জঙ্গলে এসে তুই ফিফ্‌টি পার্সেণ্ট বোকা হয়ে গেছিস, অমু। খঞ্জ মানে খোঁড়া জানিস না। লোকটা পায়ে খোঁড়া, কিন্তু হাতে খাটো না। আইটেমগুলো রীতিমত ইটেবল করেছে। আরে এ কী!" অমলের চেটেপুটে সাফ করে আনা ডিশের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বিশুমামা কী যেন দেখাল।

অমল চোখ ফিরিয়েই চমকে গেল। রক্ত, তাজা রক্ত দু-তিন ফোঁটা ডিশের ওপর ছড়িয়ে গেছে। তাকিয়ে থাকতে-থাকতেই আরও একটা ফোঁটা পড়ল। অমল ভেবেছিল তার নাক থেকেই হচ্ছে। খেলার মাঠে দু-একবার চোট খেয়ে নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে বটে, কিন্তু আজ তো কোনও আঘাত লাগেনি তার। সাবধানে বাঁ হাতের চেটো দিয়ে নাক মুছে হাতের দিকে তাকাল। কিন্তু কোথায় ? নাকে ছিটেফোঁটা রক্তের চিহ্নও নেই।

"দেখি মুখ ফেরা তো ! ওঃ হো ! তোর কপাল কাটল কী করে ?"

স্নান করে উঠেই চুল আঁচড়ানো অমলের স্বভাব নয়, আজও আঁচড়ায়নি। চুলগুলো কপালের ওপর এসে পড়েছে। তাই ক্ষতস্থানটা সঠিক দেখা না গেলেও, রক্তটা কপাল থেকেই গড়াচ্ছে সন্দেহ নেই। কিন্তু মালয়ি লোকটা ঠিক বুঝেছিল, সে ছুটে গিয়ে এক খাবলা নুন নিয়ে এসে অমলের কপালে ঘষে দিল, বাঁ হাতের কনুইয়ের কাছটাতেও। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই রক্তের ডেলার মতো কী যেন খসে পড়ল। ডেলা দুটো সামান্য নড়ছিল।

বিশুমামা বলল, "মাই গড ! জোঁক। জোঁকের মুখে নুন দিলে কী হয় দ্যাখ।"

বেশ বড়সড় সাইজ, রক্ত খেয়ে টোল্লা হয়েছিল। নুনের সংস্পর্শে কেমন কেমিক্যাল অ্যাকশন শুরু হয়ে গিয়েছিল, জোঁকের শরীর যেন গলে যাচ্ছিল। পিত্ত গলে যাওয়ার মতো।

জোঁকটা কোত্থেকে এসেছে অনুমান করতে বিলম্ব হল না।

অমলের মনে পড়ল আজকে স্নান করতে গিয়ে ঝরনার ওপাশে ডোবামতন একটা জায়গা দেখতে পেয়ে, সেই জলাটার ধারে কিছুক্ষণ বসে ছিল। বসার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, গাছের ওপরে শকুনের বাসার মতো সেই মাচাটাকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করা। ডোবার স্থির জলে মাচার একটা পাশে ছায়া পড়েছিল স্পষ্ট হয়ে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে অমলের চোখে পড়ল মানুষরূপী সেই শকুনটাকে, পাতার ঘেরাটোপের আড়াল থেকে একটা বন্দুকের নল সামান্য বেরিয়ে আছে। বোঝা যাচ্ছে তাদের গতিবিধির ওপর কেবল নজর রাখছে তাই নয়, লোকটা তাদের বন্দুকের নিশানার মধ্যেই বেঁধে রেখেছে। পালাবার চেষ্টা করলেই গুলি করবে।

মুখে ভাবান্তর প্রকাশ করেনি অমল। ঘরে গিয়ে বিশুমামাকে পরে বললেই হবে। মুখ তুলে মাচার দিকে একবার তাকায়নি পর্যন্ত ও। ওই ওয়াচ-টাওয়ারে একটা লোক লুকিয়ে বসে যে কেবল বহিরাগত শত্রুর অপেক্ষায় থাকে তাই নয়, দিনরাত তাদেরও পাহারা দেয় এটা জানতে পেরে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছিল সে। আহারান্তে ঘরে ফিরে ব্যাপারটা বিশুমামাকে বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সে কথা কানেই তুলল না। সবজান্তার হাসি হেসে বলল, "জানি, নট এ ম্যাটার অব জোকস। জোঁক বলে কথা! দেখি কাছে আয়।"

বিশুমামা ঠিকই সন্দেহ করেছিল। অমলের গোড়ালির ইঞ্চি-তিনেক ওপরে হাঁটুর উলটো দিকের নরম ভাঁজের মধ্যে আর পেটের কাছে আরও তিনটে জোঁক স্টিকিং প্লাস্টারের মতো সেঁটে আছে দেখতে পাওয়া গেল। তবে স্টিকিং প্লাস্টার টেনে খোলা যায়, জোঁককে টেনে ছাড়ানো যায় না। তার কামড়ও প্রায় মরণ-কামড়। বিশুমামা তাড়াতাড়ি ব্যাগের ভেতর থেকে একটা শিশি বের করল। শিশিতে লবণ আর তামাক পাতার ঘন আরক, একফোঁটা করে ওদের গায়ে দিতেই মন্ত্রের মতো কাজ হল। জোঁকগুলো গা থেকে ছিটকে পড়ে ড্যালা পাকিয়ে থ্যাঁতলানো জামের মতো হয়ে গেল। এই রক্তখেকো জীবগুলো নাকি মালয়ের জঙ্গলের কোনও-কোনও অঞ্চলের বিভীষিকা। বৃষ্টি হলেই এদের অ্যাকটিভিটি অনেকগুণ বেড়ে যায়। ক্ষতস্থানগুলো দিয়ে অনেক সময় ছিলছিলিয়ে রক্তপাত হয়। চুলকোয়, দূষিত ঘায়ের সৃষ্টি হয়। কৌটো খুলে বিশুমামা যখন ক্ষতমুখগুলোয় সালফাথায়াজোল পাউডার লাগিয়ে দিচ্ছিল প্রতিষেধক হিসেবে অমল বলল, "জোঁকের মালয়ি নাম কী জানো?"

বিশুমামা থমকে গিয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল, "কেন বলতো?"

"ওরাং জহৎ।" অমল হাসল, "ঠিক বলেছি?"

"না।" বিশুমামা মাথা নাড়ল, "তুই এইমাত্র যে কথাটা বললি, তার মানে খারাপ লোক। মালয়ি ভাষায় 'ব্যাড ম্যান' বোঝাতে শব্দটা ব্যবহার করা হয়।"

"তবে যে···" বলেই অমলের কী মনে পড়তেই হঠাৎ থমকে গিয়ে বলল, "বিশুমামা, বোবা আজ কথা বলেছে?"

"কে কথা বলেছে?"

"ওই বুড়ো রাঁধুনিটা। আমার কপালে লবণ ঘষে দেবার সময় চাপা ফিসফিসে গলায় ওই

কথাটা বলল। আমি ভেবেছিলাম জোঁক দেখে বলেছে।"

"হুঁ।" বলেই বিশুমামা কেমন গম্ভীর হয়ে গেল।

ফ্যাঙ্ অবাক হয়ে বলল, "রিয়্যালি?"

বিশুমামা নিচু গলায় বলল, "আমি জানতাম। লোকটা বোবা না, ওকে ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রাখা হয়েছে। ও তোকে এই চিনে মস্তানগুলোর সম্পর্কেই সাবধান করে দিয়েছে। আমারও ক'দিন থেকে কেমন সন্দেহ হচ্ছিল এরা গেরিলা নয়, ডাকাত-দল। কিংবা কখনও গেরিলা দলে থাকলেও এখন দলত্যাগী একটা ক্রিমিন্যাল-গ্যাং ছাড়া কিছু নয়। বিশেষ মতলবে আমাদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে ধরে রেখেছে। হয়তো অর্থের বিনিময়ে জাপানিদের হাতেই তুলে দিতে চায়।"

"তা হলে উপায়?"

"কেটে পড়তে হবে। বাঁচতে হলে এই একটা রাস্তাই এখন আমাদের সামনে রয়েছে। তবে খোলা রাস্তা না, অনেক ঝুঁকি আর অনিশ্চয়তা আছে। তোরা বিশ্রাম কর। আমাকে ভাবতে দে। বিকেলে কথা হবে।"

অমল চোখ বন্ধ করে শুয়ে-শুয়ে ব্যাপারটা ভাবছিল। বিশুমামা পালানোর কথা বলল বটে কিন্তু এখান থেকে পালানো অসম্ভবের অসম্ভব। ঢ্যাঙা লোকটা তার পাঁচজন জঙ্গি শাগরেদকে নিয়ে দিনের বেলাটা বোধহয় বাইরে-বাইরে কাটায়, কখন বেরিয়ে যায় কখন ফেরে কিছুরই ঠিক-ঠিকানা নেই। কিন্তু ওরা বেরিয়ে গেলেও বাড়ি খালি থাকে না। গাছের মাচায় ওই ইঁদুরমুখো লোকটা গা-ঢাকা দিয়ে বসে থাকে। দোতলার যে ঘরটায় তারা থাকে, তার দরজা-জানলা নেই। একপাশের দেওয়ালে ফুট-ছয়েক উঁচুতে টানা জাফরি। তা দিয়ে কাজ চালানোর মতো আলো আসে, গাছের ডাল-পাতার ফোকর দিয়ে ছিটেফোঁটা আকাশ দেখা যায়। কলকাতায় যেমন অনেক দোকানঘরের কাঠের সিলিং-এর ওপরে ঘর থাকে, এ-ঘরটাও তেমনই। এক পাশের মেঝেতে চৌকো-মতো একটা কাটা জায়গা। একটা হাল্কা কাঠের মই বেয়ে ওঠানামা করতে হয় সেখান দিয়ে। নীচে বসার ঘরের এক প্রান্তে মই বেয়ে নামলেই মুখোমুখি একটা খুপরিমতো ঘর দেখা যায়। সেখানে থাকে ওদের আর-একটা ওয়াচডগ। ওয়াচডগ নামটা অমলের দেওয়া। আসলে একটা ফ্যাটি চিনেম্যান, কোলাব্যাঙের মতো থপথপে চেহারা, হুতোম প্যাঁচার মতো গোল মুখ। রাম ট্যারা, কোন দিকে তাকিয়ে আছে বোঝা যায় না! কিন্তু লোকটা অদ্ভুত ক্ষিপ্র আর নিঃশব্দ। চলাফেরা করে বনবেড়ালের মতো লঘু পায়ে। যেন পায়ের তলায় ক্রেপের প্যাড আর শক্তিশালী স্প্রিং লাগানো আছে। লোকটা অবশ্য বেশির ভাগ সময়ই বসে থাকে, হয় বসার ঘরে, নয় তার খুপরি ঘরটার ভেতরে। কিন্তু চুপ করে বসে থাকে না। বাটালির মতো ধারালো যন্ত্র দিয়ে কীসব খোদাই করে। বাঁশের গাঁটওয়ালা মোটা শেকড় থেকে হয়তো তামাক খাওয়ার পাইপ বানায়। লোকটা বোধহয় জাগলার ছিল, কোনও সার্কাসের দলে ছুরির খেলা দেখাত। চার-পাঁচটা ধারালো ছুরি নিয়ে প্রায়ই শূন্যে লোফালুফি খেলে। অমল জানে লোকটার ছুরির নিশানা বন্দুকের গুলির মতোই নির্ভুল। পঁচিশ-তিরিশ ফুট দূর থেকে সেদিন যেভাবে গাছের গুঁড়িতে একটা ছুটন্ত কাঠবেড়ালির মাথাটা গেঁথে দিয়েছিল, তা থেকেই

বোঝা গিয়েছিল লোকটার হাতে শুধু জাদুই নেই, লোকটা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরও বটে। মানুষ মারতেও ওর হাত কাঁপবে না। চলতে-ফিরতে সবসময় একজোড়া চোখের দৃষ্টি পিঠ ছুঁয়ে আছে এরকম একটা শিরশিরে অনুভূতি মনের মধ্যে অস্বস্তি ছড়ায়। বোঝা যায় না, এ-বাড়ির কোনও ফাঁকফোকর দিয়ে আরও কোনও অদৃশ্য চোখ নজর রেখেছে কি না। রাত্রিবেলা যখন বাড়ির বাইরে যাবার দরজাগুলো বন্ধ হয়ে যায়, ওপর-নীচের ঘরগুলো থেকে ঘুমন্ত নিশ্বাসের শব্দ আর নাক ডাকার ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়, তখনও সেই ফ্যাটি-চিনেটা বসে-বসে ঝিমোয়। বসার ঘরে ঝুলন্ত লণ্ঠন থেকে কেমন ঘুম-ঘুম আলো ছড়াতে থাকে চারপাশে। কাঠের সিঁড়িটা সরিয়ে রাখা হয় অন্য কোথাও অর্থাৎ অমলদের নীচে নামবার আর কোনও উপায় থাকে না। প্রথম দিনই রাত্তিরে অমল কৌতূহলে উঁকি মেরেছিল কাটা জায়গা দিয়ে। সন্ধ্যে-রাত্তিরেও লোকটা নেশা করছিল বসে-বসে। বাঁশের চোঙায় করে সামসু খাচ্ছিল। তখন শুয়ে পড়েছে, বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছে ভেবে অমল যাহা গলা বাড়িয়েছে অমনি শিকারি বেড়ালের মতো লোকটার চোখ ঠিক খুলে গেল। সামান্যতম শব্দেও যার ঘুম ভেঙে যায় সে ঘুমোয় কি না কে জানে। ঘুমোলেও জেগে-জেগে যে ঘুমোয় তাতে সন্দেহ নেই। তাই এখান থেকে কেটে পড়ার কথা বিশুমামা কী করে ভাবতে পারল অমলের মাথায় ঢুকল না।

বিশুমামার হাতের নাড়া খেয়ে অমলের ঘুম ভেঙে গেল। ফ্যাঙ্ ওর আগেই উঠে বসেছে। চোখ কচলে হাতঘড়ির লুমিনাস ডায়ালের দিকে তাকিয়ে দেখল, তিনটে বাজে। শেষ রাত। বিশুমামা বলল, "গেট রেডি। এবার নামতে হবে। খুব সাবধান, যেমন বলেছি।"

বিছানার তলায় খড় পাকিয়ে দড়ি পাকানো হয়েছিল সন্ধ্যেবেলায়। বাঁশের খুঁটির সঙ্গে তার একটা দিক বিশুমামা বেঁধেই রেখেছিল। এবার নিঃশব্দে ঝুলিয়ে দিল। অমলের বুক দুরুদুরু করছিল। ফ্যাটিটা জেগে উঠলে কী যে কাণ্ড ঘটবে কেউ জানে না। অমল দেখতে পাচ্ছিল লোকটা এদিকে মুখ করেই শুয়ে আছে, একটা হাত থাবার মতো পাতা আছে একটা চামড়ার খাপের ওপর, যার ভেতর থেকে অন্তত হাফ-ডজন ছুরির বাঁট বেরিয়ে আছে।

বিশুমামা দড়িটা ধরে চোখের পলকে নেমে গিয়ে লোকটার সামনে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে কী করল। অমল স্পষ্ট দেখল চামড়ার চওড়া খাপটা বিশুমামার হাতে, লোকটা বোধহয় বুঝতেও পারল না। বিশুমামা আঙুল তুলে ওদের নামতে ইশারা করল।

সঙ্কেত পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই অমল 'দুর্গা' বলে ঝুলে পড়ল। হাতের ইঙ্গিতে বিশুমামা তাকে দরজা খুলতে বলেই নিজে একটা ঝোলানো লণ্ঠন নিয়ে উবু হয়ে বসে পড়ল, সামান্য কিছু কারিকুরি করবার আছে তার। পা টিপে-টিপে এগিয়ে গিয়ে অমল যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে দরজার হুড়কো খুলে ফেলে ফিরে তাকাল, কিন্তু ফ্যাঙ্‌কে দেখতে পেল না। তার এতক্ষণে নেমে আসার কথা। শুধু বড় ব্যাগটা কাঁধে ফেলে, জাস্ট নেমে আসবে। জামাকাপড়, তিন জোড়া জুতো আর ওষুধপত্র ব্যাগের মধ্যে সম্পত্তি বলতে এই, বাকি সর্বস্ব তো ডাকাতদের হেফাজতে। মায় বিশুমামার ক্যামেরাসুদ্ধু। পরে ফেরত দেবে বলেছিল, দেয়নি। কাগজপত্র, ম্যাপ-নকশা,

দূরবিন-কম্পাস, টাকাকড়ি, টিনফুড সব ফেলে রেখে শূন্য হাতে বিদায় নিতে হবে এই যা দুঃখ। অনিশ্চিত ভাগ্যকে সম্বল করে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে এই অজানা জঙ্গলের দরিয়ায় তাদের ভাসতে হবে। ফ্যাটির শিয়রে একটা পাঁচ সেলের টর্চ উঁকি মারছিল, অমল দেখামাত্র ছোঁ মেরে সেটা তুলে নিল। মনে পড়ে গেল ফ্যাঙের ওপরে অন্য একটা দায়িত্ব আছে। ও বোধহয় সেই কাজ করছে, তাদের বিছানার তলা থেকে খড়গুলো টেনে এনে মুখের কাছটায় জড়ো করছে। কান পেতে অস্পষ্ট শব্দ শুনতে চেষ্টা করছে এমন সময় ফ্যাঙ্ রিঙের খেলা দেখানো জিমন্যাস্টের মতো সিলিংয়ের কাটা জায়গা দিয়ে সরল রেখায় তার শরীরটাকে নামিয়ে দিল।

ও নেমে এসে দাঁড়াতেই বিশুমামা লণ্ঠনটাকে বাস্কেট বল নেট করার কায়দায় ছুঁড়ে দিল। ওপরের ঘরে সেটা অদৃশ্য হল। অমল ভেবেছিল বেশ আওয়াজ করে চিমনিটা চুরমার হবে কিন্তু তার বদলে ঝুপ করে একটা শব্দ হল। তেমন জোরেও না। কিন্তু তার ফলেই কি না কে জানে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সেই টানা ছন্দে তাল কেটে গেল কোথাও, যেন থমকে গিয়ে পাশ ফিরে শুল। আসলে কোরাস থেকে একটা নাক যে কাটা গেছে, তার ডাক যে বন্ধ হয়ে গেছে সেটা টের পাওয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই অমল যেন ভূত দেখল, বিশুমামার ডান দিকে, কোনাকুনি পিছনে আণ্ডার উইয়ার আর স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরা একটা লোক এসে দাঁড়িয়েছে, এক্ষুনি বোধহয় ওর ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়বে। বিশুমামাকে যে সাবধান করে দেবে, অমল সে সময়টুকুও পেল না। সে শুধু চোখে একটা ধাঁধা দেখল। দেখল বিশুমামা বিদ্যুৎ-গতিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে খোলা হাতটাকে কাটারির মতো ব্যবহার করল। গলার মাঝামাঝি জায়গায় যে গুঁটুলি মতো জিনিসটাকে অ্যাডমস অ্যাপল বলে, ঠিক তার ওপরেই বোধহয় হাতের চেটোর পাশা দিয়ে আঘাত করেছিল বিশুমামা, তাই ওই ইঁদুর-মুখো লোকটা চেঁচিয়ে ওঠার সুযোগ পেল না। গলা গিয়ে 'অক' করে একটা বিচিত্র শব্দ করে সে কাটা গাছের মতো উলটে পড়ে যাচ্ছিল, বিশুমামা খপ করে তার চুলের মুঠো ধরে তার পতন কিছুটা সামলে দিল, কিন্তু এক হাতে খাপে জড়ানো ছোরার বাণ্ডিল থাকায় পুরোপুরি পারল না। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাওয়ার শব্দ হল। এপাশে ফ্যাটির দেহটা নড়ে উঠল।

"পালা!" বলেই বিশুমামা দরজার দিকে ছুট লাগাল। কপাট খুলে অমল বেরোল টর্চ হাতে সকলের আগে। পিছনে বাড়ির মধ্যে একটা কোলাহল শোনা গেল। দ্রুত।

বাইরেটা ঠিক ঘুরঘুট্টি অন্ধকার নয়, বোধহয় বনের পারে দিগন্তে চাঁদ ছিল। সেই ভুতুড়ে আলোর আবছা একটা আভা উঠোনের অন্ধকারকে জ্যালজেলে করে রেখেছিল। ঝোপের মধ্যে লুকনো পথটা যেখান থেকে শুরু হয়েছে, নালার সেই জায়গাটা ওরা ক'দিন ধরেই লক্ষ্য করে রাখায় চিনতে অসুবিধে হল না। দৌড়ে গিয়ে এক এক লাফে ওরা নালা ডিঙোল। শব্দ হবে বলে ওরা জুতো পরে বেরোয়নি। কিন্তু এখন আর জুতো পরে নেওয়ার সময় নেই। নুড়ি, কাঁকর, কাঁটায় পা ক্ষত-বিক্ষত হলেও সেদিকে মন দেওয়ার সময় নেই।

বিশুমামা চাপা গলায় ধমক লাগাল, "টর্চ নেভা।"

কিন্তু বলার আগেই অমলের হাত থেকে টর্চটা ছিটকে পড়ল, অমলের মুখ দিয়ে একটা

আর্ত শব্দ বেরোল, "উঃ।"

লোকগুলো যে এত তাড়াতাড়ি জেগে উঠে পিছু ধাওয়া করবে, বিশুমামাও তা কল্পনা করতে পারেনি। প্রথমে ভেবেছিল গাছের মাচা থেকে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে। একটু পরেই সে ভুল ভাঙল। প্রথম গুলিটা স্রেফ কপালজোরে অমলের গায়ে না লেগে শুধু টর্চটাকে ছিটকে ফেলে দিয়েছিল। পরের গুলিটা মৃত্যুর শিস দিয়ে বিশুমামার কান ছুঁয়ে বেরিয়ে যেতেই সে অমল আর ফ্যাঙ্কে বগলদাবা করে শুঁড়ি পথ থেকে জঙ্গলের ভেতর ডাইভ খেয়ে পড়ল। ডালপালায় ঘষটে কোথায় কার ছড়ে গেল সে খেয়াল করার সময় কোথায়। ওপাশ থেকে এলোপাথাড়ি গুলি চলছে। বন্দুক আছে পিস্তল বা রিভলভারও আছে। ভোর রাতের নির্জনতা ছত্রখান করে হালকা-ভারী দু'রকমের আওয়াজ। গাছের উঁচু ডাল থেকে বোধহয় বাঁদর বা ওই জাতীয় কোনও গেছোপ্রাণী সচিৎকারে মাটিতে আছড়ে পড়ল। ভয়ে দিশেহারা হয়ে বোধহয় একপাল বুনো শুয়োর ঝোপঝাড় ফুঁড়ে রকেটের মতো বেরিয়ে গেল।

বিশুমামা চাপা গলায় বলল, "মাটি থেকে এক ইঞ্চি মাথা তুলবি না কেউ। একেবারে ডেডবডির মতো পড়ে থাক। ওরা এগিয়ে আসছে।"

অমল পাশেই ছিল। নিচু গলায় কানে-কানে বলল, "তোমার ক্যালকুলেশনে বোধহয় একটু..."

গায়ে আঙুলের খোঁচা দিয়ে বিশুমামা বলল, "চুপ!"

চুপ তো একেবারেই চুপ। এ-পক্ষ চুপ তো, ও-পক্ষও চুপ। বন্দুকের নলগুলো হঠাৎ নিঃশব্দ হয়ে যাওয়ার কারণটা সত্যিই দুর্বোধ্য। এটা কি নতুন কোনও চালাকির ফাঁদ? বন্দুক-বাজরা রণে ভঙ্গ দিয়ে ফিরে গেছে ভেবে যেই ওরা উঠে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করবে, অমনি শব্দভেদী বাণের মতো নির্ভুল লক্ষ্যে একঝাঁক গুলি এসে ওদের ঝাঁঝরা করে দেবে?

ভয়ে জোরে নিশ্বাস পর্যন্ত ফেলতে পারছিল না অমল। বিশুমামার শরীরের নড়াচড়া অমল টের পাচ্ছিল, তবে শব্দে নয়। হাতের ছোঁয়ায়। ঘুটঘুটে অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। তবে বিশুমামা বোধহয় ছায়ার মতো নিঃশব্দে হামা দিয়ে একটু এগিয়ে গেল, তারপর বুঝি উঠে দাঁড়াল। তারপর নিচু গলায় বলল, "না, ক্যালকুলেশনে কোনও ভুল হয়নি।"

জঙ্গলের ঝিঁঝির ডাক ফের শুরু হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তা ছাপিয়ে বাড়ির দিক থেকে কেমন হুটোপাটি আর কোলাহলের মিশ্র আওয়াজ কানে আসতে লাগল। আকাশ বোধহয় লাল হয়ে উঠেছিল ততক্ষণে। জঙ্গলের মধ্যেও তার আভা ছড়িয়ে পড়ল। তারপর ফটাস-ফটাস করে বাঁশের গাঁট ফাটার আওয়াজ আর পোড়া গন্ধ বাতাসে ভেসে এল।

"লেট আস গো!" বিশুমামা বলল, "এই আমাদের লাস্ট চান্স!"

কিন্তু গো বলা যত সহজ, যাওয়া তত সহজ নয়। চোখওয়ালা মানুষ দিনের আলোয় যেখানে পথ হারায়, চোখে রুমাল বেঁধে ছেড়ে দিলে যে দশা হয়, তাদের অবস্থা তাই। এই রাতে, এই অন্ধকারে, মাকড়সার জালের মতো এই লতাপাতার ঘেরাটোপের মধ্যে। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও

টর্চলাইটটা ফিরে পাওয়া গেল না। পথ হাতড়ে বললে যা বোঝায়, তাই। ওরা সেইভাবেই এগোচ্ছে! শুধু শব্দের কম্পাসই এখন তাদের ভরসা। বাজ পড়ার মতো থেকে থেকে দূরাগত গর্জনে মাটি কেঁপে উঠছে। ওই বিস্ফোরণের শব্দই এখন তাদের অবলম্বন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই শব্দের বিপরীত দিকে তাদের এগিয়ে যেতে হবে।

বিশুমামা একসময় বলল, "হল্ট। এবার বিশ্রাম। দিনের আলো ফোটার আগে আর আমরা এখান থেকে এগোচ্ছি না। শুধু খেয়াল রাখিস কোন মুখো আমরা চলছিলাম। দিকটা মনে রাখা জরুরি।"

ফ্যাঙ্ বলল, "আঙ্কল, ওদের স্টোর-রুমে নিশ্চয় হাতবোমা আর ডিনামাইট ছিল। আগুন থেকে সেভ করতে পারেনি। আহা, যদি শয়তানদের ধ্বংসস্তূপটা একবার দেখতে পেতাম।"

"হুঁ!" বিশুমামা বলল, "আমাদের বাংলা ভাষায় একেই বলে কারও পৌস মাস, কারও সর্বনাশ। অমল, প্রবচনটা ফ্যাঙ্কে বুঝিয়ে দে।"

শিয়রে সর্বনাশ নিয়েও মানুষ ঘুমোয়, শেষ রাত এমনই একটা সময়। ছেলের শোকে পাথর মা, আসন্ন ফাঁসির আসামী, মৃত্যুশয্যায় কাতরানো রোগী, কেউ বাদ যায় না। সম্পূর্ণ বেকায়দায় শুয়েও, বোলতার মতো হুল ফোটানো মশার কামড় অগ্রাহ্য করেও অমলরা অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

আসলে কাল দুপুর থেকেই ওদের ভেতরে ভয়ঙ্কর উত্তেজনা চলছিল। ঘরের ভেতর চুপিচুপি খড়ের দড়ি পাকাতে পাকাতে বিশুমামা বলেছিল, "রাতের খাওয়া সেরে ফেলার সময় তোরা আমাকে জাস্ট দশ সেকেন্ড সময় দিবি। মাত্র দশ সেকেন্ডের জন্যে যে-কোনও অজুহাতে ওই পুন্নিমের চাঁদটাকে আড়াল করে অমাবস্যা ভরে দিবি, ব্যস!"

ব্যস যে কী তা অমলরা জানে। দুপুরবেলা গুঁড়িয়ে মিহি করে রাখা সেই সাদা পাউডার লোকটার পান-পাত্রে ঢেলে দেবে বিশুমামা। একটু তফাতে একটা র‍্যাকের ওপর সামসুভর্তি জগটা রাখা থাকে। জগের ঢাকার ওপর কারুকাজ করা বাঁশের তৈরি গেলাসটা দাঁড় করানো থাকে। কিন্তু উলটো দিকের ঘরে তখন তিন-চারজন জঙ্গি চিনে বসে গল্পগুজব করে। জগের জায়গাটা ওখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। বিশুমামা সে ব্যাপারটা কী করে ম্যানেজ করবে জিজ্ঞেস করায় শুধু মুচকি হেসেছিল। বড়িগুলো একটা ছোট নুড়ি দিয়ে কাগজের ওপর গুঁড়ো করার সময় বিশুমামা জানিয়েছিল, "স্যাকারিনের মতো এই যে ছোট-ছোট বড়িগুলো দেখছিস, এর গুটি-আষ্টেকেই যে-কোনও জোয়ানকে চিরদিনের মতো ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া যায়। আমি মাত্র গুটি-চারেক দেব। আহা বেচারা ফ্যাটি, কতদিন ভাল করে ঘুমোয় না বল তো! মাঝরাত্তিরে দু-তিন গেলাস সামসু গিলেও হতভাগার চোখে আঠা ধরে না। আজ ঠিক ঘুমোবে দেখিস।"

বিশুমামার কথাবার্তা এইরকমই। বিপদের সময়েও ঠোঁটের কোণে ঠাট্টা লেগেই থাকে। আজকেও সবে হাই তুলে অমল উঠে বসেছে, হাতঘড়িতে সকাল সাতটা। সকালই নিশ্চয়, তবে রোদ ওঠেনি। চারপাশ ঝাপসা। আকাশে মেঘের ম্যারাপ বাঁধা চলেছে, যে-কোনও সময় বৃষ্টি নামতে

পারে। হাত-পা-মুখ লঙ্কা বাটার মতো জ্বলছে।

বিশুমামা রীতিমত গম্ভীর গলায় বলল, "ওহে ভাগনে, চমকে উঠো না, আমি তোমার মামা।"

বলে দেওয়া সত্ত্বেও অমল চমকাল। চমকাল বিশুমামার মুখের দিকে তাকিয়ে। চেনাই যাচ্ছে না। বোধহয় কয়েকশো মশার বিষাক্ত কামড়ে মুখের জিওগ্রাফিই বদলে গেছে বিশুমামার। আতঙ্কিত হয়ে নিজের মুখেও হাত বুলোল অমল। ইশ! এটা তার মুখ না সাঁত্রাগাছির ওল?

"ও আর দেখতে হবে না। নরানাং মাতুলক্রমঃ। নে, ঝটপট জুতোফুতো পরে নে। ঝাড়া হাত-পায়ে এবার লম্বা পাড়ি জমাতে হবে।"

তা লম্বা পাড়িই বটে। আর আনতাবড়িও বটে। ম্যাপ নেই, কম্পাস নেই, অবস্থান সম্পর্কে কোনও ধারণাও নেই। শুধু এগিয়ে যাওয়া, থেমে না থেকে এগিয়ে যাওয়া। তবে অন্ধের মতোই, এগোচ্ছে না পেছোচ্চে কে জানে। মালয়ের উত্তর-পূব বর্ডার তাদের আপাতত শেষ লক্ষ্য। সেখান থেকে বর্মায়। কিন্তু ডলার-ফলার সব গেছে ওই চিনে-দস্যুদের হাতে, পকেট শূন্য। গাঁ-গঞ্জ একটা পেয়ে গেলেও পয়সা খরচ করে ফলারের আশা নেই। শুধু গাঁয়ের মানুষের দয়া-ভিক্ষের ওপর নির্ভর করতে হবে। মালয়িরা, এমনকী সাকাইরাও কিঞ্চিৎ অতিথি বৎসল এই যা আশার কথা। ভদ্র চিনে পল্লী পেলেও ঠেকে থাকবে না। বিনিময় করার মতো কিছু সম্পত্তি অবশ্য এখনও তাদের হাতে। আংটিগুলো, ঘড়িগুলো। এগুলো তো দামিই। তবে সে পরের কথা পরে।

তবে এই হতাশার মধ্যেও একটা আশার আলো দেখতে পাওয়া গেছে। সেটাই মন্দের ভাল। এলোপাথাড়ি চলতে-চলতে আধ ঘণ্টার মধ্যেই তারা জঙ্গল ফুঁড়ে একটা খোলা রাস্তায় এসে পড়েছিল। কাঁকরমাটির এই শক্ত রাস্তাটা ফুট-আষ্টেক চওড়া হবে বড়জোর। কিন্তু এটা শিরদাঁড়ার মতো সোজা চলে গেছে বনভূমিকে দ্বিখণ্ডিত করে। রাস্তা পেয়ে যাবার পর বিশুমামা খুশি হয়ে বলেছিল, "এই রাস্তাটা বুঝতেই পারছিস মানুষের তৈরি, মানুষ চলাচল করার জন্যেই এটা বানিয়েছিল। সুতরাং এ থেকে একটাই সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পারি।" বলেই অমলের ঢোল-চালতে মুখের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞাসা ফোটাল।

অমল সাধু ভাষায় জবাব দিল যে, "অনতিবিলম্বেই আমরা কোনও জনবসতিতে পৌঁছব।"

"রাইট! অ্যাণ্ড লেফ্‌ট রাইট, বয়েজ! পা চালাও।"

কিন্তু অনতিবিলম্বে কথাটা যে শুধু ভুল নয় মরীচিকামাত্র, সে-কথা এই এখন বেশ বিলম্বেই টের পাওয়া যাচ্ছে। হাড়ে-হাড়ে। হাড়ে-মাসে বলাই ভাল। হাঁটতে-হাঁটতে পায়ের ডিম থাইয়ের মাস্‌ল টন টন করছে, জুতোর ভেতর ডালে কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত পা টাটিয়ে উঠেছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। বেলা এগারোটা নাগাদ পেটের উনুনে যে গনগনে আঁচ উঠেছিল, সেটা এখন মরে গিয়ে ছাই উড়ছে। শরীরে অবসাদ। সর্বাঙ্গ টলছে। ঘড়িতে প্রায় একটা বাজে। তার

মানে প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা তারা পায়ের ওপরেই। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বার-দুই জিরিয়ে নিয়েছে বটে, কিন্তু বিশুমামা বসতে দেয়নি। বলেছে, বসলেই শুতে ইচ্ছে করবে, আর হাঁটতে পারবি না।

কিন্তু আর বোধহয় হাঁটা সম্ভব নয়। এতক্ষণেও যখন একজন গাঁ-মনিষ্যির দেখা মিলল না তখন আর কিসের আশা! সারাটা পথ আসতে-আসতে অমল কেবলই দু'পাশের গাছপালার দিকে ফিরে-ফিরে নজর দিয়েছে, কিন্তু বৃথাই। এমন নিষ্ফলা বন কল্পনাই করা যায় না। গাছ, শুধুই গাছ। ফলহীন নিষ্ঠুর গাছ। বেশির ভাগই অচেনা, মাঝে-মধ্যে দু-চারটে শাল সেগুন শিমুল আছে। মালয়ে যে এত নারকেল গাছ, কিন্তু কোথায় সে-সব?

বিশুমামা বোধহয় তখনই বসার কথাই বলতে যাচ্ছিল দাঁড়িয়ে পড়ে, কিন্তু বলা হল না। আকাশ ভেঙে আচমকা হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামল। সে কী বৃষ্টি! দু-চার ফোঁটার আগাম নোটিস পর্যন্ত না দিয়ে মাথার ওপরে যেন টালার ট্যাঙ্ক ধসে পড়ল। কয়েক গজ ছুটে গিয়ে জঙ্গলের ভেতরে ছাতার মতো একটা ঝুপড়িমাথা গাছের তলায় দাঁড়াবার আগেই যতটা ভেজা সম্ভব ভিজে গেল। মনে হল জামাকাপড়সুদ্ধু বুঝি কোনও পুকুরে ডুব দিয়ে উঠে এসেছে। কিন্তু গাছ কিন্তু ছাতা নয়, তাই তার তলায় দাঁড়িয়েও কাকভেজা ভিজতে লাগল ওরা।

এক ঘণ্টা তুমুল নিশ্ছিদ্র বৃষ্টির পর হঠাৎই জল থেমে গেল। আর ঠিক তখনই অমলের নজর আটকে গেল সামান্য তফাতে একটা গাছের দিকে। প্রথমে ভেবেছিল গাছভর্তি বাতাবি লেবু ফলে আছে। বুকের ভেতরটা ধড়াক করে উঠেছিল আনন্দে। মনটা দমে গেল পরক্ষণেই, দূর থেকে অতিকায় কদম ফুলের মতো লাগে। বোধহয় কোনও কাঁটাঅলা বিষফল, ডুমুরের মতো বড়-বড় পাতা, কেমন সাদাটে-সবুজ।

আঙুল দিয়ে দেখাতেই বিশুমামা হতভম্ব, নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকল একটুক্ষণ, তার পরেই চেঁচিয়ে উঠল, "আরে! ও তো ডুরিয়ান। পুব-বাংলায় 'ডাউনা' বলে।"

"খায়?"

"খুব খায়। খুব ভাল খেতে। ঠিক কাঁঠালের মতো। মালয়ের বিখ্যাত ফল।"

দু-চার ঢোক বৃষ্টি-জল খেয়ে তেষ্টা মিটেছিল বটে, কিন্তু খিদেটা চাগাড় দিয়েছিল আবার। দুর্ভিক্ষের বুভুক্ষুর মতো ফ্যাঙ্ আর অমল পাল্লা দিয়ে ছুট লাগাল গাছতলার দিকে।

স্নানটা একটু বেশি মাত্রায়ই হয়ে গিয়েছিল, ফলারটাও মন্দ হয়নি। ভিজে জামাপ্যান্ট নিংড়ে গা-মাথা মুছে সেগুলো ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগের মধ্যে চালান করে দেওয়া হয়েছে। শুকনো আর এক-প্রস্থ শার্ট আর ট্রাউজার পরে এখন খানিকটা ঝরঝরে লাগছে। শুধু পায়ের জুতোজোড়া যদি ভিজে আমসত্ত্ব না হত তা হলে আরও আরাম পাওয়া যেত।

রাস্তার মাঝ-বরাবর দিয়ে নতুন উদ্যমে হাঁটছিল ওরা। দু'পাশের ঢালু জায়গা দিয়ে জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে দ্রুত গতিতে। ওরা চলেছে জলে ধারাকে উজিয়ে। তার মানে বোধহয় রাস্তাটা ক্রমশ চড়াইয়ের দিকে চলেছে। হয়তো সামনে কোনও পাহাড়ি অঞ্চল।

চলতে-চলতে অমল হঠাৎ খেয়াল করল ফ্যাঙ্ নেই, অথচ ঠিক তার হাত-দুই পিছনে-পিছনেই সে আসছিল। চোখে পড়ল ভিজে জামাকাপড়ের ব্যাগটা রাস্তার মাঝখানে পড়ে রয়েছে। বিশুমামাও দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ব্যাগটার দিকে ছুটে যেতে গিয়েই চোখে পড়ল বাঁকের মুখ হেলে-পড়া একটা গাছের ডাল ধরে ঝুঁকে ফ্যাঙ্ বোধহয় জল থেকে কিছু ধরবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ বর্ষায় কলকাতার পথঘাট ভেসে গেলে রাস্তার ছেলেরা যেভাবে চুনো মাছ ধরে। যাক্ তা হলে বিপদ-আপদ কিছু হয়নি!

পরক্ষণেই ফ্যাঙ্ কী একটা জিনিস হাতে নিয়ে উত্তেজিত ভাবে ছুটে এল। অমল দেখল সেটা মাছ নয়, সেলোফেনে মোড়া একটা সিগারেটের প্যাকেট। বিশুমামা হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিয়েই বলল "এ তো দেখছি জাপানি সিগারেট। সর্বনাশ আমরা বোধহয় ওদের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছি। অবশ্য বৃষ্টি শুরু হয়েছিল প্রায় দেড়-দু'ঘণ্টা আগে। জলের যা স্পিড তাতে কয়েক মাইল দূর থেকেও আসতে পারে!"

অমলও ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিল। টাটকা ভরা-প্যাকেট কেউ চলতে চলতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে এমন মনে হয় না। হয়তো লাফিয়ে নালাটা ডিঙোবার সময় হাত থেকে কিংবা পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল। জাপানিরা রাস্তা থেকে নালা ডিঙিয়ে ওপাশে গেছে না ওপাশ থেকে নালা ডিঙিয়ে রাস্তায় এসেছে সেটা জানতে পারলে অবস্থাটা অনেকখানি আন্দাজ করা যেত।

যাই হোক ফ্যাঙ্ একটা কাজের কাজ করেছে।

প্যাকেটটা বিশুমামা অন্যমনস্ক হয়ে খুলতে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ খেয়াল হল দেশলাই নেই। তাই ওটা পকেটে রেখে দিয়ে বলল, "চল। চুপচাপ চোখ-কান খোলা রেখে এগনো যাক।"

এখন পেছন ফেরার কোনও অর্থ হয় না, পিছনেও বিপদ সামনেও বিপদ। সব-সময় সামনে এগিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। বিশেষ করে জাপানি লাইন ফুঁড়ে বেরোতে পারলে বাকি পথটুকু নিরাপদ হওয়াই সম্ভব। ওরা তিনজনই যত দূর দেখতে পাচ্ছিল সতর্ক নজর রেখে এগোচ্ছিল। কিন্তু অনুমান সব-সময় অক্ষরে অক্ষরে মেলে না। শ'খানেক গজ এগোতেই হঠাৎ দু'পাশ থেকে জলপাই রঙের ইউনিফর্ম পরা ছ-সাতজন জাপানি-সোলজার নালা ডিঙিয়ে রাস্তার ওপর লাফিয়ে পড়ল। ঝোপের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে ওরা বোধহয় অমলদের জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

ভাল করে ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই ওরা বন্দুক উঁচিয়ে বৃত্তাকারে ঘিরে ফেলল অমলদের। ঘিরে ফেলল কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই আক্রমণ করল না। স্থির হয়ে, স্থির চোখে অমলরা তিন মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে কুস্তির পাঁয়তারা ভাঁজার কায়দায় ওই বেঁটে লোকগুলো সামনে ঝুঁকে আরও নিচু হয়ে একটু একটু করে কাছে আসতে লাগল। তিনজন নিরস্ত্র মানুষকে ঘিরে এক সশস্ত্র ব্যূহ, তবু তাদের এই অনাবশ্যক অতিমাত্রায় সতর্কতা আর ক্লাউন-ক্লাউন ভঙ্গি দেখে বিশুমামা আচমকা হা-হা করে হেসে উঠতেই সামনের লোকটা তার দাঁতমুখ আর বেয়নেটসুদ্ধ রাইফেল খিঁচিয়ে লাফিয়ে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা দুর্বোধ কোরাস চিৎকার, 'কিলি-কোলাক! কিলি-কোলাক!'

হতভম্ভ অমল সাবধান হওয়ার আগেই একজন ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর হাত থেকে দামি হাতঘড়িটা পাক্কা ছিনতাইবাজের মতো ব্যাণ্ডসমেত ছিঁড়ে নিল। কিন্তু সামলাতে পারল না।

বিশুমামার মোক্ষম ঘুসিটার জন্যে লোকটা তৈরি ছিল না, থ্যাতা মুখে হাতিতিনেক তফাতে ছিটকে পড়ল। বিশুমামার এই অপরিণামদর্শী দুঃসাহসে অমল হতভম্ব হয়ে গেল। রেগে গেলে ওর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না জানত, কিন্তু তা বলে এভাবে মৃত্যুকে কেউ ডেকে আনতে পারে ভাবা যায় না।

ফ্যাঙ্ হঠাৎ আর্তগলায় চেঁচিয়ে উঠল, "লুক্ ব্যাক!"

কিন্তু বিশুমামা পিছন ফিরে তাকাবার সময় পেল না, সামনেও তখন সাক্ষাৎ মৃত্যু, তার বুক লক্ষ্য করে বেয়নেট উঁচিয়ে সেই লোকটা ছুটে আসছিল কিন্তু তার আগেই পিছন থেকে কেউ বন্দুকের বাঁট দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করল মাথায়। প্রকাণ্ড একতালকাদার মতো বিশুমামা হাঁটুভেঙে থেবড়ে পড়ল মাটিতে। তার নিঃস্পন্দ দেহের ওপর টাল সামলাতে না পেরে সামনের লোকটা হুমড়ি খেল। বেয়নেট লাঙলের ফলার মতো বিঁধে গেল মাটিতে। চোখের পলকে ঘটে গেল এই ভয়ঙ্করনাটক। ব্যাপারটা কী ঘটল বুদ্ধি দিয়ে বোঝার আগেই কেউ বাজখাঁই গলায় হাঁক দিল, "মাত্তে! মাত্তে! স্তফ্!"

বিশুমামা বেঁচে আছে, কিন্তু তার জ্ঞান এখনও ফেরেনি। আঘাতটা বোধহয় মারাত্মক। সাদা শার্টটা লাল হয়ে ভিজে উঠেছে এখানে-ওখানে। কিন্তু তা দেখার সময় এবং উপায় নেই। গ্রুপ লিডার জাপানিটা বোধহয় কুল্যে তিনটে ইংরেজি শব্দ জানে। ইয়েস, নো আর স্টপ। সে দুর্বোধ্য ভাষায় কীসব জিজ্ঞেস করেছিল, অমল বুঝতে পারেনি, ফ্যাঙ্ হয়তো পেরেছে কিন্তু সে জবাব দেয়নি। না বোঝার ভান করেছে। কিন্তু লোকটা যে রেগে আগুন হয়েছে তা ওর চুন-হলুদ হয়ে ওঠা মুখ দেখেই বুঝতে পারা যায়। তার ক্রোধের যথেষ্ট কারণ ছিল।

বেয়নেট চার্জ করতে আসা লোকটার অবস্থা খুব খারাপ, মুখের দিকে তাকালে গা শিরশির করে। ডান ভুরুর ওপর থেকে খানিকটা মাংস আর চামড়া পাকা আমের খোসার মতো ঝুলে পড়ে চোখটা ঢেকে দিয়েছে। রক্তের ধারায় গোটা মুখটাই বীভৎস হয়ে উঠেছে। বোধহয় রাইফেলের কুঁদোর কিনারটা ওর কপাল ঘেঁষটে নেমেছিল। যেভাবে মুখ চেপে ধরে ও ক্রমাগত গোঙাচ্ছে তাতে মনে হয় ডান চোখটা ভাল রকম জখম হয়েছে। ওর রাইফেল আর পিঠের ব্যাগ এখন অন্য একটা লোক বইছে। আর-একজন ওকে ধরে-ধরে নিয়ে যাচ্ছে। যে নিয়ে যাচ্ছে তাকেই বোধহয় বিশুমামা ঘুসিটা মেরেছিল। ঠোঁটের পাশটা পটলের আকারে ফুলে উঠেছে। মাঝে-মাঝে মুখ ফিরিয়ে রক্ত-থুথু ফেলেছে। ওদের অফিসার টমিগানের নলটা তর্জনীর মতো তুলে গোটা দলটার তদারকি করতে করতে চলেছে। বিশুমামাকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার পড়েছে অমল, ফ্যাঙ্ আর-একটা সোলজারের ওপর। সে লোকটা পায়ের দিকটা ধরেছে, ফ্যাঙ কোমরের কাছটায়, আর অমল ঘাড়ের তলায় হাত দিয়ে মাথার দিকটায়।

ফ্যাঙের পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে-যেতে অফিসার জিজ্ঞেস করল, "ইকুৎসু দেসু কা?"

ফ্যাঙ্ উত্তর দিল না। লোকটা আবার বলল, "ওয়াকারি মাসুকা, কুদাশাই?"

ফ্যাঙ্ নিরুত্তর, শুধু পিটপিট করে তাকাল। লোকটা এগিয়ে যেতে অমল জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। ফ্যাঙ্ নিচু গলায় ভাঙা বাংলায় বলল, "আমাদের বয়স কত জিজ্ঞেস করল। আমি ওর

কথা বুঝতে পারছি কি না তাও জানতে চাইল। এখন মুখ বুজে থাকাই ভাল। আমাদের বোধহয় ওদের ক্যাম্পে নিয়ে যাচ্ছে। আর সেটা কাছেই কোথাও।"

অমল কথা বলল না। বুঝল বিপদ কাটেনি, বিপদ আসছে। বিশুমামার জন্যে বুকের ভেতরটা মোচড়াচ্ছে। কী হল ওর? ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে নির্ঘাত কথা বের করার জন্যে টর্চার করবে তারপর মিলিটারি বিচারে হয়তো শিরচ্ছেদের দণ্ড হবে! হায় রে জীবন। এত আশায় আশায় দৌড়োদৌড়ি, এত কষ্ট সব বৃথা। এভাবেই সব শেষ হবে জানলে কে আর সিঙ্গাপুর থেকে বেরোত! মা মাগো, তোমার সঙ্গে আর দেখা হল না। তুমি জানতেও পারলে না তোমার ছেলে কোথায়, কীভাবে—

প্রথমে ভেবেছিল কানে কোনও পোকা ঢুকেছে, কী-রকম বিনবিন শব্দ হচ্ছে। না। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অমলের চোখ কপালে ওঠার দশা। বিশুমামার মাথাটা হেলে আছে, ঠোঁট দুটো প্রায় অমলের কান ছুঁয়েছে।

"গেট রেডি, এই লাস্ট চান্স!" বিশুমামা মশার গলায় কথা বলল, "যা বলি শোন।"

নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছিল না। মনে হয়েছিল ভুল শুনছে, নিজের মনেরই বিভ্রান্তি। কিন্তু না, বিশুমামাই। বলছে ওর কিস্যু হয়নি, পুরোটাই ধোঁকা। বন্দুকের কুঁদো ওর মাথায় চোট দেবার আগেই বসে পড়েছিল। বিশুমামার প্ল্যানটা ছোট্ট, কিন্তু চোখের পলকে কাজটা সারতে হবে। ফ্যাঙ্‌কে ও বাংলায় ব্যাপারটা জানিয়ে দিল। বাংলাই নিরাপদ।

এক মিনিট কি দেড় মিনিট রুদ্ধশ্বাসে কাটল। অফিসার আবার সামনের দিক থেকে ফিরছিল। ফ্যাঙ্ বিশুমামার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটা বের করে তৈরি হয়েই ছিল, আঙুলের টুসকিতে ছুঁড়ে দিল। অমনি লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, "সাগাশাইত! সাগাশাইত।"

পিছনে পিছনে আসা জাপানি দুটো প্রায় একই সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে প্যাকেটটা কুড়োতে গেল আর ঠিক সেই মুহূর্তেই অ্যাকশন শুরু হয়ে গেল। অমলরা হঠাৎই যেন ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল। পায়ের দিকের লোকটা ব্যালান্স হারিয়ে যাবার মুখে বিশুমামার লাথি খেয়ে ছিটকে পড়ল। একটা ঝটকায় বিশুমামা অফিসারের হাত থেকে টমিগান ছিনিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। অমল আর ফ্যাঙ্ ডাইভ খেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সিগারেট কুড়নো লোক দুটোর ওপর।

পিছনে জাপানিদের ক্রুদ্ধ চিৎকার কখন ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেছে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ওরা যত দ্রুত সম্ভব ছুটছে। জমে থাকা জলে শব্দ হচ্ছে ছপ-ছপ, ছপ-ছপ। ওদের দুজনের হাতে দুটো রাইফেল। বাকিগুলো নালার খোলা জলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল আসার সময়। জঙ্গলই এখন সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। যত গভীরে ঢুকে পড়তে পারবে ততই নিশ্চিন্ত। প্রায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে ওরা দৌড়চ্ছিল। দু'পাশের ডালপাতার ছাপটি লাগছিল গায়ে-মুখে-মাথায়। পায়ে লতা জড়িয়ে অমল একবার আছাড় খেল মাটিতে। উঠেই আবার ছুট। একটা কথা বলারও সময় নেই, দমও নেই। চড়াইয়ের ধরন দেখে বোঝা যাছে ওরা পাহাড়ে উঠতে শুরু করেছে। বড়-বড় পাথরের চাঁই পাশ কাটিয়ে এগোতে হচ্ছে।

বিকেল নাগাদ ওরা পাহাড় ডিঙিয়ে ওপিঠে পেঁছে গেল।

ডিটেক্‌টিভ

সুকুমার রায়

জলধরের মামা পুলিশের চাকরি করেন, আর তার পিসেমশাই লেখেন ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। সেইজন্য জলধরের বিশ্বাস যে, চোর-ডাকাত, জাল-জুয়াচোর জব্দ করবার সবরকম সংকেত সে যেমন জানে, এমনটি তার মামা আর পিসেমশাই ছাড়া কেউ জানে না। কারও বাড়িতে চুরিটুরি হলে জলধর সকলের আগে সেখানে হাজির হয়। আর কে চুরি করল, কি করে চুরি হল, সে থাকলে অমন অবস্থায় কি করত এ-সব বিষয়ে খুব বিজ্ঞের মতো কথা বলতে থাকে। যোগেশবাবুর বাড়িতে যখন বাসন চুরি হল, তখন জলধর তাদের বলল, "আপনারা এইটুকু সাবধান হতে জানেন না—চুরি তো হবেই। দেখুন তো ভাঁড়ার ঘরের পাশেই অন্ধকার গলি, তার ওপর জানলার গরাদ নেই। একটু সেয়ানা লোক হলে এখান দিয়ে বাসন নিয়ে পালাতে কতক্ষণ? আমাদের বাড়িতে ও-সব হবার জো নেই। আমি রামদিনকে বলে রেখেছি, রোজ রাত্রে জানলার কাছে চাতালের উপর বাসনগুলো রেখে দিতে। চোরের বাছা যদি আসতে চান, জানলা খুলতে গেলেই বাসনপত্র সব ঝন্‌ঝন্‌ করে মাটিতে পড়বে। চোর জব্দ করতে হলে এ-সব কায়দা জানতে হয়।" সে সময়ে আমরা সকলেই জলধরের বুদ্ধির খুব প্রশংসা করেছিলাম, কিন্তু পরের দিন যখন শুনলাম সেই রাত্রেই জলধরদের বাড়িতে মস্ত চুরি হয়ে গেছে, তখন মনে হল আগের দিন অতটা প্রশংসা করা উচিত হয় নি!

জলধর কিন্তু তাতেও কিছুমাত্র দমে নি। সে বলল, "আমি যেরকম প্ল্যান করেছিলাম, তাতে চোর একবার বাড়িতে ঢুকলে তাকে আর পালাতে হত না কিন্তু ঐ আহাম্মক রামদিনটার বোকামিতে সব মাটি হয়ে গেল। যাক, আমার জিনিস চুরি করে তাকে আর হজম করতে হবে না। বাছাধন যেদিন আমার হাতে ধরা পড়বেন, সেদিন বুঝবেন ডিটেক্‌টিভ কাকে বলে। কিন্তু যাহোক চোরটা খুব সেয়ানা বলতে হবে। যোগেশবাবুদের বাড়িতে যেটা গেছিল সেটা আনাড়ির একশেষ। আমাদের বাড়িতে এলে সে ব্যাটা টের পেত।" কিন্তু দুমাস গেল, চারমাস গেল, ক্রমে প্রায় বছরও কেটে গেল, কিন্তু সে চোর আর ধরা পড়ল না।

চোরের উপদ্রবের কথা আমরা সবাই ভুলে গেছি, এমন সময়ে হঠাৎ আমাদের স্কুলে আবার চুরির হাঙ্গামা শুরু হল। ছেলেরা অনেকে টিফিন নিয়ে আসে, তা থেকে খাবার চুরি যেতে লাগল। প্রথম দিন রামপদর খাবার চুরি যায়। সে বেঞ্চির উপর খানিকটা রাবড়ি আর লুচি রেখে হাত ধুয়ে আসতে গেছে—এর মধ্যে কে এসে লুচিটুচি বেমালুম খেয়ে গিয়েছে। তার পর ক্রমে আরো দু-চারটি ছেলের খাবার চুরি হল। তখন আমরা জলধরকে বললাম, "কি হে ডিটেক্‌টিভ। এই বেলা যে তোমার চোরধরা বুদ্ধি খোলে না, তার মানেটা কি বল দেখি?" জলধর বলল, "আমি

কি আর বুদ্ধি খাটাচ্ছি না? সবুর কর-না।" তখন সে খুব সাবধানে আমাদের কানে কানে এ কথা জানিয়ে দিল যে স্কুলের যে নতুন ছোকরা বেয়ারা এসেছে তাকেই সে চোর বলে সন্দেহ করে, কারণ সে আসবার পর থেকেই চুরি আরম্ভ হয়েছে।

আমরা সবাই সেদিন থেকে তার উপর চোখ রাখতে শুরু করলাম। কিন্তু দুদিন না যেতেই আবার চুরি। পাগলা দাশু বেচারা বাড়ি থেকে মাংসের চপ এনে টিফিন ঘরের বেঞ্চের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল, কে এসে তার আধখানা খেয়ে বাকিটুকু ধুলোয় ফেলে নষ্ট করে দিয়েছে। পাগলা তখন রাগের চোটে চীৎকার করে, গাল দিয়ে ইস্কুলবাড়ি মাথায় করে তুলল। আমরা সবাই বললাম, "আরে চুপ চুপ, অত চেঁচাস নে। তা হলে চোর ধরা পড়বে কি করে?" কিন্তু পাগলা কি সে কথা শোনে? তখন জলধর তাকে বুঝিয়ে বলল, "আর দুদিন সবুর কর, ঐ নতুন ছোকরাটাকে আমি হাতে হাতে ধরিয়ে দিচ্ছি—এ-সমস্ত ওরই কারসাজি।" শুনে দাশু বলল, "তোমার যেমন বুদ্ধি। ওরা হল পশ্চিমা ব্রাহ্মণ, ওরা আবার মাংস খায় নাকি? দরোয়ানজিকে জিজ্ঞাসা কর তো?" সত্যিই তো! আমাদের তো সে খেয়াল হয় নি। ও ছোকরা তো কতদিন রুটি পাকিয়ে খায়, কই, একদিনও তো ওকে মাছ-মাংস খেতে দেখি না। দাশু পাগলা হোক আর যাই হোক, তার কথাটা সবাইকে মানতে হল।

জলধর কিন্তু অপ্রস্তুত হবার ছেলেই নয়। সে একগাল হেসে বলল, "আমি ইচ্ছে করে তোদের ভুল বুঝিয়েছিলাম। আরে, চোরকে না ধরা পর্যন্ত কি কিছু বলতে আছে—কোনো পাকা ডিটেক্‌টিভ ওরকম করে না। আমি মনে মনে যাকে চোর বলে ধরেছি, সে আমিই জানি।"

তার পর কদিন আমরা খুব হুঁশিয়ার ছিলাম; আট-দশ দিন আর চুরি হয় নি। তখন জলধর বললে, "তোমরা গোলমাল করেই তো, সব মাটি করলে। চোরটা টের পেয়ে গেল যে আমি তার পেছনে লেগেছি। আর কি সে চুরি করতে সাহস পায়? তবু, ভাগ্যিস তোমাদের কাছে আসল নামটা ফাঁস করি নি।" কিন্তু সেইদিনই আবার শোনা গেল স্বয়ং হেডমাস্টার মহাশয়ের ঘর থেকে তাঁর টিফিনের খাবার চুরি হয়ে গেছে। আমরা বললাম, "কই, হে? চোর না তোমার ভয়ে চুরি করতে পারছিল না? তার ভয় যে ঘুচে গেল দেখছি!"

তার পর দুদিন ধরে জলধরের মুখে আর হাসি দেখা গেল না। চোরের ভাবনা ভেবে ভেবে তার পড়াশুনা সব এমনি ঘুলিয়ে গেল যে পণ্ডিতমশায়ের ক্লাশে সে আরেকটু হলেই মার খেত আর কি! দুদিন পরে সে আমাদের সকলকে ডেকে একত্র করল আর বলল তার চোর ধরবার বন্দোবস্ত সব ঠিক হয়েছে। টিফিনের সময়ে সে একটা ঠোঙায় করে সরভাজা, লুচি আর আলুর দম রেখে চলে আসবে। তার পর কেউ যেন সেদিকে না যায়। ইস্কুলের বাইরে যে জিমন্যাস্টিকের ঘর আছে সেখান থেকে লুকিয়ে টিফিনের ঘরটা দেখা যায়। আমরা কয়েকজন বাড়ি যাবার ভান করে সেখানে থাকব। আর কয়েকজন থাকবে উঠোনের পশ্চিম কোণের ছোটো ঘরটাতে। সুতরাং চোর যেদিক থেকেই আসুক, টিফিন ঘরে ঢুকতে গেলেই তাকে দেখা যাবে।

সেদিন টিফিনের পর পর্যন্ত কারও আর পড়ায় মন বসে না। সবাই ভাবছে কতক্ষণে ছুটি

হবে আর চোর কতক্ষণে ধরা পড়বে। চোর ধরা পড়লে তাকে নিয়ে কি করা যাবে সে বিষয়েও কথাবার্তা হতে লাগল। মাস্টারমহাশয় বিরক্ত হয়ে ধমক দিতে লাগলেন, পরেশ আর বিশ্বনাথকে বেঞ্চির উপর দাঁড়াতে হল—কিন্তু সময়টা যেন কাটতেই চায় না! টিফিনের ছুটি হতেই জলধর তার খাবারের ঠোঙাটি টিফিন ঘরে রেখে এল। জলধর, আমি আর দশ-বারোজন উঠোনের কোণের ঘরে রইলাম আর একদল ছেলে বাইরে জিমন্যাস্টিকের ঘরে লুকিয়ে থাকল। জলধর বলল, "দেখ, চোরটা যেরকম সেয়ানা দেখছি আর তার যেরকম সাহস, তাকে মারধর করা ঠিক হবে না। লোকটা নিশ্চয়ই খুব ষণ্ডা হবে। আমি বলি সে যদি এদিকে আসে তা হলে সবাই মিলে তার গায়ে কালি ছিটিয়ে দেব আর চেঁচিয়ে উঠব। তা হলে দরোয়ান-টরোয়ান সব ছুটে আসবে। আর লোকটা পালাতে গেলেও ঐ কালির চিহ্ন দেখে ঠিক ধরা যাবে।" আমাদের রামপদ বলে উঠল, "কেন? সে যে খুব ষণ্ডা হবে তার মানে কি? সে তো কিছু রাক্ষসের মতো খায় বলে মনে হয় না। যা চুরি করে নিচ্ছে—সে তো কোনোদিনই খুব বেশি নয়।" জলধর বলল, "তুমিও যেমন পণ্ডিত! রাক্ষসের মতো খুব খানিকটা খেলেই বুঝি খুব ষণ্ডা হয়! তা হলে তো আমাদের শ্যামাদাসকেই সকলের চেয়ে ষণ্ডা বলতে হয়। সেদিন ঘোষেদের নেমন্তন্নে ওর খাওয়া দেখেছিলে তো! বাপু হে, আমি যা বলেছি তার ওপর ফোড়ন দিতে যেয়ো না; আর তোমার যদি নেহাত বেশি সাহস থাকে, তুমি গিয়ে চোরের সঙ্গে লড়াই কোরো। আমরা কেউ তাতে আপত্তি করব না। আমি জানি, এ-সমস্ত নেহাত যেমন-তেমন চোরের সাধ্য নয়—আমার খুব বিশ্বাস, যে লোকটা আমাদের বাড়িতে চুরি করেছিল, এ-সব তারই কাণ্ড।"

এমন সময়ে হটাৎ টিফিন ঘরের বাঁদিকের জানলাটা খানিকটা ফাঁক হয়ে গেল, যেন কেউ ভেতর থেকে ঠেলছে। তার পরেই সাদা মতন কি—একটা ঝুপ্ করে উঠোনের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। আমরা চেয়ে দেখলাম একটা মোটা হুলো বেড়াল, তার মুখে জলধরের সরভাজা! তখন যদি জলধরের মুখখানা দেখতে, সে এক বিঘৎ উঁচু হাঁ করে উঠোনের দিকে তাকিয়ে রইল। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, "কেমন হে ডিটেক্‌টিভ! ঐ ষণ্ডা চোরটাই তো তোমার বাড়িতে চুরি করেছিল? তা হলে এখন ওকেই পুলিসে দেই?"

সত্যের সন্ধানী

প্রীতি পাল চৌধুরী

পলটন সেই আগের মতো ছোটটি নেই। এখন আর বড়দের কাছে বায়না ধরে না গল্প বলার জন্য। ছোটবেলায় বাড়িতে কেউ এলেই পলটন তাকে চেপে ধরতো একটা গল্প বলার জন্যে, তবে যেমন তেমন গল্প পলটন মোটেই পছন্দ করতো না। ওর গল্পে ক্রাইম থাকা চাই. ডিসুম, ডিসুম না থাকলে আর কি গল্প? ভিলেন থাকতে হবে, তার লুকনো চুরনো সব-কার্যকলাপ থাকবে, ওকে ধরার জন্য পৃথিবী শুদ্ধ গোয়েন্দারা ফিলডে নামবে, কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠবে না। অবশেষে একটা ছোট্ট ভুলের জন্য আসামী ধরা পড়বে। ব্যস্ সঙ্গে সঙ্গে গল্পের যবনিকাও পড়বে। মোট কথা থ্রিল থাকতে হবে।

একসময় অবশ্য পলটন কি আজে বাজেই না গল্প শুনেছে। কেউ হয়তো পায়রার গল্প বলছে পলটনতো হাঁ করে শুনছে, যে বলছে তার হয়তো আর ইচ্ছে করছে না তাই বলত এখন চুপটি করে থাক। পায়রাদের ছাদে গম দেওয়া হয়েছে। ওরা এখন মনের সুখে খাচ্ছে। খাওয়া শেষ না হলে, গল্প শুরু করব কি করে? এখন আমাদের চুপটি করে বসেই থাকতে হবে, তার চেয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে নিতে পারি? কি বল পলটনবাবু? তাই না?

পলটন ওর বিস্ময়েভরা মুখটা তুলে বলত—তা পায়রাদের খাওয়া কখন শেষ হবে? আমাদের সঙ্গেই? আমাদেরতো বেশীক্ষণ সময় লাগে না?

পলটনের কথায় তার কি হাসি। বলে দূর বোকা ছেলে। গম খেতে অনেক সময় লাগে, উড়ে এসে ছাদে বসবে, মুখে নেবে, চিবাবে তারপর তো গিলবে তাই না? আবার মানুষের ভয়ও আছে, মানুষের সামনে ওরা খুব ভয়তে খেতে পারে না। উড়ে পালাবে। তাছাড়া ওরাতো আমাদের মতো গ্রো-গ্রাসে খায় না। একটা, একটা করে খায় বুঝেছ? কাজের অবসরে পলটন এইসব ছোটবেলার গল্প গুলো ভেবে বেশ মজা পায়, সত্যিই কি বোকাই না ছিল তখন। আর আজ ও নিজেই একজন গোয়েন্দা। কত মানুষ আসছে, যাচ্ছে কত সমস্যা নিয়ে। মাঝে মাঝে পলটন নিজেও হাঁপিয়ে ওঠে। ভাবে দূর এই সখের গোয়েন্দাগিরি করে কি লাভ? কি করে যে এই ভূত মাথায় চাপল তা কে জানে।

ক্লাশ নাইন থেকেই ওর মাথায় গোয়েন্দা হওয়ার ভূত চেপেছে। তবে এখন ও রীতিমতো যুবক। কত বাহবা, কত প্রশংসাই না পাচ্ছে সবার কাছ থেকে। সেই সব ঘটনা মনে পড়লে খুব হাসি পায়।

চুপচাপ কাঁচের ঘরে বসে ভাবছে পলটন, এটা ওর ডাক নাম। পোষাকী নাম একটা আছে কৌরব। এই নাম স্কুল কলেজের সার্টিফিকেটেই আছে। সবার কাছে পরিচিত ও পলটন বলেই। কিটু ওর ছোটবেলার বন্ধু। এই কিটুর তাড়াতেই না আজ ও গোয়েন্দা হয়েছে।

বেশ স্পষ্ট মনে আছে। গরমের ছুটি। কদিন ধরে বিকেলে কিটুই খেলার আসরে আসছে না। ভাবছি কি হল ওর। হঠাৎ দুপুর বেলায় কিটু এসে হাজির। মুখে চোখে দুশ্চিন্তার ছাপ। খুব গম্ভীর দেখাছিল ওকে। ওকে দেখে আমিতো আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললাম কিরে এতদিন কোথায় ছিলি বলতো ? কি হয়েছে ?

কিটু বিরস মুখে বলে বাড়িতে কারও চোখে ঘুম নেই, কি যে হয়েছে এই কয়দিন ধরে। আমাদের বাড়িতে ঢিল পড়ছে কি বলব। কে যে ফেলছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না। সেদিনতো এমন ঢিল মেরেছে যে ঠাকুমার সব আচারের শিশিগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। বড়িগুলোও গেছে। আসলে আচারের শিশিগুলো রোদে দেওয়া হয়েছিল আর সেগুলো মা ঘরে না তুলে ঠাকুর ঘরের সামনে যে খোলা বারান্দাটা আছে তাতে রেখে দিয়েছিল। ঠাকুমার খুব মন খারাপ হয়ে গেছে। কেউ রাতে বাথরুমে যেতে পর্যন্ত সাহস পাচ্ছে না, কি জানি কখন কার মাথায় পড়ে। আমার মন খারাপ হচ্ছে ওই ঢিলের চোটে আমার ঘরের জানলার কাঁচগুলো সব ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেছে। কি করি বলতো ?

পলটন সবশুনে গম্ভীর মুখে বলে-তোরা থানায় খবর দিয়েছিস ? তাছাড়া তোরা কেন রাত জেগে দেখিস না কে ঢিল মারছে ? তাহলে তো ধরতে পারিস, কে ছুঁড়ছে ?

কিটু বিজ্ঞের হাসি হেসে বলে-তুই কি বলছিস্ পলটন। ওরা ঢিল মারে আর আমরা বুঝি মনের সুখে ঘুমাই ? তা কি হতে পারে ? সারা রাত জেগেও ধরতে পারা যাচ্ছে না, কারা মারছে আর কেনই বা মারছে ?

পলটন গম্ভীর মুখে বলে তা ছোটকা কি বলছে ? তুইতো বলিস ছোটকা সব পারে তা ঢিল ছোড়া বন্ধ করতে পারছে না ? তার মানে তুই ··· ···

কিটু ছোটকার নামে কোন বাজে কথা সহ্য করতে পারে না। বলে ছোটকা কি এখানে আছে যে ধরবে ? ও থাকলে তো কথাই ছিল না। কারও সাহসই হতো না ঢিল ছোঁড়ার। ও বাড়িতে নেই তাই সব পেয়ে বসেছে। এখন শুধু ভাবছি ছোটকা কবে ফিরবে ? ও এলে বাঁচি, 'বাবা' মা ঠাকুমা সবাই খুব ভয়ে ভয়ে আছে। আর আমার বাবাতো খুব শান্ত তাই এইসব দেখে খুব রেগে যাচ্ছে। বলছে পাড়ায় কারও সঙ্গে শত্রুতা নেই কে ঢিল ছুঁড়ছে ? আমি কারও সাথেও থাকি না পাছেও থাকি না। জানিস পলটন আমি রাত জেগে দেখার চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না। চারিদিকতো অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না।

তা ঢিল পড়াটা কখন থেকে শুরু হয় বলতো ?

তা প্রায় রাত দেড়টার পর, পাড়ার লোকেরাও তেমন টের পায় না। আমরা বন্ধ ঘরে বসেই ভয়ে মরি।

কোন দিক দিয়ে ঢিলগুলো আসছে ? বলতে পারবি ?

—তা বোঝা যাচ্ছে না, তবে ঢিলগুলো খুব উঁচু থেকে পড়ছে না। তাহলে তো ছাদেই পড়ত, তাই না বল ? ওগুলো আমাদের ঘরের দরজায় এসে পড়ছে, নয়তো বারান্দায় পড়ছে, মনে হয় খুব কাছ থেকেই কেউ মারছে।

পলটন একগাল হেসে বলে সত্যিই তোদের পাড়ায় কত মজার, মজার ঘটনা ঘটে, আর আমাদের বাড়িটা দেখ-একটাও এখন মজার ঘটনা ঘটে না। সব সময় ডিসিপ্লিন মেনে চলার শিক্ষা। আমি যদি তোদের বাড়ীতে থাকতাম তাহলে কালপিটকে ধরতে একটুও অসুবিধে হতো না। আমি ওকে ধরতামই, তারপর দেখাতাম ওর ঢিল ছোঁড়ার মজা।

কিট্টু কাঁচুমাচু মুখ করে বলে এই পলটন যাবি আমাদের বাড়িতে। আমার মনে হচ্ছে তুই পারবি ? তোর কথাবার্তাগুলো ঠিক ফেলুদার মতো। কেমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করছিস, এসবতো গোয়েন্দারাই করে। তোকে না আমার এখন গোয়েন্দা, গোয়েন্দা মনে হচ্ছে। চল না।

পলটন কিট্টুর বাড়িতে গরমের ছুটিতে কয়দিন থাকবে বলে বাবা মাকে বোঝাল। বাড়িতেতো সবাই জানে কিট্টু আর পলটন খুব বন্ধু। পলটন আর কিট্টু এক ঘরে শোয়। কিট্টুর ঠাকুমা, মা, বাবা সবাই পলটনকে কাছে পেয়ে খুব খুশী। তবে ঠাকুমার সঙ্গে কথা হলেই সেই এক কথা আচার সব গেছে। এত সাধের আচার। ঠাকুমা ওকথা ভুলতে পারে না। আর থেকে, থেকেই বলে যদি ওই হতচ্ছাড়া শয়তানটাকে দেখতে পেতাম তাহলে ওর মুখে পাটকাঠি জ্বালিয়ে দিতাম। আমার অত সাধের ···

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে পলটন ফিসফিস করে বলে, এই কিট্টু সময় হয়ে গেছে তাই নারে। ঘড়িতে দেড়টা বাজে। কোথায় পড়ছে না তো ? তবে কি···

কিট্টু লাইট অফ্ করে দিয়ে বলে—আলোয় সেই বাবু ঢিল ছোঁড়ে না। অন্ধকার হওয়া চাই। একটু অপেক্ষা কর। টের পাবি।

পলটন ভারী গলায় বলে আমি টের পেতে চাইনা। ধরতে চাই। তোরা সব দরজা বন্ধ করে ঢিলের আওয়াজ শুনিস, কেন বেরিয়ে ধরতে পারিস না ? দাঁড়া আমাকে বের হতে দে। আমি চুপটি করে অন্ধকারের সাথে মিশে যাব, কেউ টেরটি পাবে না। তারপর সব নজর করব। এই কিট্টু আমাকে একটা হাই-পাওয়ারের টর্চ দেনা। খুব কাজে লাগবে।

কিট্টু অবাক গলায় বলে—তা টর্চ দিয়ে কি করবি শুনি ? টর্চের আলোয় পথঘাট দেখা যায়—তা বলে কালপিটকে ধরা যায় না। তাছাড়া পকেটে অতগুলো নুড়ি নিয়েই বা যাচ্ছিস্ কেন ?

দেখ কিট্টু সব, ব্যাপারে প্রশ্ন করিসনাতো। আগে দেখ কি করা হয় তারপর বলবি। এখন চুপ করে থাক্। আমি যখন এসে তোর ঘরে দরজায় নক্ করব তখন খুলে দিস কিন্তু।

কিট্টু চাপা গলায় বলে তা এখন তুই কোথায় যাচ্ছিস্ বল না ?

না এখন আমি কিছু বলবো না। শুধু পরীক্ষা করে দেখব যদি মিলে যায় তাহলেতো সবই জানতে পারবি।

পলটন সোজা উঠে গেল ছাদে। চারিদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। কিটুদের বাড়ির পেছন দিকটা ফাঁকা, অনেকের জায়গা কেনা আছে, তবে এখনও বাড়ি হয় নি। কিন্তু সামনের দিকটায় যে বাড়িটা আছে সেটা দোতলা। এই বাড়িটাও খুব অদ্ভুত ধরনের, মুখোমুখি বাড়ি হয়েও বাড়িটার একটা অংশ পিছনে ঠেকানো। এই পিছনের অংশটার মধ্যে পড়ছে একটা বাথরুম, বাথরুমটা একেবারে কর্ণারে। বাথরুমে জানলাটার কোন পাল্লা নেই, একটা পর্দা ঝোলানো।

পলটন প্রকৃতির আলোতেই টের পায় বাথরুমে কেউ আছে। হ্যাঁ যা ভেবেছিল ঠিক তাই। ছায়া মূর্ত্তিটা একটা ঢিল তাক করছে কিটুদের বাড়ির দিকেই, হাতটা বাড়াতেই পলটন টর্চের আলো ফেলে ওই ছায়ামূর্ত্তির মুখে চোখে, ব্যস্ ছায়ামূর্ত্তির হাতের ঢিল হাতেই রয়ে গেল, চোখে তীব্র আলো পড়ায় চোখ খুলে চাইতে পারছে না, তার আগেই পলটন আজ বিকালে কুড়িয়ে আনা সাদা নুড়িগুলো খান কতক ছুঁড়ল। ছায়ামূর্তির মাথার কাছে গিয়ে লাগল। ওই গভীর অন্ধকারে কেউ কাউকেই দেখতে পেল না। তবে কিটুদের বাড়িতে ঢিল আর পড়ল না। পলটন অনেকক্ষণ চুপ করে দাড়িয়ে রইল। না কোন ঢিলের আওয়াজ নেই। তবে কি মাথা ফেটে গেল নাকি, নিজের মনেই পলটন হেসে বলে—কি বাবা বাছাধন ? ঢিল মারলে পাটকেল খেতে হয়। এবার বোঝ কত ধানে কত চাল।

কখন যে পিছনে কিটু এসে দাঁড়িয়েছে তা পলটন টেরই পায়নি। কিটু বলে কিরে এত কি ভাবছিস্ বলতো এই লোড্‌শেডিং এ ?

পলটন হাসিতে ফেটে পরে বলে ভাবছিলাম কি করে গোয়েন্দা হলাম। মনে আছে সেই তোদের বাড়িতে ঢিল পড়ার গল্প। কি করে ধরলাম বলতো ?

কিটু হাসিতে যোগ দিয়ে বলে—মনে নেই আবার, ওই আমাদের পাশের বাড়ির গ্যাঁচোর কাজ। ওইতো রোজ বাথরুমে জানলা দিয়ে আমাদের ঘরের দরজায় ঢিল ছুঁড়ত। তোর নুড়ির ঘায়েই তো সব ফাঁস হল। পরের দিন গ্যাঁচোর মাথা কপালে ব্যাণ্ডেস্। আসলে গ্যাঁচোর সঙ্গে ছোটকার একটা হিচ্ ছিল। ওরা দুইজনে ভিন্ন পার্টির ছিল। ছোটকা বাড়ি নেই, এই মওকায় গ্যাঁচোর মনের আনন্দে হাতের টিপ প্যাকট্রিস করছিল। জানিস্ পলটন সেদিন থেকেই আমি ভাবছিলাম তুই আর আমি মিলে একটা গোয়েন্দার অফিস খুলব। তারপর দুইজনে মিলে সত্যের সন্ধান করে বেড়াব। সেই থেকে শুরু তাই না ?

পলটন একটু উদাস দৃষ্টিতে বলে—তবে আমরা কিন্তু আমাদের কথা রেখেছি। দেখ আজ পর্যন্ত কোন কেস ঘুষ দিয়েও আমাদের মুখ বন্ধ করতে পারে নি। আমরা হচ্ছি সত্যের সন্ধানী, শুধু একবারই ফেঁসে গিয়েছিলাম। মনে আছে কিটু ? উঃ কিভাবে যে আমরা উদ্ধার পেয়েছিলাম, তা ভাবলে এখন শরীর মন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। তুই তো ওদের চালটাই ধরতে পারিস নি। আর একটুর জন্যে নির্দোষ মানুষটাকেই জেলের ঘানি ঘোরাতে হত। পাকা অভিনেতা ছিল ওই ঝুনঝুনিওয়ালা। চেহারা দেখলে মনে হয় সদাশিব। ভাজা মাছটা উলটে খেতে জানে না। মুখে খালি জয় রাম, জয় রাম। কে বলবে লোকটা এতবড় স্মাগলার দিনের বেলায় সাধন ভজন।

আর রাত্রে মুখোসহীন এক চিতা। জ্বলজ্বলে চোখের দৃষ্টি, ঠোঁটে হায়নার হাসি, রাতের লোভীর চেহারাটির সঙ্গে দিনের চেহারাটা খুঁজে পাওয়া যায় না। কি মাইডিয়ার ব্যবহার, মনে আছে?

কিট্টু টেবিল চাপড়ে বলে মনে নেই। কেমন গলায় রুদ্রাক্ষের মালা জপতে, জপতে এসেছিল। দেখলে মনে হয় নিপাট ভালমানুষ। চোখে মুখে ভীরু, ভীরু ভাব। কাচুমাচু মুখ করে বলেছিল—এটা কি সত্যের সন্ধানী। আমি পলটন বাবুর সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমার বড় বিপদ। আপনারা বাঁচাতে না পারলে আমার জীবন বিপন্ন। মনে আছে সেদিন একটা বর্ষার সন্ধ্যা ছিল। সারাক্ষণ ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। আমি ওকে বসতে বললাম। তুই কিন্তু ওর দিকে খুব তাকাচ্ছিলি। আমি তোকে দেখিয়ে বললাম এই হচ্ছে মিষ্টার পলটনবাবু? আপনি একে সব বলতে পারেন।

তুই ওর দিকে গভীর দৃষ্টি নিয়ে বলেছিলি—বলুন কি সমস্যা আপনার? আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি খুব ভয় পেয়েছেন? নিজের জীবনের ভয় তাই না…

এই কথায় মিঃ ঝুনঝুনিওয়ালা চমকে বলেছিল, ঠিকই ধরেছেন আপনি। আমি প্রাণের ভয়েই দিন কাটাচ্ছি, রাতের ঘুমটাও কেড়ে নিয়েছে—ওই শয়তানেরা। দেখুন আমি রাজনীতি সমাজনীতি এইসব বুঝি না। আমার কাছে হল রাম নাম। সাধনভজন করেই জীবনটা কাটাচ্ছি। তাতেও মানুষের সহ্য হয় না, পেছনে লাগে, অপবাদ ছড়ায়। এই বয়সে কি এইসব সহ্য হয়? পাগলা কুকুরের মতো পেছনে লেগে আসছে ওই ফচ্‌কে ছেলেটা। দিনরাত হুমকি দিচ্ছে, খুন করবে বলে, গাদা, গাদা উড়ো চিঠি আছে, জানেন বাড়িতে টিঁকতে পারছি না। মনপ্রাণ দিয়ে রামনামও জপতে পারছি না। রাতের পর রাত জেগে থাকি, এই কখন কি হয়—।

—তা আপনি থানায় খবর দেননি কেন? ওরা তো স্টেপ নিতে পারতো? আপনি কেন থানায় যাননি?

—যাব কি ভরসায়। কার নামে বলবো? আমি থানায় ডাইরী করলেই কি শাস্তি হবে? ওর যে দাদা মামারা সব বসে আছে। আমি খুন হলেও খবরটা অন্যভাবে পরিবেশন হবে। সত্যটা কি প্রকাশ পাবে? তাইতো সত্য প্রকাশ করবার জন্যই আমি সত্য সন্ধানীর কাছে কাছে এসেছি।

—আপনার মনে এই ধরনের চিন্তা কিসের থেকে এল? কে সেই শয়তান? উড়ো চিঠি বা কোথায়? আপনার কাকে সন্দেহ হচ্ছে? আমাকে সব ডিটেলস বলুন।

কথার ফাঁকে কিট্টু তাকায় পলটনের দিকে, কিট্টুর চোখের তারায় কৌতূহলের ঝিলিক, অদম্য কৌতূহল?

ঝুনঝুনিওয়ালা এদিক-ওদিক তাকায় বারকয়েক, তারপর ফিসফিস গলায় বলে, বলতে ভয় করছে। দেওয়ালেরও কান আছে। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় কে জানে? তবুও বলছি একটা ফচ্‌কে ছেলে। যার নাক টিপলে এখনও দুধ বেরোয়। তার সাহস কত? দেখুন আপনারা টাকার জন্য ভাববেন না। যত তাড়াতাড়ি পারেন এটার ব্যবস্থা করুন। ওর জন্য আমার সাধন-

ভজনের খুবই অসুবিধে হচ্ছে। এই বলে ঝুনঝুনওয়ালা কয়েকটা লালকালিতে লেখা চিঠি এগিয়ে দেয়। বলে পড়ে দেখুন কি সব মারাত্মক, মারাত্মক কথা লেখা।

—তা এই চিঠিগুলো রেখে যান। আপনি ছেলেটার সম্পর্কে কোন বিশেষণ দিতে পারবেন? মানে বিশেষ কিছু, যাতে চিনতে বা বুঝতে অসুবিধা হবে না? আপনি কি চেনেন তাকে?

ঝুনঝুনওয়ালা বিস্ময়ভরা, মুখটা তুলে হায় রাম বলে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে আমি চিনলে কি আর চুপ করে থাকি, কানটি ধরে—উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়তাম। ঠাহর করতে পারছি না দলের মধ্যে মধ্যে কোনটি? একই বয়সের সবতো, তবে মনে হয় ওটি দলের পাণ্ডা। তাই আপনি একটু চেষ্টা করলেই ওদের নাড়ি-নক্ষত্র সব জেনে যাবেন। আসল কথা কি কান টানলেই মাথা আসবে। রোজ রোজ চাঁদার ঝুলুম, কাঁহাতক পারা যায় বলুন, ঠাকুর দেবতার নামে হয় চাঁদা একবার কেন একশবার দেব, কিন্তু পার্টি ফাণ্ডে, স্ফূর্তি করার জন্য দেব কেন? ধর্মেই আছে অপাত্রে কখনও দান করবে না, তাহলে আমারই নরক বাস হবে। না, না এটা পাপ কাজ। কি বলেন আপনি? এই বলে সেদিনের মত বিদায় নেয় ঝুনঝুনওয়ালা।

কিট্টু পলটনের দিকে তাকিয়ে বলে—কিরে তুই এত সীরিয়াস্ হয়ে যাচ্ছিস কেন? ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে তাই নারে? লোকটা ধার্মিক, তবে মনে হচ্ছে লোকটা কালপিটকে চেনে, কিন্তু ভয়ে নাম ধাম বলতে চাইছে না। তাই তোকে দিয়েই যাচাই করতে চায়।

পলটন উড়ো চিঠিগুলো দেখে বলে—দেখ চিঠিগুলোও একই লোকের লেখা। তবে ভদ্রলোককে খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছে। কাল তুই একটু খোঁজ খবর নে। তারপর দেখতে হবে।

কিট্টু খোঁজ নেয়। এসে বলে পলটনকে ছেলেটির নাম রামহরি। তবে পার্টি করে। জোর জুলুম করে চাঁদা আদায় করে। এটা সিওর। পরণে খদ্দর, কাঁধে ঝোলা, দেখলে কিন্তু মনে হয় না ছেলেটি এ্যাণ্টি সোস্যাল। তবে ওর একটা গ্রুপ আছে।

কয়দিন পর হঠাৎ একটা উড়ো চিঠি আসে। 'সত্য সন্ধানীর' ঠিকানায়। "খুব সাবধান, আগুন নিয়ে খেলবেন না।"

পলটন চিঠি পড়ে থামে আর বলে দেখেছিস্ কিট্টু ছেলেটার সাহস আছে। কেমন বিজ্ঞের মতো লিখেছে। তাহলে আজই চল অভিযানে বের হই। একটু রাত করেই বের হব। ওর ঠেকটা কোথায় তাতো জানিস্। তবে মিঃ ঝুনঝুনওয়ালাকে কোন কিছু না বলাই ভাল বেচারাকে সঙ্গে নিলে হয়তো হার্টফেল করে ফেলবে? এমনিতেই মরণভয়ে একেবারে গুটিয়ে আছে।

রাত গভীর হয়। পলটন আর কিট্টু নিজেদের পোষাকের আড়ালে অপরিচিত করে তোলে। ওরা হচ্ছে যেখানে যেমন। সাধুর জায়গায় সাধুর ড্রেস, শয়তানের জায়গায় শয়তানের ড্রেস। আজ ওরা মস্তানের ড্রেসেই বের হল। এখন ওদের দেখলে যে কেউ ভাববে ওরা এ্যাণ্টিসোস্যাল। ওরা খুব সন্তর্পনে এগোয়।

একটা ঝুপরির কাছে এসে দাঁড়ায়। একটা মালগাড়ির আড়ালে এই ঝুপরিটা। টিমটিমে

একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। ভেতরে একটা ফিসফিস আওয়াজ। কিট্টু পলটনের হাতে মৃদু চিমটি কেটে বলে—টের পাছিস্, একেবারে হাতে নাতে।

পলটন মৃদু স্বরে বলে—এখন নয় আগে ওদের আসতে দে। দেখি কি করে? তাছাড়া আমরা তো নিরস্ত্র নই। ওরা চুপটি করে অপেক্ষা করেছ ঝুপরির এক পাশে।

ভেতরে কে যেন বলে—আজ মাইরি কিছু করবো, অত কমে এর রিস্ক নেওয়া যায়? সে জামানা চলে গেছে। মন পোষানো মজুরি না পেলে কি লাভ? ও শালা লেনদেনে বড় কঞ্জুস। ওয়ান পাইস ফাদার মাদার, টের পাওয়া যায় বোতল ঢালার শব্দে। হা-হা, হিঃ হিঃ হাসি। আবার অন্য গলা শোনা যায়—আরে মালতো এল না। কি হল? এত লেট্?

ছোড় দো ইয়ার। সংকেত পেলেই বের হব। এখন মাল খা।

পলটন কিট্টু দুইজনেই স্ট্যাচু হয়ে আছে। পলটন ইশারায় চুপ, শুনে যা। দেখি শেষটা, সবতো হাতের মধ্যেই আছে।

ঘড়িতে রাত দুটো। ঝুপরির ভেতর থেকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা। হঠাৎ একটা কালো এ্যামবাসডার এসে থামল। সুটেট বুটেট একটা লোক বেরিয়ে এল। পলটন তীক্ষ্নদৃষ্টি দিয়ে দেখার চেষ্টা করে লোকটাকে। মাথায় কপাল পর্যন্ত নামানো একটা টুপি। একটা ঢিলে বাধা কাগজ ছোঁড়ে ঝুপরির দিকে। আসলে ওটা হচ্ছে সংকেত, ঝুপরির জানলা দিয়ে ওটা ওদের কাছে গিয়ে পড়বে। তা আর হল না, পলটন ওটা লুফে নিল। আবার অপেক্ষা লোকটা গিয়ে গাড়িতে বসল।

মিনিট পাঁচেক কাটার পর লোকটা গাড়িতে একটা হর্ন বাজায়। সঙ্গে সঙ্গে দস্যুর মতো দেখতে তিনটে লোক বেরিয়ে আসে। বোঝা যাচ্ছে ওরা নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। তবে ওরা গাড়িটার কাছে যায়। লোকটার দিকে হাত বাড়ায় একটা প্যাকেট। পলটন লাইটার জ্বেলে গাড়ির নাম্বারটা টুকে নেয়। গাড়ির ভেতর থেকে শুধু একটা কথা বেরিয়ে আসে ও. কে। গাড়িটা বেরিয়ে যায়।

ঠিক সেই সময় একদল ছেলে এগিয়ে আসে। ওরা তাড়া করে ওই তিন মাতালকে। ছেলের দল পলটন আর কিট্টুকে দেখতে পায় না। ওরা অলক্ষ্যে সব দেখতে থাকে। ছেলের মধ্যে একজন দৌড়ে গিয়ে ধরে একটাকে বলে এই মাল ছাড়। তা নাহলে—।

এই কথায়—তিন মাতাল চেঁচিয়ে বলে—কি কেরে তোরা? মাল ছাড়। ফট্। কচ্‌কচ্ করিস না। এই ভোঁদা বার করতো শালাদের দিই তেরটা বাজিয়ে। রোয়াব দেখাছে। মাল ছাড় আরে, এই মালে সংসার চালাই, তা কে বাবা তোমরা নবাবপুত্তুর। ভালোয় ভালোয় কেটে পড় নইলে—

দলের মধ্যে একটি ছেলে মুখে কিছু না বলে পকেট থেকে পিস্তল বার করে বলে—ছাড় বলছি, নইলে এখনই—

তিন মাতাল তো ভয়ে কাৎ। বলে চালাবেন না। আমাদের ধরে কি লাভ? আমরাতো

শুধু অর্ডার কেরিআউট করি। এই যেমন করছি, সবতো পেটের জ্বালায়। আমাদের মেরে—

কঠোর গলায় ছেলেটি বলে, আগে মালটা দে। তারপর সব কথা। দিনে সাধু আর রাতে শয়তান। দে বলছি, নইলে তিনটেকেই—

দস্যুর মতো দেখতে তিনটের মধ্যে একটা বলে ওঠে দিতে পারি আমাদের হিসসাটা দিয়ে দাও। আধাআধি ভাগ কর। সবটা নিজেরা খাবে তা কি করে হয়। আমাদের ওতে পেট চালাতে হবে।

ছেলেটা ধমকে বলে চুপ কর শয়তান, আমরা তোদের মতো মুখোশ এঁটে শয়তানী করি না। অন্যের খাবার কেড়ে খাই না। কেন তোরা ভাল হতে পারিস না? পারিস না এই শয়তানগুলোর হাত থেকে খাবার ছিনিয়ে যাদের প্রয়োজন তাদের দিতে? কেন এইভাবে দিনের পর দিন সবার চোখে ধুলো দিয়ে অন্যায় করে যাস্? এ আমি কিছুতেই হতে দেব না।

এতক্ষণ ধরে পলটন আর কিটু ওদের কথা শুনছিল। এবার পলটন হাতের পিস্তলটা নিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়ায়। ছেলেটার ঠিক কানের কাছে মুখটা নিয়ে বলে আপনার পরিচয়। সমাজ সেবক না নিজের সেবক?

তিন দস্যুতো পলটনের হাতে পিস্তল দেখে প্যাকেটা ফেলে দে ছুট। ওরা দুইজনের হাতে পিস্তল দেখে খুবই ভয় পেয়ে যায় আর দাঁড়ায় না। পড়িমরি করে দৌড়ে পড়ে।

ছেলেটি পলটনের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। দূরে দাঁড়িয়ে থাকা দলের দিকে হাত উঁচু করে কি যেন ইসারা করে। আসলে বলতে চায় তোমরা এখন চুপ করে থাকে। প্রয়োজন হলে ইঙ্গিত করব। সেই ভারী গলায় ছেলেটি বলে আপনার পরিচয়?

আগে আপনারটা দিন। তারপর আমারটা না হয় দেব।

তাছাড়া আমার পরিচয় এতক্ষণে নিশ্চয়ই পেয়ে গেছেন? আমার বদনাম আমি দেশদ্রোহী দেশকে ভালবাসি না। অন্যায় করি। কারণ আমিই সত্যিকারে দেশকে ভালবাসি মানে মানুষকে ভালবাসি। আর যারা দেশকে ভালবাসার নামে নামাবলী গায়ে দিয়ে রাতের অন্ধকারে নিজের আখের গোছায় তাদের শাস্তি হয় না। আর আপনারাতো সত্যের সন্ধানী? তাই না? তাহলে চিনতে ভুল হয়নি তাই না বলুন? আর আমি হলাম সেই ফচকে শয়তান। রাখহরি? সব খোঁজ খবরতো নিয়েই এসেছেন তাই না?

কিটু এতক্ষণে পলটনের দিকে তাকিয়ে বলে, কিরে মনে পড়েছে সব কিছু? তার পরদিন কেমন ভাবে ঝুনঝুওয়ালাকে ধরা হল বল? তুইতো স্পটে গিয়েই সব ধরতে পেরেছিলি তাই না?

পলটন একটু হেসে বলে কি করে ধরে ছিলাম জানিস। ঢিল বাধা কাগজটা দেখে? তারসাথে ঝুনঝুনওয়ালার হাঁটাটা দেখে। মনে আছে লোকটা যখন এখানে আসত তখনও বাঁ পাটা টেনে টেনে হাঁটত। ওকে আমি গাড়ি থেকে ঠিক ওইভাবে নামতে দেখেই চমকে উঠি। তারপর টর্চের আলোয় ওর ঢিলবাঁধা কাগজটা খুলেই চমকে উঠি। আরে এযে সেই উড়ো চিঠির লেখক। একই হাতের লেখা। আসলে ঝুনঝুনওয়ালা নিজেই নিজের নামে চিঠিগুলো লিখত আর অন্য

জায়গা থেকে পোষ্ট করত। তাছাড়া ও ছেলেটাকে জানত, মানে ওর আসলরূপ ওদের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিল। যারজন্য ও চাইছিল ওই ছেলেটাকে কোনমতে হাজতে পাঠাতে। তাহলেও নিশ্চিন্ত মনে সব স্মাগলিং চালিয়ে যেতে পারত। মনে মনে ছেলেটাকে খুব ভয় পেত। তবে একটা মজার ব্যাপারও ছিল। ওই ছেলেটার বাইরের রূপটা ভাল ছিল না। সবাই জানত ও হুমকি দিয়ে বড়লোকের কাছ থেকে টাকা আদায় করে। পার্টি করে। পুলিশ মহলেও ওর পরিচয় হচ্ছে এ্যাণ্টিসোস্যাল। কিন্তু দেখলিতো ছেলেটির আসলরূপ। ও নিজের জন্য কিছুই করে না। গরীব দুঃখীদের টাকা পয়সা বিলিয়ে দেয়, একটা অনাথ আশ্রম চালায়, শিশুদের একটা স্কুল চালায়। ওর এই গুণগুলো প্রকাশ পেত না। সবার চোখে ও ছিল আসামী, জুলুমবাজ, অপরাধী, এই সুযোগটা নিয়েই ওই ঝুনঝুনওয়ালা আমাদের কাছে এসেছিল। কিন্তু ও ব্যাটা বুঝতে পারেনি যে আমরা হচ্ছি সত্যের সন্ধানী। তাই সত্য যাচাই করতে গিয়ে নিজেই হাতে হাতকড়া পড়ল। কথা শেষ করে পলটন আর কিটু হো করে হাসিতে ফেটে পড়ে আর লোডশেডিং আলো নিভিয়ে দেয়।

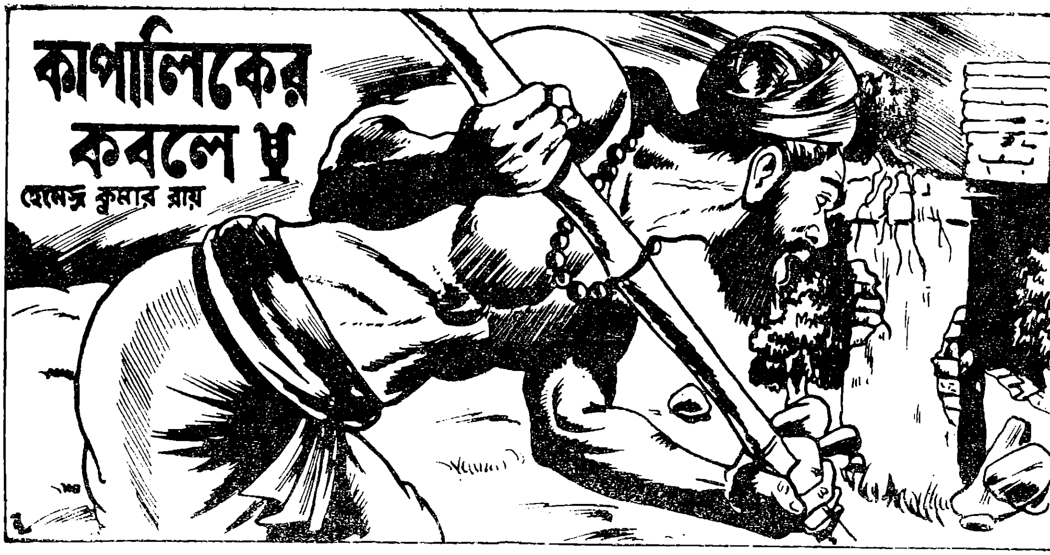

সেদিন সকালবেলা।

প্রখ্যাত রহস্য-সন্ধানী জয়ন্ত আর মাণিক বসে বসে সেদিনের খবরের কাগজ পড়ছিল। প্রতিদিনের খবরের কাগজ একান্তভাবে মন দিয়ে পাঠ করা জয়ন্তর দীর্ঘ দিনের অভ্যাস। তাছাড়া তেমন কোনও প্রয়োজনীয় খবর দেখলে সে সেই অংশটুকু কেটে আটকে রেখে দেয় তার সংগ্রহের খাতায়।

দুজনে কাগজের বিভিন্ন পাতা তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফেলল। জয়ন্ত বললে,—দূর, সেই সব একঘেয়ে খবর—কে ডাণ্ডা মেরে কার মাথা ফাটাল, কে ছোরা দেখিয়ে টাকা নিয়ে পালাল। এ সব ত' অতি সাধারণ কেস। কিন্তু তেমন জটিল বা জবরদস্ত কেস একটাও চোখে পড়ছে না।

এমন সময় বাইরের বারান্দায় ভারী পায়ের শব্দ শুনে জয়ন্ত বললে—মাণিক, সুন্দরবাবু আসছেন। হরিকে, বল চা ও প্রাতঃরাশের ব্যবস্থা করতে।

মাণিক উঠে গেল ভেতরে। একটু পরেই সুন্দরবাবুর প্রবেশ। ভারী কণ্ঠে বললেন—কি হে জয়ন্ত, শরীর ভাল ত ?

জয়ন্ত হেসে বললে—আমার শরীর ত' চট্ করে খারাপ হবার নয়, তা ত' জানেন। তবিয়ৎ ঠিক রাখার জন্য সাধনা করতে হয়। যখন কাজ থাকে না তখন দেহের তোয়াজি করি।

সুন্দরবাবু হেসে বললেন—সে ত জানি ভায়া। তা একটা বিশেষ কাজে তোমার কাছে আসতে হলো।

জয়ন্ত জানে পুলিশ অফিসার সুন্দরবাবু বিশেষ কাজ ছাড়া তার কাছে আসেন না। তাই সে হেসে বলল—কাজ ছাড়া যে আপনি আসেন না তা ত' জানি !

সুন্দরবাবু শুধু বললেন—হুম !

এমন সময় মাণিকের সঙ্গে হরি প্রবেশ করল ঘরে প্রাতঃরাশ নিয়ে।

জয়ন্ত সেদিকে চেয়ে বলল—নিন সুন্দরবাবু, শুরু করুন। আজকের প্রাতঃরাশ খুব সামান্য মাত্র। ডিমের পোচ, চিকেন-স্যাণ্ডউইচ, ব্রেড বাটার, মর্টন চপ আর কফি।

সুন্দরবাবুর চোখদুটি সেদিকে পড়েই আনন্দে একেবারে দপ করে জ্বলে উঠল। জয়ন্ত আর মাণিক দুজনে যা খেল তিনি একাই তার দ্বিগুণের বেশি উদরসাৎ করলেন। গোটা ছয়েক পোচ্, ছ'পিস ব্রেড্ বাটার, ছ'খানা স্যাণ্ডউইচ আর চারটি মর্টন চপ খেয়ে পর পর দু'কাপ কফি পান করলেন সুন্দরবাবু। তারপর একটা ঢেঁকুর তুলে বললেন—হুম ! এবারে আমার বক্তব্যটা শোন জয়ন্ত।

জয়ন্ত আর মাণিকের প্রাতঃরাশ ও কফি পান আগেই শেষ হয়েছিল ! মাণিক চিরদিনই সুন্দরবাবুর সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা করতে অভ্যস্ত ! তাই সে বলল—আপনার সব চিন্তাগুলো ঐ খাবারের স্তূপে চাপা পড়ে যায়নি ত সুন্দরবাবু ?

সুন্দরবাবু বললেন—থামো ত' ডেপো ছোকরা ! খাবার গেলো পেটে আর চিন্তা আছে মগজে। খাবার কি করে চিন্তাকে চাপা দেবে শুনি ?

—তা বটে, তা বটে—বলে মাণিক হাসল একটু।

সুন্দরবাবু বললেন—ঘটনাটা হলো—পলাশপুরের জমিদাররা তিন পুরুষ ধরে কোলকাতায় বাস করেন। অবশ্য জমিদারী এখন নেই, তবে জোতদারী দেশে আছে। আর কোলকাতায় আছে ব্যবসা-বাণিজ্য। মোটামুটি তাই দিন ভালই কাটে। জমিদারের একমাত্র পুত্র গত তিন দিন হলো নিখোঁজ। তিনি আবার এক এম-এল-এর বন্ধু। ফলে মিনিষ্ট্রি মহল থেকে চাপ এসে পড়েছে। আমাদের ত নাভিশ্বাস উঠেছে ! কি যে করি, তার ঠিক নেই। চাকরি রাখা দায়। ঐ ব্যাপারে যদি কোনও সাহায্য পাই, সেই আশায়—

—এ খবরটা ত' কাগজে কাল পড়েছি।

—হ্যাঁ।

—তা ছেলেটার বয়স কত হবে ?

—বয়স আর কত হবে ? বর্তমান জমিদারের বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ। তার তিন মেয়ের পর এক ছেলে। সবার ছোট একমাত্র ছেলে ! তাই আদর খুব। বয়স বছর ছয় হবে।

—এটুকু ছেলে অদৃশ্য হল কি করে ? আশ্চর্য ঘটনা তাতে সন্দেহ নেই।

এঁদের বিরাট দোতলা বাড়ি শোভাবাজার অঞ্চলে। তবে বাড়ির পিছন অর্থাৎ খিড়কির দিকেও একটা দরজা ছিল। ঐ দরজা দিয়ে পেছনের গলিতে যাওয়া যায়। সামনে দারোয়ান থাকে। সে খোকাকে বের হতে দেখেনি—অথচ বেলা একটা থেকে তিনটের মধ্যে ছেলে উধাও।

জয়ন্ত বললে—ছেলে প্রধানতঃ তিনটি কারণে উধাও হয় সুন্দরবাবু। প্রথমে হলো, তাদের ধরে চোখ কানা, হাত ভাঙ্গা ইত্যাদি করে পরে জিভ কেটে ভিক্ষে করানো হয়। এ দল পৃথক দল।

এরা অনেক ছেলে এমনি পোষে। এক একটা ছেলে রোজ দশ বারো টাকা করে উপার্জন করে, অথচ তারা মাত্র দু টাকার মতো খেতে পায়। এটা বলে ভিখিরি ব্যবসা। তাই অনেক বুদ্ধিমান লোক ছোট্ট ছেলে-ভিখিরিদের পয়সা দেয় না।

দ্বিতীয় কারণ হলো, ছেলে চুরি করে মোটা টাকা মুক্তিপণ দাবী করা। বিদেশে এটা বেশি হয়। এদেশেও হয়। পৃথিবীর বিখ্যাত সেই লিণ্ডেনবার্গ হত্যারহস্যও সেই মুক্তিমূল্য আদায়ের জন্য শিশু-চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ঘটেছিল।

শিশু চুরির তৃতীয় কারণ হলো, শিশুদের ধরে নিয়ে গিয়ে বিদেশে বিক্রি করা হয়। সাধারণতঃ মেয়েদের ধরেই এভাবে বিদেশে বিক্রি করা হয়। অনেক পুরুষদেরও তা করা হয়—তবে তাদের ক্রেতা বেশি মেলে না, তাই এ সন্দেহ থেকে এ ঘটনাকে বাদ দেওয়া যায়। যাই হোক, কে বা কারা কি উদ্দেশ্যে এই চুরি করেছে তা যদি খুঁজে বের করতে হয়, তা হলে সবার আগে অকুস্থলে যাওয়া কর্তব্য। তাই নয় কি?

—তা বটে। বললেন সুন্দরবাবু। তাহলে চল, আমরা সেখান থেকে ঘুরে আসি।

—জয়ন্ত বললে—সুন্দরবাবু কি এর আগে সেখানে গিয়েছিলেন নাকি?

সুন্দরবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—হুম! তা গিয়েছিলাম বটে। তবে কোন সূত্র দেখতে পাইনি।

জয়ন্ত বললে—আমরাও যে সূত্র পাব তেমন কোন কথা নেই। তবে চলুন দেখা যাক কতদূর কি হয়। মাণিক, তুমি ভাই দীপাকে নিয়ে এসো।

সুন্দরবাবু বললেন—দীপা আবার কে? মেয়ে-গোয়েন্দা নাকি?

জয়ন্ত হেসে বললে—এক হিসাবে তা বলতে পারেন। দীপা হলো একটি মেয়ে কুকুর। বিমলবাবুর বাঘার মতো এরও ঘ্রাণশক্তি খুব তীব্র। তার উপরে নিয়মিত ট্রেনিং নিতে হচ্ছে একে। আশা করি কোনও একদিন নিশ্চয় এ সফল হবে হয়তো বিরাট কোন একটা তদন্তে।

সুন্দরবাবু বললেন—দেখা যাক, চল। এবার আমরা শোভাবাজারের দিকে যাত্রা করি।

ততক্ষণে মাণিক দীপাকে নিয়ে এসেছিল। তার বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বললো শোভাবাজারের দিকে।

দুই

শোভাবাজারের রাজবাড়ি দোতলা হলেও আকারে তা বিরাট, দুটি তলা মিলিয়ে বাইশ-খানা ঘর।

বোঝা যায়, এককালে এঁরা বিরাট ধনী ছিলেন। বর্তমানে সেই অর্থের গৌরব না থাকলেও অবশ্য দারিদ্রের মধ্যে যে এরা এসে পড়েন নি, তা বোঝা যায়।

বর্তমানে যিনি স্টেটের মালিক সেই বীরেন্দ্রনারায়ণ এসে সুন্দরবাবুকে অভ্যর্থনা করলেন।

জয়ন্ত বা মাণিককে তিনি চেনেন না—যেহেতু তাদের গায়ে কোন রকম ইউনিফর্ম ছিল না।

সুন্দরবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন সবার সঙ্গে। পরিচয় পেয়ে বীরেন্দ্রনারায়ণ খুশি হলেন।

যে ঘরে বসে কথা হচ্ছিল তার সামনে দেখা গেল বিরাট একটা চিত্র। চারপাশে এই বংশের পূর্বপুরুষদের চিত্র—কিন্তু সামনে একটা বিরাট সন্ন্যাসীর চিত্র কেন? সন্ন্যাসীটি কে?

জয়ন্তের কথাটা মনে হলো। সে বললে—বীরেনবাবু, আমি কয়েকটা প্রশ্ন করব আপনাকে! আশা করি সঠিক উত্তর দেবেন।

—নিশ্চয়ই। আমার ছেলে অদৃশ্য হবার পর থেকে আমার স্ত্রী প্রায় অজ্ঞান। যদি সত্বর তাকে খুঁজে বের করতে না পারেন, তবে তার জীবনও সংশয় হবে।

—বুঝেছি।

—তা এবার বলুন কি জানতে চান।

—আপনার ছেলে কবে অদৃশ্য হয়?

—পরশু দিন বেলা প্রায় দুটো নাগাদ।

—সে কোথায় ছিল?

—সে তার ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। আমার স্ত্রী নানা সাংসারিক কাজে ব্যস্ত ছিল। প্রায় বেলা বারোটা নাগাদ আমি তাকে দেখে অফিসে যাই তারপর বাড়ীর সামনে দিয়ে সে বের হয়নি। পিছনের দরজা—মানে খিড়কির দরজা খোলা দেখা যায়। তাতে মনে হয় ঐ পথ দিয়ে বের হয়েছিল। বেলা প্রায় একটা নাগাদ আমার স্ত্রীর দাসী তাকে ঘরে দেখেছিল! তারপরেই বেলা তিনটেতে এসে তাকে দেখতে পায়নি!

—ঠিক আছে। এবার বলুন ত—কাউকে সন্দেহ হয়।

—না, সন্দেহ কাউকে হয় না। কারণ আমার বংশের মধ্যে আমি একমাত্র সন্তান। আর ছেলে নরেন্দ্র হলো আমার একমাত্র পুত্র-সন্তান তাই উত্তরাধিকার ব্যাপারে—

—আচ্ছা, আপনার ঘরে ঐ বিরাট যে ছবিটি আছে ওটা কার ছবি? গলায় রুদ্রাক্ষ মালা—তেজস্বী পুরুষ—

—উনি আমাদের গুরুদেব। উনি তান্ত্রিক, বিরাট সন্ন্যাসী। তবে বর্তমানে জীবিত নেই। তাঁর প্রধান শিষ্য আছেন—আমাদের গুরু-দাদা। তিনি থাকেন ও সাধনা করেন পলাশ-পুরের শ্মশানে। তিনিও তন্ত্র-সাধনা করেন।

—আচ্ছা কেউ কখনো আপনাকে ভয় দেখিয়ে চিঠি লেখে?

—কি রকম?

—যেমন, এত টাকা চাই—না হলে ক্ষতি হবে—

—না, না। টাকা যে বর্তমানে আমাদের বিশেষ নেই, তা সকলেই জানে। তাই এটা নিরর্থক প্রশ্ন জয়ন্তবাবু।

—আচ্ছা, আপনার গুরুদেবের প্রধান শিষ্য কি এখানে কখনো এসেছেন ?

—বলেন কি ? আমার ছেলে নরেন্দ্র অদৃশ্য হবার মাত্র দুদিন আগেও তিনি আসেন। তিনি নরেন্দ্রকে একটি মূল্যবান মালা উপহার দেন। রুদ্রাক্ষ মালা। সেটা ড্রয়ারে আছে। সেখানা একবার দেখবেন কি ?

—নিশ্চয়।

বীরেন্দ্রনারায়ণ তক্ষুনি উঠে গিয়ে মালাটা এনে জয়ন্তর হাতে দিলেন।

সুন্দরবাবু ঠাট্টা করে বললেন—জয়ন্ত, তুমি কি শেষে মালা জপ করতে শুরু করে দেবে নাকি ?

জয়ন্ত বললে—না না, তা নয়,—দেখুন—না।

জয়ন্ত মালাটা দীপার নাকের কাছে ধরল। দীপা দু' একবার সেটা শুঁকে শব্দ করল—গ র্ র র…

জয়ন্ত বীরেনবাবুকে বললে—আচ্ছা আপনাদের খিড়কীর দরজাটা একবার দেখাতে পারেন ?

নিশ্চয়ই, আসুন আমার সঙ্গে।

জয়ন্ত সদলে খিড়কীর দরজাতে গিয়ে দাঁড়াল। দীপা একমনে সেখানকার মাটি শুঁকতে লাগল।

জয়ন্ত বললে বীরেনবাবু, এদিকে লোকজন ত, বিশেষ আসে না তাই না ?

—ঠিক বলেছেন জয়ন্তবাবু।

এদিকে দীপা মাটি শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে চলছিল। তাকে বাধা দিল জয়ন্ত। চেন টেনে ধরল। দীপা জোরে জোরে চীৎকার করে উঠল—ভৌ ঔ ঔ…

তিন

জয়ন্ত ফিরে এলো তার বাড়িতে। সঙ্গে সুন্দরবাবু ছিলেন।

জয়ন্ত বললে—সুন্দরবাবু, কেসটা খুব খারাপ বলে মনে হচ্ছে আমার।

—কেন ?

—কারণ হলো, ছেলে চুরি সম্পর্কে যে তিনটি বিষয়ের কথা আমি আগে বলেছিলাম, তার সঙ্গে এটি মিলছে না মোটেই।

সুন্দরবাবু বললেন—হুম্! তাহলে ব্যাপারটা কি বল ত' ?

—দীপার মালা শোঁকা থেকে বুঝতে পারেন নি ?

—কিছুটা আন্দাজ করেছি ভায়া। মনে হয় ঐ মালাটা যে দিয়েচে, তার গায়ের গন্ধ দীপা মালাতে পেয়েছে। আর ঐ খিড়কির দরজাতে সেই গন্ধের রেশ পেয়েছে পায়ের ছাপে।

তার মানে—

—মানে যে তান্ত্রিক গুরুভাই মালাটা দিয়েছিল, সেই সেদিন লুকিয়ে খিড়কিতে এসেছিল।

সুন্দরবাবু বললেন—হুম! তাহলে ঐ তান্ত্রিক গুরুভাইটিরই ছেলেটি চুরি করা সম্ভব। কিন্তু তাতে তার লাভ কি?

—লাভ বিরাট। সেটা পার্থিব লাভ নয়—বলা যেতে পারে পরমার্থিক লাভের একটা কুসংস্কারপূর্ণ-ধারণা।

—সেটা কি রকম?

—অনেক তান্ত্রিক, কাপালিক প্রভৃতি ভূত-প্রেত বা তাল-বেতালে সিদ্ধ হয় জানেন ত? এই সিদ্ধি তারা সত্যি লাভ করে কি করে না তা বলা কঠিন। তাদের সিদ্ধিলাভটা যে তপ দ্বারা বা অন্য কোন পথে হয়, তাও সঠিক বলা চলে না। তবু আজও সে ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেক তান্ত্রিক, কাপালিক প্রভৃতিরা নরবলি দেয়। তবে কেউ স্বেচ্ছায় নিজের ছেলেকে বলি দেয় না। তাই তারা অনেক সময়ই ভাল সুলক্ষণযুক্ত নিখুঁত ছেলে পেলে তাদের চুরি করে।

সুন্দরবাবু বললেন—সর্বনাশ তাহলে কি এতক্ষণে তাকে বলি দেওয়া হয়ে গেছে?

—আমার মনে হয়, তা হয়নি।

—সেটা তুমি কি করে বলছ?

জয়ন্ত বললেন—দেখুন সুন্দরবাবু, অনুমান বলে একটা কথা আথে জানেন ত'। যদি গোয়েন্দার অনুমানশক্তি প্রখর না হয়, তবে সে সফলতা ভাল করতে পারে না। বুঝলেন?

—সেটা আমি মানি। তা ব্যাপারটা কি বল ত, জয়ন্ত! কি করে তুমি বলছ যে নরেন্দ্র এখনো বেঁচে আছে?

—দেখুন এই সব কাপালিকরা সাধনা করে অমাবস্যায়। কারণ অমাবস্যাতে না হলে সিদ্ধিলাভ হয় না। তা ছাড়া কতকগুলি বিশেষ অমাবস্যা আছে। যেমন এ মাসে হচ্ছে ভাদ্র মাসের অমাবস্যা। এটি বিশেষ ধরণের অমাবস্যা—কারণ এই ভাদ্র মাসের অমাবস্যা প্রেত-সাধনা, বেতাল-সাধনা ইত্যাদির পক্ষে প্রশস্ত। আর তাই ঠিক অমাবস্যার আগে চুরিটা হয়েছে।

জয়ন্ত একটিপ নস্যি নিয়ে মৃদু হাসল।

সুন্দরবাবু বললেন—তাহলে ভায়া তোমার মতে আগামী মঙ্গলবার মানে পরশু যে অমাবস্যা—

সুন্দরবাবু বাংলা ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে বললেন।

জয়ন্ত বললে—হ্যাঁ—ঐ দিন সন্ধ্যার পর আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ঐ দিন রাতে পলাশপুরের শ্মশানে হানা দিলেই আমরা সফল হবো।

—কিন্তু কোথায় যে এই সব পূজা, সাধনা প্রভৃতি করবে, তা জানা যাবে কি করে?

—অতি সহজে। দীপা তার পায়ের ও গায়ের গন্ধ চেনে। সে ঠিক খুঁজে বের করবে।

সুন্দরবাবু আমাদের সঙ্গে বলেন উঠলেন—ভেরী গুড্—ভেরী গুড্—ব্যাটাকে ঠিক বাগে

পাওয়া গেছে। তবে সে কি এ কাজ প্রথম করছে না আগেও করেছে ?

তা আমি বলতে পারব না। এই সব তান্ত্রিকরা যে শতাধিক নরবলি দেয় এমন ঘটনাও জানা গেছে।

—অমাবস্যা অভিযানের জন্য রেডি হতে পারি ?

—নিশ্চয়। আর ঐ সময়ের আগে পলাশপুরের ও. সি. কে একটা তার করে দিন বা ফোনে জানিয়ে দিন যে আমরা অভিযানে বের হবো এবং সেখানে যাব। তবে বিস্তারিত কিছু জানাবেন না।

—ঠিক আছে।

সুন্দরবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

চার

অমাবস্যার গভীর রাত। সারা বিশ্ব-প্রকৃতি যেন থম্ থম্ করছে। আকাশে কালো মেঘ। চাঁদ নেই—তারাটা পর্যন্ত মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে।

এমনি ভয়াবহ রাতে পলাশপুরের শ্মশানটা যেন আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এত রাতে লোকজন কেউ পথে বের হয় না। আর শ্মশানের দিকে ত' ভয়ে কেউ আসেই না এমন রাতে। কারো বাড়িতে রাতে কেউ মারা গেলে, পরদিন সকালে তাকে শ্মশানে আনা হয়। রাতে আসতে কেউ সাহস পায় না।

এমনি রাতে শ্মশানের কালীমন্দিরের থেকে কিছু দূরে একটা নির্জন অংশে বসে সাধনা করছিল একজন কাপালিক।

তার গলায় হাতে রুদ্রাক্ষের মালা। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। পরণে টকটকে লাল একটা কাপড়।

তার সামনে একটা ভয়াবহ মহাভৈরবের মূর্তি। মূর্তিটা পাঁচটি মড়ার খুলির উপরে রাখা। তার সামনে আর একটা বড় মড়ার খুলি। তার কপালে সিঁদুর লাগানো। মাঝে মাঝে সে একটা মড়ার খুলির পাত্র থেকে কারণ পান করছে। চোখ দুটো তার টক্‌টকে্ লাল।

তার পাশে একটা মৃতদেহ পড়ে আছে। বোধহয় শ্মশান থেকে মৃতদেহটা টেনে এনেছে। অন্য পাশে একটা পায়রা, একটা মুরগী, একটা কালো পাঁঠা বাঁধা। তার পাশে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আছে একটা ছেলে। তার দুটি চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠেছে। মাঝে মাঝে সে 'মা মা' বলে কাঁদছে।

এত রাত্রে এই নির্জন শ্মশানে যে কেউ আসবে না, এ বিষয়ে কাপালিক নিশ্চিন্ত। তাই সে ঐ শিশুর কান্না নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। তার সামনে একটা আগুন জ্বলছে। মাঝে মাঝে সে আগুনে ফুল, বেলপাতা, ঘি প্রভৃতি আহুতি দিচ্ছে আর উচ্চস্বরে কি সব মন্ত্রপাঠ করে চলেছে।

অবশেষে এক সময় মন্ত্রপাঠ শেষ হলো। কাপালিক উঠে গিয়ে পায়রাটা টেনে নিল। তার ডানার বাঁধন কেটে দিল। তারপর মন্ত্র পড়ে তার পাশে রাখা খাঁড়াটা দিয়ে এক কোপে তার মাথাটা কেটে ফেলল। কাটা মাথাটা সে ফেলে দিল আগুনের মধ্যে। তারপর ওই পায়রার রক্ত কয়েক ফোঁটা সে ফেলে দিল পাশের মড়াটার মুখে।

তারপর আরও কিছুক্ষণ মন্ত্র পড়ে সে মুরগীটাও টেনে নিল। ততক্ষণে আগুনে পায়রার মাথাটা পুড়ে গেছে। এবার ঐ একই ভাবে এক কোপে মুরগীটাকে কেটে ফেলল। তার মাথাটাও সে ঐ জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র পড়ে কিছুটা মুরগীর রক্ত ঢেলে দিল মড়াটার মুখে।

এইসব ভয়ানক কাণ্ড দেখে বসে থাকা বালকটি ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। সে তাঁর বাঁধন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করল। তবে বাঁধন খুলতে পারল না সে। তখন সে উচ্চকণ্ঠে 'মা মা' বলে কাঁদতে লাগল। কিন্তু সে করুণ কান্নাতেও কাপালিকের হৃদয় এতটুকু গললো না। যথারীতি মুরগী বলির পর টেনে নিল পাঁঠাটা।

কিন্তু ঠিক এমনি সময়ে ঘটে গেল একটা অঘটন। এমন একটা ঘটনার জন্যে কাপালিক তৈরী ছিল না। সে চেয়ে দেখতে পেলো তার সামনে টর্চ হাতে দুজন লোক। তার পেছনে আরও আরও চারজন লোক। সামনে একটা কুকুর মাটি শুঁকতে শুঁকতে আসছে।

কাপালিক চমকে উঠল।

দুজনের হাতে পিস্তল—দুজনের হাতে বন্দুক। তারা হলো জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ, জয়ন্ত, সুন্দরবাবু, মাণিক, থানার ও.সি. আর একজন কনষ্টেবল।

বীরেন্দ্রনারায়ণ সবার পিছনে ছিল। তাই কাপালিক অন্ধকারে তাকে দেখতে পায়নি।

ও. সি. এগিয়ে গিয়ে বললে—মাথার উপর হাত তোল। নরবলি দিতে চেষ্টা করার অপরাধে তোমাকে এ্যারেষ্ট করলাম।

কাপালিক হুঙ্কার দিয়ে উঠল—শয়তানের দল, আমার পবিত্র সাধনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে এসেছিস।

বলে সে খাঁড়াটা হাতে তুলে নিল। নিয়েই হুঙ্কার দিয়ে উঠল সে। এমন সময় জয়ন্ত এগিয়ে গেল। তার পিস্তলের একটা গুলি কাপালিকের পায়ে লাগতেই সে পড়ে গেল।

জয়ন্ত বললে—পুলিশের সঙ্গে লড়াই করতে যেয়ো না—মারা পড়বে।

এমন সময় এগিয়ে এলেন বীরেনবাবু। ততক্ষণে ও. সি গিয়ে নরেন্দ্রর হাতে পায়ের বাঁধন কেটে দিয়েছিল। বীরেন্দ্রবাবু ছেলেকে বুকে তুলে নিলেন। নরেন্দ্র কাঁদতে লাগল।

বীরেনবাবু কাপালিককে বললেন—ছি, ছি, তুমি কিনা আমার গুরুভাই হয়ে আমার ছেলেকে নরবলি দিতে গিয়েছিলে! আমাদের গুরুদেব এমন শিক্ষা কখনো দেননি। তিনি জপ, তপ, পুজোর পথে যেতে বলেছেন। তুমি কি মনে কর খুব সহজেই সিদ্ধিলাভ করবে এই সব করে? তুমি নরাধম—পাষণ্ড!

কাপালিকের চোখ দুটো জ্বলছিল যেন। কিন্তু সে জানে যে সে নিরুপায়। এখন তার মুক্তি সম্ভব নয়। তা ছাড়া সে হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। তার বিচার হবেই। আর বিচারে অন্তত সাত বছর ঘানি ঘুরাতে হবে।

ও. সি. জয়ন্তর দিকে চেয়ে বলল—আপনি এ কেসে হাত দিলেন বলেই এমন হাতেনাতে শয়তানকে ধরা সম্ভব হলো। তা না হলে এই নিরীহ শিশুর যে কি দশা হতো—

বীরেনবাবু বললেন—জয়ন্তবাবু, বলুন কি পুরস্কার চান আপনি? আমি যে-কোনও পরিমাণ অর্থ—

জয়ন্ত হেসে বললে—অর্থ-টর্থ আমি চাইনে বীরেনবাবু। আমি যে আপনার ছেলেকে রক্ষা করতে পারলাম—এই আমার আনন্দ!

কাপালিক বুঝল, জয়ন্তর জন্যেই ধরা পড়ে গেছে। সে তাই জ্বলন্ত দৃষ্টিতে জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে বললে—তোমার সর্বনাশ হবে!

জয়ন্ত তাচ্ছিল্যভাবে মৃদু হাসল—কোন উত্তর দিল না।

সমাপ্ত